আশাপূর্ণা দেবী

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.04.10 00:53:30 +06'00'

গল্প-সূচী

নাটক জমেছিল	
ছোট্‌ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা	৯
ক্ষুরের ধার	১৫
বন্ধু-বাৎসল্য	২৫
জ্যান্ত মাছে পোকা	৩৫
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট	৪৫
ফস্কা গেরো	৫৩
অথ পরেশ-ঘটিত	৬১
নিবারণের বারণ	৭০
বলবার মতো নয়	৭৬
জুতোর দৌলতে	৮২
পাকচক্র	৯৩
চক্ষুলজ্জা	৯৯
বাদলের কীর্তি	১১১
চোর ধরা	১২৩
ভাগ্যি যুদ্ধু বেধেছিল	১৩১
হাওড়া টু রিষড়া	১৩৯
বোড়ের চাল	১৪৪
পায়স না পাদুকা	১৪৯
ঝক্‌মারি	১৫৫
বড্ড বেশী গোলমাল	১৬১
হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ	১৭২
রাজযোটক	১৮১
বিধুঠাকরুণের বিষয়-বৈরাগ্য	১৮৫
ভগবান ভূত	১৯১
রেডিমেড প্রেস	১৯৬

www.BanglaBook.blogspot.com

নাটক জমেছিল

পুটুসদের এই কেষ্টনগরের বাড়ীতে টুনুমাসী এলেই যেন উৎসব। টুনুমাসীর চোখ, মুখ, হাসি, কথা, চুল, শাড়ী সব দিয়েই যেন আহ্লাদ ঠিকরোয়।

আসানসোলে না কোথায় যেন স্কুলে পড়ান টুনুমাসী, ছুটি হলেই চলে আসেন পুটুসদের এই কেষ্টনগরের বাড়ীতে! পুটুসদের মা তো টুনুমাসীর সেজদি, আর সেজদির সঙ্গেই টুনুমাসীর ভীষণ ভাব।

টুনুমাসী আসবেন শুনলেই দিন গোনে পুটুসরা। পুটুস কুটুস আর লেটুস।

লেটুসটা অবশ্য ছিঁচকাঁদুনি খুকী, ওকে পুটুস কুটুস দলে নিতে চায় না, তবে টুনুমাসী বলেন 'আহা, আসুক আসুক!'

ওর দেওয়ালীর ফুলঝুরি টুনুমাসীই হয়তো জ্বালিয়ে দেবেন, ওর সরস্বতী পুজোর অঞ্জলিটা টুনুমাসীই হয়তো হাত ধরে দিইয়ে দেবেন।

পুটুস বলে, 'মন্তরটাও তো টুনুমাসীই বলে দিলেন, তোর আবার বিদ্যে হবে কি গুণে শুনি? যা হবে টুনুমাসীরই হবে।'

লেটুস কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'টুনুমাসীর তো গাদা গাদা বিদ্যে, আর নিয়ে কি করবেন রে? আমায় বুঝি একটু দিয়ে দিতে পারেন না?'

ওই! ফি কথায় কাঁদো কাঁদো হওয়াই লেটুসের রোগ। পুটুসের মা অবশ্য বলেন, 'তোমাদের রোগ ওকে কাঁদানো!'

তা' টুনুমাসী এলে এসব কাঁদা-কাঁদানো রোগগুলো বেমালুম উড়ে যায়। এমন কি কুটুসের বাবার রেগে ওঠা রোগ, আর পুটুসের ঠাকুমার বকা রোগও স্রেফ্ উপে যায় বাড়ী থেকে। থাকে শুধু খাওয়া, খেলা, গালগল্প, হাসি, আহ্লাদ।

কিন্তু এবারের মত?

www.boiRboi.blogspot.com

না, এবারের মত এত আহ্লাদ আর কোনোবারে হয় নি। এবারে টুনুমাসী এসেই ঘোষণা করলেন, 'নাটক করা যাক একটা। পুটুস, তোরা, তোদের বন্ধুরা, সবাইকে নিয়ে একটা 'নাটুকে দল' বাঁধি।

পুটুসের মা, মানে টুনুমাসীর সেজদি বলে উঠলেন, 'সেরেছে! ক'দিনের জন্যে এলি তুই টুনু, নাটক নিয়ে মেতে থাকবি?'

টুনুমাসী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, 'মেতে থাকবার জন্যেই আসি তো!'

'এমনিতেই তো রক্ষে নেই, আবার নাটক! ওরা কি আর নাইবে, খাবে, ঘুমুবে রে?'

'করবে বাবা সবই করবে!' টুনুমাসী বকেই ওঠে, 'ওদের তোমরা ভাবো কি? সব পারে ওরা। বকেবকেই তোমরা ওদের ভয় ধরিয়ে রাখো, তাই ওদের খেললে পড়া হয় না, গল্পের বই পড়লে পড়া হয় না, গান গাইলে পড়া হয় না। আরে বাবা সব করেও পড়া হবে! তবে না বলি বাহাদুর!'

স্বর্গের দেবী পুটুসরা জীবনে কখনো চক্ষেও দেখে নি, তবু এখন টুনুমাসীকে পুটুসদের স্বর্গের দেবী বলেই মনে হয়!

ওরা হৈ-চৈ করে ওঠে, 'নাটক করবো, নাটক করবো!'

টুনুমাসী বলেন, 'এই শোন্, বলবি অভিনয়, সেটাই সভ্য ভাষা!'

অভিনয়?

তাই ভালো।

কিন্তু কিসের অভিনয়? কোন্ নাটকের? সে কথা ভাবতে হবে না কারো। নাটক টুনুমাসী ঠিক করে এসেছেন—'বকরাক্ষস বধ' নাটক। এখন শুধু রির্হাসাল হতে যা দেরি!

পাড়ার বন্ধুও এল কিছু কিছু। পুটুস আর কুটুস ভীম আর বকরাক্ষস সাজবে, লেটুস হবে জননী কুন্তী। বাকীরা হবে যুধিষ্ঠির অর্জুন, নকুল, সহদেব, আর ব্রাহ্মণ গেরস্থরা। কুন্তীরা যাদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে বাস করছিলেন অজ্ঞাতবাসের সময়।

যেদিন বামুনদের বাড়ীতে বকরাক্ষসের 'ভোজনের' পালা, সেদিন তো কান্নাকাটি পড়বে। আর ভীম বলবেন, 'কুচ পরোটা নেই, আমি যাবো!' ব্যস, তারপর সেই মজার কাণ্ড!

জোর রিহার্সাল চলতে লাগল।

সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত নেই! এমন অবস্থা হয়ে উঠল, পুটুস হয়তো মাঝ রাত্তিরেই ঘুমের ঘোরে হেঁকে উঠল, 'ওরে রে পাষণ্ড লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, আয় তোরে করি খণ্ড খণ্ড—' কিংবা কুটুস ঘুম থেকে উঠেই ভোরবেলা গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল, 'আমি বক, একচুমুকেই এক সমুদ্র খেতে পারি ঢক ঢক! আমি বক আমি বক, একগাড়ী ভাত একটি মানুষ এই শুধু মোর শখ!'

এইটুকুই গেয়ে ওঠে।

বাকীটা এখনো মুখস্থ হয় নি। হচ্ছে।

খালি লেটুস বেচারা চুপচাপ। ও কিছু পারবে মনে হচ্ছে না। ওদিকে বকরাক্ষসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূলোর মত দাঁত এসে গেছে, কাঁটাগাছের ঝাঁকড়ার মত চুল, আর লম্বা লম্বা থোড়ের খোলার মত নখ্।

তলে তলে এসব তৈরি করেছেন টুনুমাসী একে ওকে দিয়ে।

পুটুসের বাবা বলেন, 'একেই তো বারোমাস রামরাবণের পালা চলছে, তুমি আবার এক নতুন পালা শিখিয়ে যাচ্ছ টুনু, মুশকিল আমারই!'

টুনুমাসী বলেন, 'আপনার বুঝি ইচ্ছে ছিল জামাইবাবু, 'নদের নিমাই' হোক! ছেলেরা 'মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না?' শিখবে? আমি ওসবের মধ্যে নেই! মূলোর মত দাঁত, কুলোর মত কান, আর দড়ির মত চুল দিয়ে না সাজাতে পারলে নাটক জমবে কি করে?'

পুটুসের ঠাকুমা বলেন, 'তোরা বাবু ওই 'বধ' কথাটা তুলে দে। যতই হোক কুটুসটা সাজবে, 'বধ' কথাটা শুনতে খারাপ।'

টুনুমাসী হেসেই গড়ান।

পুটুসের মা বলেন, 'লেটুসটা যা মুখচোরা, ওটাই তোকে ডোবাবে টুনু!'

টুনুমাসী বলেন, 'তাই ভাবছি। এতদিন রিহার্সাল দেওয়াচ্ছি, এক লাইন মুখস্থ করাতে পারছি না!'

তবু তারিখ এসে যায়।

উঠোনে স্টেজ বাঁধা হয়। আলো, সিন্—বাদ কিছুরই নেই। পাড়াসুদ্ধু মেয়ে-পুরুষ দেখতেও আসেন মহোৎসাহে। চেয়ার পেতে পেতে বসেন সবাই।

টুনুমাসী ভিতরে চলে যান।

চোখের সামনে যবনিকা ঝুলতে থাকে। ছটা বাজলেই উঠবে।

গ্রীনরুমে ঢুকে টুনুমাসী লেটুসকে বলেন, 'তুই একটা দুটো কথাও বল্। তাতেই চালিয়ে নেব।'

লেটুস নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'লেটুস, তোর পায়ে পড়ি, শুধু এইটুকু বললেই হবে—'বৎস ভীম, বাছা মোর, ব্রাহ্মণের দুঃখে ফাটে প্রাণ, তুমি মোর বীরপুত্র, বকটারে করো খান খান'।'

লেটুস মুখে আঙুল পুরে বড় বড় চোখ তুলে স্থির!

'লেটুস, তুই যা চাইবি তাই দেব।'

লেটুস হিমালয়!

লেটুস নিষ্কম্প!

টুনুমাসী মাথার চুল ছিঁড়ে, মানে, নিজের মাথার অন্য ব্যবস্থা ঠিক করতে গেলেন। 'ছি ছি'র ঢেউ বয়ে গেল গ্রীনরুমে। লেটুস চুপ!

অবশেষে যবনিকা উঠল।

প্রথমেই টুনুমাসী অ্যানাউন্স করলেন,'আপনারা ক্ষমা করবেন। অনিবার্য কারণে কুন্তীদেবীকে দেখানো সম্ভব হলো না, তাঁর পরিবর্তে ভীমের দাদা যুধিষ্ঠিরই ভীমকে যুদ্ধে যেতে আদেশ দেবেন। মানে বকের সঙ্গে যুদ্ধে।'

উপায় নেই।

ভীমের মাসী পিসি খুড়ি জেঠি, নিদেন একটা মামী পর্যন্ত নেই যখন।

প্রথম দৃশ্য শুরু হ'ল।

(ব্রাহ্মণ পরিবার হা-হুতোশ করছেন, সহসা ভীম ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ, হা-হুতোশের কারণ শ্রবণ ও আদেশ প্রদান)

যুধিষ্ঠির পাড়ার একটি ছেলে, লেটুসের রিহার্সাল শুনে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। সে রীতিমত সপ্রতিভ। এসে কাঁধের চাদর গুছিয়ে নিয়ে একবার চারদিক দেখে নিয়ে বেশ দরাজ গলায় শুরু করে দিল, 'বৎস ভীম, বাছা মোর, ব্রাহ্মণের দুঃখে ফাটে প্রাণ, তুমি মোর বীরপুত্র—'

সর্বনাশ! এ কী!

টুনুমাসী একমুঠো চুল ছিঁড়ে ফেলেন। এত করে শেখালেন, 'বৎস'র জায়গায় 'ওরে' 'বাছা'র জায়গায় 'ভাই', আর 'পুত্রে'র জায়গায় 'ভ্রাতা' বলতে, ছেলেটা কিনা—

ওদিকে দর্শকের মধ্যে প্রবল হাসির রোল ওঠে। হৈ-চৈ শব্দ ওঠে, কী রে বাপু! এ কোন্ দেশের মহাভারত বাবা, ভীম যুধিষ্ঠিরের পুত্র!

কিন্তু এসব কথায় কে কান দিচ্ছে?

সপ্রতিভ বালকটি বলেই চলেছে, 'তোর মুখে মাতৃডাক শুনি বক্ষ মোর আনন্দে বিদরে—!'

বিনা বাক্যব্যয়ে টুনুমাসী স্টেজে ঢুকে যুধিষ্ঠিরের একটি কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে যান।

পুটুসের মা বলেন, 'ক্ষ্যামা দে টুনু, আর বকরাক্ষস বধে কাজ নেই!'

টুনুমাসী কিন্তু হেসে ওঠেন। বলেন, 'বাঃ, অত চেষ্টা করে বকের দাঁত যোগাড় করলাম—'

তা ব্রাহ্মণ-গেরস্থরা মন্দ করল না। যদিও কথাগুলো এত আস্তে যে মনে হচ্ছিল মশা শনশন করছে। তা হোক নাটককে তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

এইবার তো আসল!

হঠাৎ গ্রীনরুমের মধ্যে একটা আক্রোশের ঝড় বয়। একখানা বারকোস ভর্তি মেঠাই এসেছে বকরাক্ষসের জন্যে। তাই নিয়ে ঝড়! ভীমরূপী পুটুস এখন বলছে, 'আমি বক হবো!'

'তুই বক হবি? সে কি রে? তুই ভীমের পার্ট মুখস্থ করলি—'

'তা হোক, বকেরটাও শোনা আছে, স্টেজে মেরে দেব!'

ওদিকে কুটুস হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে, 'চলবে না চলবে না! পালা বদল চলবে না!'

টুনুমাসী কষ্টে থামান। যতই হোক পুটুস বড়। পুটুসকে তোয়াজ করতে হবে বেশী। তাই কুটুসকে বোঝান, 'তাতে কি কুটুস? শোনো, এই দেখ কুন্তীর বদলে যুধিষ্ঠির ভীমের 'জননী' হলো তো? তবে?'

কুটুস এতদিন বকের পার্ট প্লে করে এসেছে, তাই ভিতরে 'রাক্ষসী'র তেজ। সে অনড়।

ওদিকে যবনিকা ঝুলেই আছে।

দর্শকরা হাসতে লেগেছে, 'আর কতক্ষণ পর্দার অভিনয় দেখবো বাবা!'

অনেক কষ্টে দু'জনকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে স্টেজে টেনে পাঠিয়ে দেন মাসী।

মানে দুদিক থেকে দুজনকে।

দৃশ্যটা এই—

(মাঝখানে মেঠাইয়ের বারকোস, চারপাশে বালতি বালতি মিছিমিছি দুধ, শরবৎ, ভাত, ডাল ইত্যাদি। গান গাইতে গাইতে বকের প্রবেশ।)

'আমি বক! আমি বক!

আমি···আমি···আমি···ইয়ে-যে, আমি দুধ খাই ঢক ঢক!'

টুনুমাসী ইশারা করতে থাকেন, 'পুটুস, তোমার বক সাজা চলবে না! ভুল হচ্ছে।'

পুটুস ও কথায় কান দেয় না।

পুটুস টপাটপ মেঠাই মুখে পুরে আরো উৎসাহে গাইতে থাকে, 'আমি বক আমি বক, কে কোথা আছিস আয় চলে আয়, দেখি কত স্টক্!

পুটুসের বাবা চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলেন, 'ও টুনু, এই গান ছিল নাকি তোমার?'

'মোটে না জামাইবাবু, ও বানাচ্ছে।'

'থামাও—'

'শুনবে না!'

সত্যিই শুনবে না। কারণ গানের অন্য লাইন সব ভুল মেরে দিয়েছে। তাই মেঠাই খেয়েই চলেছে। আর গেয়েই চলেছে, 'আমি বক! সব খাই আমি, কটু কি কষায়, নুন ঝাল মিঠে টক!'

মেঠাইও চলছে।

পুটুসের মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'অ টুনু, সত্যি তো বকরাক্ষস নয়, অত মেঠাই সহ্য হবে? ভীমকে পাঠা!'

'পাঠাচ্ছি—, পার্ট ভুল করছে যে, রিহার্সাল দেওয়াচ্ছি।...যাক্ গে চলেই যা। মনে রাখিস কুটুস, কিল-ঘুঁষিগুলো এমন জোর করে শূন্যে তুলবি যে মনে হবে খুব মারছিস।'

কুটুস বলে, 'মনে রাখবো।'

তারপর লাফিয়ে গিয়ে পড়ে স্টেজের ওপর, 'ওরে পাষণ্ড গুণ্ডা-ষণ্ড আয়, তোকে লণ্ড-ভণ্ড—'

কথা শেষ হয় না, বকরূপী পুটুসের পরিত্রাহী চিৎকারে স্টেজ কেঁপে ওঠে।

কারণ?

কারণ কুটুস পরিত্রাহি চিৎকারে জোরে মেঠাইয়ের শোধ তুলছে।...'লণ্ড-ভণ্ডে'র শেষাংশ ভুলে গিয়ে বলে চলেছে, 'মেঠাই খাবি? খা! মেঠাই খাবি? খা!'

বুঝতেই পারছো দর্শকরা কী করছে!

পরের পিঠে কিল পড়া দেখলে যা করে লোকে।

বেদম হাসি, কেবল হাসি, বেজায় হাসি! পুটুস কুটুসের বাবা নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে যবনিকা পতন করে দেন।

তারপর?

তারপর সবাই বলেন, 'টুনু বোধ হয় দুঃখে লজ্জায় সোজা স্টেশনে চলে যাবে!'... অথচ এই ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে খোঁজাই বা যাবে কোথায় টুনুমাসীকে!

পুটুসের মা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আজ বিকেল থেকে কিছু খায় নি টুনু। ছি ছি, আমার মেয়ে-ছেলেগুলো এই করল! কি করে যে আবার টুনুকে মুখ দেখাব আমি!···যদি টুনু সোজা স্টেশনে চলে যায়—'

ওমা এ কী—!

আবার যে টুনুমাসীর গলা!

মাইকের সামনে টুনুমাসী!···মুখে, চোখে, চুলে, শাড়ীতে আর হাসিতে আহ্লাদ যেন ঝলসাচ্ছে।

'হ্যাঁ, মাপ করবেন, আগে একটু ভুল বলা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের আজকের নাটকের নাম 'ডিরেক্টর বধ' নাটক! আর আমিই সেই ডিরেক্টর! আমার এই বধ-কাব্য যে আপনারা ধৈর্য ধরে শুনলেন, এজন্য অনেক ধন্যবাদ!···নাটক খুব জমেছিল, কী বলুন?'

পুটুসের মা বললেন, 'টুনু রে, ছেলে-মেয়েগুলো কী লজ্জায় ফেললে তোকে! জীবনে আর কি তুই আসবি?'

টুনুমাসী ঝলমলিয়ে ওঠেন, 'ওমা সে কি? আসব না মানে? সামনের পূজোর ছুটিতেই আসবো। সেবারে কীচক বধ পালা, কী বলিস রে কুটুস পুটুস? এবারের নাটকটা কি কম জমলো? লোককে হাসানো নিয়ে কথা, হাসে নি? বল!'

ছোট্‌ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা

ছোট্‌ঠাকুর্দাকে আর ঠেকানো গেল না। এযাত্রা তিনি কাশী না গিয়ে ছাড়বেন না। সত্যই ভদ্রলোক অনেক দিন অনেক কিছু সহ্য ক'রে এসেছেন, কিন্তু তাই ব'লে এতদূর? সেদিনকার ফচ্‌কে ছোঁড়াগুলো, ঠাকুর্দার যারা কড়ে আঙুলের বয়সী, তাদের কিনা এই রকম 'ইয়ে হারামি'! মানে আর কি—নেমক-হারামি বলা চলে না; যেহেতু তারা ঠাকুর্দার নুন কখনও খেয়েছে কিনা মনে করতে পারে না, তবে সিনেমা-হারামি বলতে পার। সত্যি কথা বলতে, ঠাকুর্দার পকেট মেরে কে না দু-দশবার সিনেমা দেখেছে?

বলুক—নন্তু, ভোলা, মট্‌রা, মিচ্‌কে, হারাধন বলুক একবার! তবে, হ্যাঁ, ছোট্‌ঠাকুর্দার মত 'সনাতন' লোকের পকেট অর্থাৎ ট্যাঁক এ-পথে হাল্‌কা হওয়াটা সত্যিই আশ্চর্য, এক রকম অসম্ভবই।

কিন্তু সকল কাজেরই একটা কারণ থাকে, এরও অবিশ্যি আছে। সিনেমায় তারা যায়, খুবই যায়, কিন্তু সেটা (তাদের মুখ থেকে শুনতে হ'লে) ছোট্‌ঠাকুর্দাকে আগ্‌লাবার জন্যেই নাকি যায়। 'হাজার হাজার' লোকের মধ্যে নিছক একলা ব'সে সিনেমা দেখতে হ'লে ঠাকুর্দার নাকি ভির্মি হওয়ার যোগাড় হয়!

কি, তোমরা হাসছ? কেন? ঠাকুর্দা সিনেমা দেখেন শুনে? হাসবার কিছু নেই বাপু, তিনি তো আর (তাঁর কথায় বলতে গেলে) রং-তামাসা দেখতে যান না। তিনি দেখতে যান—দেশের লোকের আহাম্মুকি। 'এ্যাঁ বল কি?' তিনি বলেন, 'দেশের লোক খেতে পায় না—আর এমনি ক'রে মুঠো মুঠো টাকা খরচ ক'রে যায় কিনা ভূতের নাচ দেখতে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ওটা কি যাত্রা-কেত্তন, না রামলীলা-টিলা যে, একসঙ্গে ইহকাল পরকাল দু'দিকই রক্ষে হবে? ও যে একেবারে বাজে রাবিশ্‌!' কোন্‌টা কত বেশী রাবিশ্‌ তাই জানবার জন্যে ঠাকুর্দা যখনি একটা নতুন

'ভূতের নাচ' বাজারে বেরোয়, একবার ক'রে অর্থনষ্ট ও মনঃকষ্ট সত্ত্বেও দেখে আসেন এবং তার যত ইচ্ছে নিন্দে করেন, করে চলেন যতক্ষণ না আর একটা দেখা হয়।

যাক এমনিভাবে দিন তো একরকম কেটে যাচ্ছিল মন্দ নয়। কিন্তু গোল বাধালো ইডিয়ট্ মট্‌রাটা।

সেই যে বলে না, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হ'ল তাঁতীর এঁড়ে গরু কিনে', হতভাগারও হ'ল তাই। সিনেমা দেখছিলি বেশ করছিলি, উপরি লাভ আইস্‌ক্রীম, শরবত, চানাচুর, চীনেবাদাম তো ছিলই, আবার চপ-কাটলেট খেয়ে সর্দারী করতে যাওয়া কেন? খেলি খেলি ভাল করলি—শখ ক'রে ঠাকুর্দাকে দলে টানবার দরকার কি ছিল? আর তাই যদি টানলি, শেষকালে আবার যুধিষ্ঠির সাজতে গেলি কেন?

ঘটনাটা তা' হ'লে বলি। কাল্‌কের কথা বলছি। মট্‌রাটা ছিল ঠাকুর্দার সঙ্গে। 'বীণাপাণি' সিনেমা থেকে বেরিয়ে, ডানহাতি ওই যে 'রুচিসদন'টা রয়েছে, তা' দেখিয়ে সে বললো—'ঠাকুর্দা, চল তোমায় ফার্স্ট ক্লাস ভেজিটেবল্ চপ খাওয়াবো।' ঠাকুর্দাও দু'বার আমতা-আমতা ক'রে ঢুকেছেন। আরামে খাওয়া চলছে, খেতে খেতে মট্‌রার কেমন সন্দেহ হয়েছে। হয়েছে হয়েছে বাপু, চেপে গেলেই হ'ত, দেখছিস যখন ঠাকুর্দা চোখটি বুজে আরাম ক'রে গলা দিয়ে নামিয়ে যাচ্ছেন। তা' না, কর্তাত্তি ক'রে বলতে যাওয়া হ'ল, 'মশাই, এ চপটা কিসের? ভেজিটেবল্ ব'লে তো মনে হচ্ছে না!' দোকানের লোকগুলোও তেমনি হাঁদা। চোখ টিপে 'হাঁ' ব'লে ছেড়ে দে না? দেখতে যখন পাচ্ছিস একজন বিজ্ঞ-সিজ্ঞ প্রবীণ লোক বসেছেন! সবাই যেন সত্যবাদী গোপাল, দিব্যি বললো, 'মাটন্'। নাও এখন ঠ্যালা!···মাটন্! মাটন্ চপ না হাতীর চপ! দেখেছে কখনও চোখে মাটন্? কসাইয়ের দোকানের নাড়িভুঁড়িগুলো তো ছ'পয়সা সের দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। আবার মাটন্ দেখাতে এসেছে!

ব্যস! হ'ল তো!

এই তো ঠাকুর্দা পৈতে ছিঁড়ে শাপ-শাপান্ত ক'রে এলেন। বললেন, 'তোদের কি বাপু ভাল হবে? সেকাল হ'লে তো এতক্ষণে তোর ভস্মের গুঁড়ো শ্যামবাজারের মোড়ে উড়ে বেড়াতো। নেহাৎ একাল ব'লেই তাই আস্ত র'য়ে গেলি! হুঁঃ, তাই

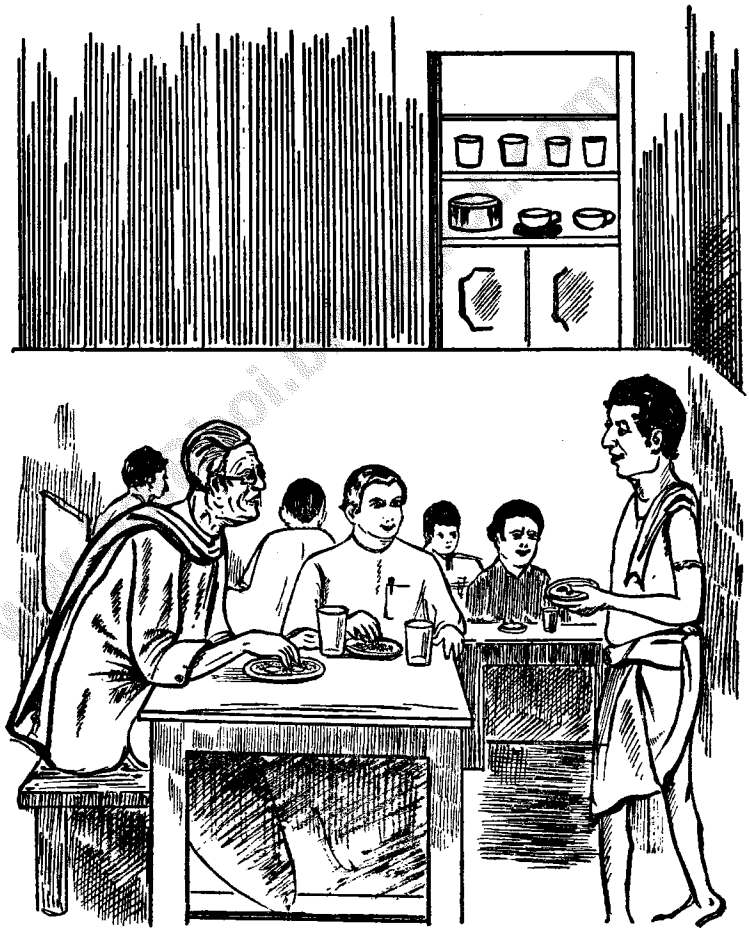

'এ চপটা কিসের ? ভেজিটেব্‌ল বলে তো মনে হচ্ছে না !'

[পৃষ্ঠা—১০

ব'লে কি ব্রহ্মণ্য-তেজ একেবারে গেছে? কখনই না! তোর 'রুচিসদন' একদিন উঠবে উঠবে, তোর ওই মরচে-ধরা লোহার চেয়ারগুলো 'ভাঙা লোহায়' নিয়ে যাবে! সাইনবোর্ডের ও-পিঠে কুমড়ো বড়ি দেওয়া হবে। তোর—তোর—যাক্—এখন আর কিছু মনে পড়ছে না—যা হয় একটা সাংঘাতিক কিছু হবেই, এই ভবিষ্যৎবাণী ক'রে রাখলাম।'

তারপর কাল থেকে এ পর্যন্ত ঠাকুর্দা জলস্পর্শও করেন নি—কাশী যাবেন, গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন তবে···। অবিশ্যি এখানকার টোলে ব্যবস্থা নিয়ে 'প্রাচিত্তির' হয় না—তা' নয়, তবে এখানকার তুলনায় কাশীবাসিনী গো-মাতার 'ময়'টা নিশ্চয় অনেকগুণ শুদ্ধু।

রাগ হ'লে, কাশীর টিকিট কিনতে যাওয়া ছোট্ঠাকুর্দার একটা মুদ্রাদোষ। আশা করেছিলাম, এবারও তাই, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা' নয়। কলেজ থেকে এসে দেখি—বিছানা-পত্তর বাঁধা কমপ্লিট। ছোট্ঠাকুমা একহাতে চোখ মুছছেন, আর এক হাতে আচারের বোতল, তেঁতুলের হাঁড়ি, বড়ির কৌটা, আর মুগের ডালের টিন সাম্‌লাচ্ছেন। যে আমসত্তর হাঁড়ির দিকে চেয়ে বাড়ীর ছোট ছেলেদের রসনার রস সংবরণ করা কঠিন হ'ত, সেই হাঁড়ি—ছোট্ঠাকুমা উজাড় ক'রে বিলিয়ে দিলেন! নাঃ আর কোন সন্দেহ নেই, ছোট্ঠাকুর্দাকে ঠেকানো যাবে না, কাশী তিনি যাবেনই। শুধু তাই নয়, মানে একবার যাওয়া নয়, আর এ পাপপুরীতে থাকবেনই না। কাশীবাসী হবেন। তাঁর নাকি দারুণ সন্দেহ যে, মট্‌রার এসব ইচ্ছাকৃত বদ্‌মাইশী। আজকালকার ডেঁপো ছোঁড়াগুলো, গুরু-লঘু জ্ঞান নেই, এদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

মট্‌রার উপর যা' হবার তা' তো হ'লই, ঠাকুর্দার উপরও কম রাগ হ'ল না। বাপু নিজে যাচ্ছ—যাও না! আবার ছোট্ঠাকুমাকে নিয়ে যাবার মানেটা কি? এ তো আমাদের দস্তুরমতন 'অনাথ' করা। 'ঠাকুমা-হীন' রান্নাঘর কল্পনা করতে পারা যায়? ঠাকুমা যেবার গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন, দিন সাতেক ছিলেন বুঝি! মা আর বড়-জেঠিমার হাতে প'ড়ে আমাদের যে দুর্গতিটা হয়েছিল, সে আর না বলাই ভাল। বেশী মনে পড়লে হয়তো চোখে জলই এসে যাবে। কলেজ বন্ধ, বারোটার সময়ে নাইবার জন্যে তাড়া—'হাঁড়ি আগলে বসে থাকবার গরজ কারুর নেই।'

দেখ তো এটা কি অত্যাচার নয়? কিন্তু যাই হোক—এবার আর ঠাকুর্দাকে ঠেকানো গেল না। ঠাকুর্দা ইতিমধ্যে তাঁর ফেমাস্ ডবল-ব্রেস্ট শার্টটি প'রে নিয়েছেন, কোঁচার আগাটি পরিপাটি পাট করে পেটে গুঁজে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে এঘর ওঘর ক'রে বেড়াচ্ছেন। কালীঠাকুরের পটখানির নীচে গিয়ে বিড়-বিড় ক'রে কি সব বললেন, রাধাকৃষ্ণের ছবিখানি পেরেক থেকে খুলে নিয়ে মাথায় ঠেকালেন, গৌর-নিতাই মূর্তির দিকেও একবার যেন গেলেন মনে হ'ল। বাকী এখন ঠাকুমাকে তাড়া দেওয়া, আর বিন্দাবনের উপর হুঙ্কার ছাড়া! বিন্দাবন অবিশ্যি সঙ্গে যাবে, কারণ ঠাকুমাকে না হ'লেও যদি বা চলে, বিন্দাবন নইলে ঠাকুর্দার একদণ্ডও চলে না।

ছোট খুড়ীমা ঠাকুমার পায়ে আলতা না কি পরিয়ে দিতে বসেছেন, এমন সময় জেঠামশাই অফিস থেকে এলেন। ব্যাপার দেখে ভদ্রলোক অবাক্! আমাদের কাছে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিয়ে তো আমাদের 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ক'রে, গেলেন ঠাকুর্দার রাগ ভাঙাতে। খুড়ো না থাকলে জেঠামশাইয়ের দাবার কি হবে, সেটাও ভাববার বিষয়।

ঠাকুর্দার কাছে যেয়ে জেঠামশাই বললেন, 'ছোট খুড়ো, এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে? দুটো চ্যাঙড়া ছোঁড়ার দোষে আমাদের এরকম শাস্তি দেওয়া!'

ঠাকুর্দা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'না হে বাপু না, তোমাদের যে-সব ছেলে হয়েছে, মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলা দায়, এই বেলা স-মানে স'রে পড়া ভাল।'

'কিন্তু খুড়ো, আমাদের কি হবে? তুমি আছ—না পর্বতের আড়ালে আছি—'

'রাখো হে বাপু ও-সব কথা, ছেলেগুলিকে যা তৈরী করেছ, দিব্যি তো এক-একখানি হিমালয়! ওদের আড়ালেই বেশ কাটিয়ে দিতে পারবে।···না, আর না, অনেক সহ্য করেছি। কাশীতে থাকবো—বেশ থাকবো, দুটো প্রাণী বই তো নয়? আলুভাতে-ভাত খাবো আর দেবদর্শন ক'রে বেড়াবো, ব্যস্ ফুরিয়ে গেল! কাজ কি আমার এত খচখচিতে?···বিশ্বনাথ হে!'

জেঠামশাইও আর কিছু বললেন না, মান তো ওঁরও আছে! খুড়োর ভাইপো তো! উদাসভাবে চলে গেলেন, তবে ব'লে গেলেন—'যাক, ভগবানের রাজ্যে যাচ্ছ (কলকাতাটা যেন ভগবানের রাজ্যের বাইরে), বাধা দেবো না। বোড়ে ক'টা

ছোট বৌমার খোকাটা রোজ চায়, তাকে দিয়ে গেলেই হবে। ছকখানা একদিন টান মেরে উনুনে দেওয়ার ওয়াস্তা।···আয় খোকা! খেলনা নিবি তো আয়।'

ঠাকুর্দার তখনকার মুখটা ফটো তুলে নেবার মতন, কিন্তু তবু দমলেন না, কঠিন প্রাণ বটে! ওই তুলসীকাঠের মালা ঠকঠকালে প্রাণটা যে কাঠের মত হয়ে যায়, এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি।

তারপর বাবা এলেন, ছোট কাকা এলেন, কাকুতি-মিনতি অনুরোধ-উপরোধ অনেক হ'ল, কিন্তু ঠাকুর্দা অচল—অটল। আমাদের বলছেন 'হিমালয়', নিজে যে বাবা একটি 'বোধিদ্রুম'! বলি ঠাকুমার কথাও তো একবার ভাবতে হয়! খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা কে তাঁর পাকা চুল তুলে দেবে বাপু? তুমি? সুর ক'রে রামায়ণ প'ড়ে শোনাবে কে? তুমি? সন্ধ্যেবেলা গল্প শোনবার জন্যে আবদার করতে পারবে? লুকিয়ে আচার খেয়ে বকুনি হজম করতে পারবে? কিছুই যখন পারবে না বাপু, তখন এত সর্দারী কিসের?

'সাড়ে আটটায় গাড়ী, সাড়ে সাতটা তো বাজলো, আর দেরি করা নয়'—শোনা গেল ঠাকুর্দার গলা। বিন্দে হতভাগা ইতিমধ্যে একখানা ঘোড়ার গাড়ীও জুটিয়ে এনেছে দেখছি।

ঠাকুর্দা আর একবার দুর্গানাম স্মরণ ক'রে বেরুচ্ছেন, পেছনে ঠাকুমা। একহাতে আমতেলের বোতল, মুখে ন্যাকড়া বাঁধা, আর এক হাতে হরিনামের ঝোলাটি! বগলে তসরের টুকরো-জড়ানো খান আষ্টেক পট। বাদসাদ দিয়েও এই ক'খানি ঠাকুমার সঙ্গ ছাড়তে পারে নি! এমন সময় বড়দা' ফিরলেন ক্লাব থেকে। কোর্ট ফেরত সোজা ক্লাবে যান কিনা।

বড়দা' বললেন, 'কি ঠাকুর্দা, কোথায় চল্‌তি? এ কি! ঠাকুমাও যে! বাঃ রে! ব্যাপার কি?'

'সরো হে ছোক্‌রা, পেছু ডেকো না—'

'পেছু কি ঠাকুর্দা! এ যে সাম্‌নে, সুযাত্রা, বলি যাচ্ছেন কোথা?'

'কোথায় আবার, দেখতে তো পাচ্ছ কাশী যাচ্ছি!'

'দেখতে তো পাচ্ছি! মজাখানা তো বেশ! গায়ে যেন লেখা রয়েছে 'কাশীযাত্রী'!

বড়দা'রও আক্কেল দেখ, তাই একবার বল যে—'কেন যাবেন, সেকি কথা!' বললেন কিনা, 'ভাড়াটে গাড়ী কেন? আমি নিজেই পৌঁছে দিয়ে আসছি, গাড়ীটা তুলি নি এখনও।'

উদারতার 'পরাকাষ্ঠা' একেবারে! ঠাকুর্দার বিহনে আমাদের কি হবে একবার ভেবে দেখেছ! পকেট থেকে তো একটি আধলা কখনও বের করতে দেখলাম না।

ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে বললেন—'থাক্ বাপু থাক্, তোমার ও হাওয়া-গাড়ীতে হুস ক'রে যাবার দরকার নেই, এ ঘোড়াগাড়ীতে বেশ ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে'খন। তোমার ঠাকুমার আবার মাথা নাকি ধরেছিল।'

সুযোগ পেয়ে ছাড়লাম না। সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে বললাম, 'তাই নাকি! ঠাকুমার মাথা ধরেছে? তা' হ'লে কি ক'রে যাওয়া হয়? হাওড়া স্টেশনে আজ কী দারুণ ভিড়—বিধুভূষণ না শৈলেশ কে যেন বলছিল। তা' ছাড়া ট্রেনের ধকল—'

ঠাকুর্দা তো মারমুখো, 'কিহে বাপু! খালি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করছ সব! ব্রহ্মার বেটা বিষ্টু এলেও আমার যাওয়া রদ হচ্ছে না।···বিন্দে! চাদরখানা ধর্ তো বাবা, পেটটা কেমন মুচড়ে এলো। উঃ! যা শেয়াল ডাক ডাকতে লেগেছে—'

ডবল-ব্রেস্ট শার্ট ততক্ষণে অন্তর্ধান হয়েছে, পাট-করা কোঁচাটি হাতে ক'রে ঠাকুর্দা সেই যে ওই ছোট্ট ঘরটিতে গেলেন আর দেখা নেই!

অপেক্ষা ক'রে ক'রে ঠাকুমা বাইরের ঘরে একখানি চেয়ার দখল করে বসেছেন। ঠাকুমাকে চেয়ারে বসতে দেখে টেঁপি আর ফুলি হেসে পেট ফাটিয়ে, এখন ধমক খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়েছে। বিন্দে ঘর-বার করতে করতে এখন আর একবার লুকিয়ে বোধ হয় এক ছিলিম টানতেই গেল। অবশেষে ঠাকুর্দা এলেন। আহা! বেচারা ঠাকুর্দার মুখখানি শুকনো। পেটকামড়ানো যে কি ভয়ানক, সে আমি ভালই জানি।

বড়দা'টা চিরকেলে কাঠখোট্টা। কুশল প্রশ্ন না ক'রেই বলে উঠলো, 'এই যে ঠাকুর্দা বেরিয়েছেন! নিন নিন—ঠিক হ'য়ে নিন—শীগ্‌গির। 'ফুল স্পিডে' চালালে ট্রেন ধরা যাবে'খন।'

উঃ!—এসব শুনে রাগ যা হচ্ছে—কি বলব!

ঠাকুর্দা গম্ভীরভাবে শার্টটি গায়ে চড়িয়ে চাদরখানি নিতে নিতে একেবারে শিউরে

উঠলেন, 'ওরে বাবা! এ যে দেখি আবার! পেট তো গেল! বিন্দে বাবা! গাড়ুটায় জল দিস।'

ঠাকুমা পোঁটলা-পুঁটলি নামিয়ে আকাট হয়ে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসলেন। সারা বাড়ীটা যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় থম্‌থম্ করতে লাগল। শুধু বড়দা' মহাপ্রভু শিস্ দিতে দিতে গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলে এলেন। চিরকেলে নিষ্ঠুর—জানি কিনা আমরা!

যাই হোক, ছোট্‌কা'র হোমিওপ্যাথিক বাক্সটা যথেষ্ট কাজ দিল।

কাশীর গাড়ী অবিশ্যি ছেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়ুক—ঠাকুর্দার নাড়ী যে ছাড়ে নি এই ভাগ্য!···

সকালবেলা দেখলাম ক্লান্তভাবে বড় ইজিচেয়ারটায় শুয়ে ঠাকুর্দা মট্‌রার সঙ্গে চুপি চুপি কি কথাবার্তা কইছেন। চুপি চুপি অবিশ্যি দুর্বলতার দরুনই, কিন্তু মট্‌রা হতভাগা আচ্ছা তুখোড় তো! এরই মধ্যে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। নিশ্চয় আমাদের নিন্দে করছে। কান পেতে শুনতে হ'ল।···তবু ভাল—তা' নয়! ঠাকুর্দা জানতে চাইছিলেন, ওই হতচ্ছাড়া দোকানে সত্যি ভেজিটেবল্ জিনিসগুলোও মাংসের কড়ায় রাঁধে কিনা!

ক্ষুরের ধার

বিপদে পড়লে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। অতি নিরীহ গো-বেচারা লোকও তেমন তেমন অবস্থায় পড়লে—একটা-কিছু ক'রে বসে। এই তো সেদিন নাটুর সেজকাকা কি রকম এক 'লোমহর্ষণ' ব্যাপারই না ঘটিয়ে বসেছিলেন!

তা' বলতে গেলে একটা আস্ত গল্প দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু সে-কথা যাক, নাটুর

কথাই ধর। ছেলেটা কি রকম ভালমানুষ জান তো? চেন না? আশ্চর্য বটে, বটুক সেনের ভাইপো গো—ওর আসল নাম তো হচ্ছে 'নটরাজ'। মা, ঠাকুমার কল্যাণে দাঁড়িয়েছে 'নাটু'। আর কাকাদের মুখে মুখে (যাঁরা 'প্রলয় নাচন' থেকে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন নামটা) সংক্ষিপ্তভাবে 'নেটো'। এখন চিনলে তো? তবু 'হাঁ' ক'রে তাকাচ্ছ? কেন বটুক সেনকেও চেন না নাকি? জ্বালালে তোমরা—বটুকভৈরব সেন নাটুর সেজকাকা। যাক, এইবার পরিষ্কার হ'ল তো? নাটু হচ্ছে—বটুক সেনের ভাইপো, আর বটুক সেন হচ্ছেন নাটুর সেজকাকা। কাকা হলে কি হয়—নাটুর সঙ্গে কিন্তু ওঁর চিরকালের শত্রুতা।

আহা বেচারা নাটু! মাঝে মাঝে যে তার সংসার-আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, সে কার জন্যে? ওই সেজকাকার জন্যে। দোষ অবিশ্যি বাড়ীসুদ্ধ সকলেরই আছে। ছেলেটা একটু ভালমানুষ ব'লে চক্রান্ত ক'রে সকলে মিলে তা'র জীবনটা বিষ ক'রে তুলেছে। কিন্তু সেজকাকা? অসহ্য বললে কিছুই বলা হয় না। অপরাধের মধ্যে বেচারার এককুড়ি পূর্ণ হবার পাঁচটি বছর আগেই একমুখ দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে। গেছে গেছেই, কি করবে? 'ভগবানের মার'! তাই ব'লে সত্যি কিছু আর সে বুড়ো বনে যায় নি। অথচ দেখ, 'ধাড়ী ছেলে', 'বুড়ো হাতী,' 'হোঁৎকা বুনো' প্রভৃতি ভাল ভাল বিশেষণগুলো যেন তা'র জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা ভাষায়!

সংসারের যত কিছু 'ওঁচা উনচুটে' কাজ আছে, সব তা'র ঘাড়ে। 'কেন ঐটুকু কাজ নেটো পারে না করতে—ধাড়ী ছেলে?'—এছাড়া আর কথা নেই বাড়ীতে।

তার ওপর আবার পূজোর ছুটি পড়েছে। সেই যে কালিদাসের শকুন্তলায়, না কিসে যেন মনে পড়ছে না, কোন ভাল সংস্কৃত কাব্যে আছে—'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং', পূজোর ছুটিটাও নাটুর পক্ষে তদ্রূপ।

খুকীর পেট কন্‌কন্, ডাক্তার-বাড়ী যা' নাটু, খোকার কান কট্‌কট্, ওষুধ আন নাটু, ছোড়দি'কে 'কনে' দেখে গেল, শ্যামবাজারে গিয়ে খবর আন নাটু, বড়দি'র শ্বশুরবাড়ী পূজোর তত্ত্ব যাবে, নতুন চাকরকে বাড়ী চেনাতে কালীঘাটে ছোট্ নাটু! কাকীদের বোনার পশম আনতে, সিল্কের ব্লাউজের রং মিলিয়ে রিল কিন্‌তেও আর দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে!

শুধু কি তাই? 'গাঁটুটা মোটে পড়তে বসে না, নেটো ইচ্ছে করলেই পড়াতে পারে দু'দণ্ড! ব'সেই তো থাকে!···চাকরটা বাজারের পয়সা চুরি ক'রে হদ্দ করছে, নাটুটা যদি সঙ্গে যায় তো হয়, কি করে চব্বিশ ঘণ্টা?'—এসব মন্তব্য তো আছেই। তা ছাড়া বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা, এমন কথা পর্যন্ত শুনতে হয়েছে—'চাকর ছোঁড়া চৌদ্দবার দোকানে যাচ্ছে; আহা মানুষের শরীর তো! নেটো, যা' না একবার।'

নেটোর অবিশ্যি মানুষের শরীর নয়। কারণ তা'র পূজোর ছুটি পড়েছে, কারণ তা'র বয়সীদের যা' হয় না তার তাই হয়েছে—অর্থাৎ অল্পবয়সে চারটি গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে!

যাক, সকলই অদৃষ্ট! এসব তো একরকম গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেজকাকার বর্তমান আক্রমণটা তা'কে একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ক'রে তুললো।

আহা রক্তমাংসের শরীরে কত আর সয়? পূর্বজন্মের কোন্ শত্রুতা সাধতে যে সেজকাকা এজন্মে তা'র সেজকাকা হ'য়ে জন্মেছেন, আজ পর্যন্ত সে বুঝতে পারলো না। শোনো তা হ'লে অত্যাচারের কাহিনীটা।

বটুক সেন লেখক। ছোটবেলা থেকেই তিনি লিখে আসছেন মনে মনে। কিন্তু এখন গবেষণা ক'রে দেখলেন, দেশের লোককে এতবড় একটা সম্পদ থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা, শুধু অন্যায় নয়, ঘোরতর অন্যায়, বলতে গেলে মহাপাপ। তাই বছর দেড়েকের একাগ্র সাধনায় তিনি একখানি উপন্যাস দাঁড় করিয়েছেন, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস! 'ক্ষুরের ধার'! নামটা তাঁর বিশেষ পছন্দ। বইখানি কি রকম হয়েছে ব'লে দিয়ে আগে থেকে খেলো করতে চাই না, তবে বটুক তার যে বিজ্ঞাপনটা ছাপাবেন ব'লে ঠিক করেছেন, সেটা একদিন উঁকি মেরে দেখো। 'অ' দিয়ে যতগুলো ভাল ভাল কথা 'শব্দ-কল্পদ্রুমে' আছে, তার একটাও তিনি বাদ দেন নি। ধর যেমন—'অদ্ভুত', 'অত্যাশ্চর্য', 'অপূর্ব', 'অনির্বচনীয়,' 'অমানুষিক', 'অনাসৃষ্টি,' 'অকস্মাৎ', 'অভাবনীয়', অভূতপূর্ব', দূর ছাই, আর মনেও পড়ছে না!—তোমরা না হয় অভিধান খুলে 'অ'য়ের পাতাটা একবার দেখেই নিও।

যেদিন লেখা শেষ হ'ল, মনে মনে পাঁচ পয়সার হরির লুট মেনে, তিনি খাতা

বগলে গেলেন প্রেসে। বাড়ীর কাছেই 'তারা প্রেস'। 'ইন্দ্রধনু কার্যালয়' গো, চেন তো তোমরা ?

একাধারে প্রেসের মালিক এবং 'ইন্দ্রধনু'র সম্পাদক চিত্তরঞ্জনবাবু তখন একলাই ছিলেন অফিস-ঘরে, বটুকবাবু সগর্বে খাতাখানি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। পাতা খুলে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেন, তারপর চশমা খুলে চোখ রগড়ে শুধু চোখে একবার দেখলেন। চশমার কাঁচ রুমালে মুছে আবার নাকে লাগিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে নিলেন, অবশেষে হতাশভাবে বললেন—'বইটা কোন্ ভাষায় লেখা ?'

বটুক চটেছেন, বললেন—'কি মশাই, মাতৃভাষা ভুলে গেলেন নাকি ?'

'মাতৃভাষা ? লেখাটা—বলছেন বাংলা ?'

'না তো কি তেলেগু ? জ্বালালেন দেখছি।'

'তাই তো! আমার আবার চোখটা তেমন···আচ্ছা, ক্ষিতীশকে ডাকি।'

ডাকাডাকিতে ক্ষিতীশবাবু এলেন। চায়ের পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হওয়ার দরুন তাঁর মেজাজটা একটু খাপ্পা ছিল, তাই এক নজর দেখে নিয়েই বটুকের হাতে খাতা ফেরত দিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—'চলবে না।'

'চলবে না ? মানে ? দস্তুরমত ছাপানোর খরচা দেওয়া হবে।'

'কি করব বলুন! ইতিপূর্বে এ রকম হাতের লেখা দেখি নি, ঈশ্বর করুন আর যেন—'

'বলি মশায় তো আর কম্পোজ করবেন না!'

'সে-কথা ঠিক, তবে কম্পোজিটারেরাও তো মানুষ, এরকম অমানুষিক লেখা তারাই বা বরদাস্ত করে কি ক'রে ?'

বটুক রাগে আগুন হ'য়ে মুখখানি বেগুন বর্ণ ক'রে বললেন, 'তা' হ'লে হবে না এখানে ?'

'হ'তে পারে বৈ কি, আর কাউকে দিয়ে যদি আর একটা 'কপি' লিখিয়ে আনতে পারেন, হবে!···এ লেখা ? অসম্ভব!'

··· ··· ··· ···

আর কাউকে দিয়ে যদি—

বটুক চটেছেন, বললেন—'কি মশাই, মাতৃভাষা ভুলে গেলেন নাকি ?'

[পৃষ্ঠা—১৮

সেই সূত্রেই নাটুর কপাল ভাঙ্গলো।

বলব কি ভগবানের মার, বাড়ীর মধ্যে হাতের লেখাটাও কি তারই ভাল হ'তে হয়? ছুটির তো মাত্র এগার দিন বাকী! পড়া কিছুই হয় নি। এখন এই বিপদ। আহা, সৃষ্টির অভাগা জীব নাটু!

সেজকাকা নিশ্চিন্ত গলায় জানিয়ে দিয়েছেন, সামান্য কাজ, দু-একদিনেই হ'য়ে যাবে। আর খাতার একটিও পাতা হারালে, কান টেনে লম্বা ক'রে দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

একটা নেংটি ইঁদুরের পা কালিতে ডুবিয়ে খাতার উপর ছেড়ে দিলে যে-রকমটা ঘটে, তেমনি ব্যাপার ছাড়া নাটু আর কিছুই দেখতে পেল না খাতায়।

কি ক'রে যে এহেন লেখা কপি করার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তার জন্যই সে অনেকক্ষণ চোখ বুজে টেবিলে মাথা রেখে কল্পনা করতে লাগল।···যেন খুব জ্বর হয়েছে তার। দিনের পর দিন ভুগছে তো ভুগছে। ডাক্তার ব'লে দিয়েছে, 'অসুখ সারলেও লেখাপড়া বন্ধ করতে হবে কিছুদিন—।' উঁহু, তা' হয় না, পরীক্ষা এসে পড়ল, তার ঠ্যালাটি সামলায় কে? এ কল্পনাটা পছন্দ-সই নয়।···আচ্ছা ধরো সেজকাকা হঠাৎ স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন—'বৎস তোমার অমূল্য পুস্তকখানি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ না করিলে ইহজীবনে আর শান্তির আশা নাই।' কিংবা এমনও তো হ'তে পারে—অবিশ্যি নাটু তেমন পাষণ্ড নয় যে, সেজকাকার অমঙ্গল চিন্তা করবে! তবে, দৈবাতের কথা কি বলা যায়? আর ভূত যে জগতে নেই তাও নয়, কতই তো শোনা যায় ভূতুড়ে কাণ্ড। কিছু নয়, একবার রাতদুপুরে সেজকাকার মশারীটি তুলে দাঁত-খামাটি দিয়ে শুধু যদি বলে —'ভাঁল চাঁস তো খাঁতা দেঁ—,' ব্যস্ আর দেখতে হবে না। এই ব্যবস্থাটাই নাটুর সব চেয়ে মনঃপূত হচ্ছিল। আহা এমন যদি হয় তো নাটু তাকে (অর্থাৎ সেই করুণাময় ভূতটিকে) মাথায় তুলে নাচে।

কিন্তু দরকারের সময় ভূতও ভগবানের মত দুর্লভ হ'য়ে ওঠে। নাটু হঠাৎ একসময় চটকা ভেঙ্গে দেখে কোথায় বা ভূত, কোথায় কি! টেবিলে মাথা রেখে ইতিমধ্যে বোধ করি সে বেশ একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে, তাই দেখে 'ভূতের বাবা' স্বয়ং এসে নাটুর কান দুটো টেনে সত্যিই লম্বা করা যায় কিনা এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখছেন!

এক ঝটকায় কান-সমেত মাথাটা টেনে নিয়ে নাটু মরীয়া হয়ে লিখতে বসলো।

কিন্তু শুধু বসলেই যদি সব কাজ হ'ত, পৃথিবীর অনেক দুঃখ-ঝঞ্ঝাট ক'মে যেতো। বসলো সে, কিন্তু কাজ হ'ল না।

হবে কি? অতিকষ্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়ে ঘণ্টা খানেকের পর যখন পাতা দুই আর কয়েকটা লাইন লেখা হয়েছে, ভাবলো, লিখতে লিখতে তো মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না, একটু প'ড়েই নেওয়া যাক। একঘেয়ে কাজ ক'রে যাওয়া বিশ্রী! অতএব পড়তে লাগলো।

কিন্তু এর মানে কি? এ যে সেই—'হরে কর কম্ বা জী ও বা'—গোছের কাণ্ড! এই তো এখানে রয়েছে—'মাণিকগঞ্জের জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বৃদ্ধ হইলেও এখনো—,' তারপরই বিমলা বললো—'ভাই যমুনা, বিষম বিপদে পড়া গেল, এখন উপায়?' এরপর আর যোগেন্দ্রনারায়ণের নামোল্লেখ মাত্র নেই এবং বিমলা ও যমুনার কথোপকথনের মাঝখানেই এক হিন্দুস্থানী দারোয়ানের বৃহৎ চক্‌চকে ভুঁড়ির, আর সুবৃহৎ চক্‌চকে তেলপাকানো লাঠিটির বিশদ বর্ণনা!

এসব কি ভুতুড়ে ব্যাপার! পাগল হ'য়ে গেল নাকি নাটু? 'হে ঈশ্বর, পথ দেখাও'—প্রার্থনা করলো সে।

দেখালেন পথ ঈশ্বর। অনেক অনুসন্ধানে দেখা গেল খানিকটা লেখার পর ক্ষুদ্রাকৃতি একটি তীরচিহ্ন, আর তার পাশে লেখা—'ঊনবিংশ পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করো'—করলো অনুসন্ধান, হ্যাঁ, মার্জিনের একপাশে হদিস মিলল যোগেন্দ্রবাবুর।

কিন্তু এতেই কি শেষ? তা' নয়, তা' নয়। আরও আছে। সারা বই-খানাই তীরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। আর সেই মর্মবিদারী তীরের পাশে পাশে রয়েছে একটি মাত্র হৃদয়বিদারণকারী বাক্য—'অনুসন্ধান করো'। সতেরো পৃষ্ঠার শেষ সাঁইত্রিশে, তিপ্পান্নর মাঝখানে বিরাশির ল্যাজ, বাহাত্তরের মুড়ো এক-চল্লিশের কোণে! আগা-গোড়া কিম্ভূত-কিমাকার! এরকম স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অনুসন্ধান করাবার অর্থ কি?

অর্থ? অতি সোজা। বইটা তো আর ছোটলোক লেখকদের মত একাসনে ব'সে হুড়মুড় ক'রে লেখা নয়, এ যে অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা, অনেক বিবেচনার ফল! লেখার পর পরিবর্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করতেই তো এগারো মাস লেগেছিল প্রায়।

নাটু মনে মনে হিসেব করলো এই তীরগুলি একত্র করলে অনায়াসে ভীষ্মের মত একটা শরশয্যা তৈরী হ'তে পারে। কিন্তু কার জন্যে? নাটুর জন্যে? না আর কারুর জন্যে? কিন্তু থাক সে-কথা, আপাততঃ এই সিদ্ধান্ত করা যায়—মৃত্যু নাটুর অনিবার্য, হয় কাকার হাতে, নয় কলম হাতে।

নাটু ভাবলো, তা' মরতে যখন হবেই তখন খেটে মরব কেন? দূর করো লেখা! বীর নাটু কা'কেও ভয় করে না।

নাটু উঠে গেল টেবিল ছেড়ে।

... ...

হঠাৎ ভাঁড়ার-ঘরের কোণে নাটুকে আবিষ্কার ক'রে ঠাকুমা অবাক! বললেন—'কে রে নাটু নাকি? এখানে তুই কি করছিস্?'

নাটু হাত দুটো পেছনে জড় ক'রে আছে, কথা নেই মুখে।

ঠাকুমা আবার বললেন, 'আচার চুরি করছিস বুঝি? বুড়ো ছেলে, এ কি 'পিরবিত্তি'! ছিঃ জাতজন্ম আর রাখলে না—মা মা মা!'

'বাঃ রে! আচার আমি কোথায় নিলাম?'

'তবে কি রয়েছে তোর হাতের ভেতর?'

'ও কিছু না, আমার নিজের জিনিস।'

'চালের জালার পেছনে 'নিজের জিনিস' কি? আমাকে ন্যাকা বোঝাচ্ছিস্? অত বুড়ো-হাবড়া এখনও হই নি রে, চোখ-কান আছে এখনও। কুল, তেঁতুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়েই পচালে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।'

নাটু দেখলো কথা বাড়ানো বিপদ, চোর অপবাদ নিয়েই আস্তে আস্তে স'রে পড়ল সে।

ভাঁড়ার-ঘর ভ'রে গঙ্গাজল ছড়াতে ছড়াতে ঠাকুমা গজ্‌গজ্‌ করতে আরম্ভ করলেন—'ছিঃ, কোন্ আস্তাকুঁড় থেকে বেড়িয়ে এসেছে কে জানে? রাতদিন তো কুকুর ঘাঁটছে। আচার-বিচার আর রইল না বাবা!'

তা' নাই থাক, কত জিনিসই তো থাকে না! এই যে—নাটুর প্রাণটাই যেতে বসেছে, কেউ তা'র হিসেব রাখছে?

সেজকাকার হুকুম ছিল, রাত্রে শোবার সময় তাঁর কাছে রেখে আসতে হবে 'ক্ষুরের ধার' (অমূল্য পুস্তকখানির ওই নাম)। কি জানি বাইরে প'ড়ে থাকলে যদি চুরি-টুরি যায়! হয়তো নিজের নামে ছাপিয়ে নিয়ে কেউ জন্মের মত অমর হ'য়েও যেতে পারে।

সেজকাকা সেদিন একটু যেন প্রসন্নমনেই বসেছিলেন, অবিশ্যি কারণও একটু ছিল, পরের 'পাসে' বায়োস্কোপ দেখে এসেছিলেন। কাজেই খুশী হবারই কথা, নইলে অকারণ প্রসন্ন থাকবার পাত্র তিনি ন'ন।

সেজকাকা বসেছিলেন। নাটু এসে একটু কেসে, মাথাটা একটু চুলকে করুণ সুরে যা' বললো, তার তাৎপর্য হচ্ছে সেজকাকার ড্রয়ারের চাবিটা পেলেই নাটু এইবেলা বইখানি উপযুক্ত যত্ন সহকারে সুরক্ষিত ক'রে রেখে আসে।

চাবিটা পকেট থেকে ফেলে দিয়ে সেজকাকা জানতে চাইলেন আর কতটা বাকী।

নাটু জানালো বাকী বেশী নেই, কালকের মধ্যেই হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু ঘাড় হেঁট ক'রে হাসল কেন নাটু? অকারণে? তাও কি সম্ভব? চাবিটা হাতে পেয়ে কিছু বাগাবার মতলব নেই তো? ছেলেটাকে তো নিরীহ ব'লেই জানতাম, কি জানি! না না—চাবি তো তদ্দণ্ডেই ফিরিয়ে দিয়ে গেল, বাগাবে আবার কি? শুধু শুধু মানুষকে সন্দেহ করতে নেই।

... ...

সেজকাকার ড্রয়ারটি যেন 'হালুম বুড়োর ঝুলি'। তা'তে নেই এমন জিনিস নেই, ছুঁচটি থেকে হাতীটি পর্যন্ত সবই মেলে। বাড়ীসুদ্ধ লোক চায়ও ওঁরই কাছে সে-সব জিনিস।

সকালবেলা ছোটকাকা ভোঁতা পেন্সিল হাতে এসে হাজির, 'সেজদা, ছুরি আছে? দাও তো একবারটি—'

'এই যে আমার কাছেই আছে', পকেট থেকে বের ক'রে দিলো নাটু।

ঠাকুমা এসে বললেন, 'বটু, একটা সরু ছুঁচসুতো দিতে পারিস বাবা? হরি-নামের মালাগাছটা ছিঁড়ে গেল, এই বেলা গেঁথে নিতাম।'

নাটু একপায়ে খাড়া, বললো 'দাঁড়াও ঠাকুমা, এনে দিচ্ছি, খুব ভাল ছুঁচসূতো আছে।'

মা'র বোনার বাক্স থেকে খুঁজেপেতে সেযাত্রা উদ্ধার হওয়া গেল। কিন্তু নাটু তো আর সত্যি কল্পতরু নয়! আর মজাটি দেখ, বাড়ীসুদ্ধ লোকের যেন আজই সেজকাকার ড্রয়ারের ভিতরকার যত সব সৃষ্টিছাড়া জিনিসের দরকার হ'লে!

মেজকাকা একগোছা খোলা কাগজ নাড়তে নাড়তে ঘরের দোরে এসে দাঁড়ালেন, 'বটুক, পেপার-ক্লীপ আছে রে? দে তো দুটো!'

পেপার-ক্লীপ? হোপলেস্! আর নাটুর দ্বারা চলে না। যাক, যা' থাকে কপালে!

সেজকাকা খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে উঠলেন, ড্রয়ার খুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যা করলেন এক সেকেণ্ড আগে তা' কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। ভদ্রলোক হঠাৎ একটা পৈশাচিক চীৎকার ক'রে উঠে হাত-পা আছড়ে ঘরের মধ্যে একটা ঝড় বইয়ে সশব্দে মেঝেয় প'ড়ে গোঁ-গোঁ শুরু করলেন।

পায়ের ধাক্কায় চেয়ার উল্টালো, টেবিল কাত হ'ল, দুটো চায়ের পেয়ালা প'ড়ে ভাঙ্গলো! আর সব চেয়ে দুঃখের কথা, যা' দেখে নাটুর মনেও বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল, বড় একটা পাথরের দোয়াতদানী সেজকাকার পায়ে প'ড়ে রক্তপাত পর্যন্ত ঘটে গেল। আহা!

মেজকাকা কাগজের গোছা ঘরময় ছড়িয়ে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ী ঘরের দোরে। ভাঁড়ার থেকে বঁটি হাতে ঠাকুমা, রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বামুন ঠাকুর, বাসনমাজা ছাইমাখা হাত নিয়ে অন্নদা-ঝি, তা' ছাড়া আরও যে যেখানে ছিল—সব এলো। সকলের মুখে এক কথা, 'হয়েছে কি?' 'হয়েছে কি?' হয়েছে কি তা' তো কেউই জানে না। যিনি জানেন তিনি তখনও প'ড়ে প'ড়ে কাতরাচ্ছেন। পা-টা বেশ কেটেছে। নাটুর শরীরে দয়া আছে বলতেই হবে, কারণ ও-ই তো আইডিন, তুলো, ছেঁড়া-ন্যাকড়া খুঁজেটুজে নিয়ে এলো।

অনেক চেষ্টার পর সেজকাকার মুখ থেকে কথা আদায় করা গেল, 'সাপ! একটা নয়, দুটো! ড্রয়ার খুলতেই দু'দিক থেকে দুটো লাফিয়ে নেমে গেল।'

সাপ! ড্রয়ারের ভিতর সাপ! ঠাকুমা দেখছেন রক্ত, শুনলেন 'সাপ', আর

কথা আছে? তিনি হঠাৎ 'বাছাকে আমার সাপে খেলো গো—বাছা আমার বুঝি আর বাঁচে না গো'—ব'লে পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করলেন।

ঝি অন্নদা ছাইমাখা হাতটা বালতির জলে ভাল ক'রে ধুয়ে এসে চোখে কাপড় তুলে দিল।

সেজকাকার বৌদি'দের তো মুখ শুকিয়ে আমসী! তাঁর বড়দা' মোটা মানুষ, তিনি আগেই ব'সে পড়েছিলেন, এখন দেখেশুনে ভির্মি যাবার যোগাড়! শুধু মেজদা' মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ছোটভাইকে ডাক্তারবাড়ী পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে যখন নিজে ওঝা ডাকতে যাচ্ছেন, নাটু আর থাকতে না পেরে কাতরকণ্ঠে ব'লে উঠল, 'মেজকাকা, সাপ নয়।'

'সাপ নয়? কি তবে? কে বললে? কি ক'রে জানলি? সাপ নয় তো কি?'

পরীক্ষার প্রশ্ন কি এ প্রশ্নের চাইতে কঠিন? নাটু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে ব'লে উঠল, 'সাপ নয়, নেংটি ইঁদুর।'

'নেংটি ইঁদুর! কাদের ইঁদুর? কিসের ইঁদুর? কে বললে?'

নাটু নিরুত্তর।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি কাতরাতে কাতরাতে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—'সাপ নয়, নেংটি ইঁদুর! ইয়ার্কি মারতে এসেছো! নিজের চোখে দেখলাম সাপ, সড়সড় ক'রে চ'লে গেল—বলে কিনা ইঁদুর!···ওরে বাবা রে, ওরে গেলাম রে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি সঙের মতন সব? সর্বাঙ্গ যে বিষে ছেয়ে গেল রে বাবা! ওঝা-ফোজা তোমরা ডাকো না গো—'

মেজকাকা এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্তভাবে বললেন, 'পা-টা কেটে গেছে দেখছি দোয়াত দিয়ে। ওটা বোধ হয় ইঁদুর-টিঁদুরই হবে, কাগজ-ফাগজ কুচিয়েছে দেখছি।'

একথা শুনে হঠাৎ কিসের আশঙ্কায় বটুক সেনের কদম-কেশরের মত চুলগুলো সজারুর রোমের মত খাড়া হ'য়ে উঠল, আর পরক্ষণেই তিনি বিকারের রোগীর মত লাফিয়ে উঠে ড্রয়ারটাকে টেনে নামালেন। ড্রয়ার দেখে কারও সন্দেহ করবার কিছু থাকল না যে, একরাত্রের মধ্যে এই কাগজের গাদা কুচিয়ে ছাতু করবার ক্ষমতা সাপের বাবারও নেই, ও একমাত্র ইঁদুর মহাপ্রভুর পক্ষেই সম্ভব। ড্রয়ার ভর্তি ছিল অগাধ কাগজের কুচি।

বটুক সেন করুণ নয়নে তাকিয়ে দেখলেন, তুচ্ছ নগণ্য দুটো নেংটির দাঁতের ধারের কাছে তাঁর 'ক্ষুরের ধার' পরাজয় মেনেছে।···

'তার পর?'

তার পর আবার কি? সকালবেলা মিছামিছি একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বাড়ীর লোকের কাজ কামাই করানোয় সকলেই বিরক্ত হ'ল।

ঠাকুমা অর্থাৎ বটুকের মা, হাতের মালা কপালে ঠেকিয়ে ঠোঁট উল্টে ব'লে গেলেন, 'ছেলের বয়স হচ্ছে—না খোকা হচ্ছে দিন দিন!'

দাদারা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কিম্ভূত!' বোনেরা বললেন, 'ঢং!' বৌদিরা মুখ টিপে হাসলেন মাত্র। আর অন্নদা-ঝি তারস্বরে ঘোষণা ক'রে গেল—'কলের জল চ'লে গেছে, বাসন মাজা আমাকে দিয়ে চলবে না, সেজবাবু যেন এর একটা বিহিত করেন।'

আবারও বলছ—'তার পর?'

তার পরও আবার ব'লে দিতে হবে? কেন তোমাদের কি কল্পনা-শক্তি ব'লে কিছু নেই নাকি?

নাটুর কথা জানতে চাইছ? ওঃ তাই বল। সে তো আগেই তালতলায় তা'র বড় পিসীর বাড়ী গিয়ে উঠেছে, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে আসবে ব'লে তো মনে হয় না।

বন্ধু-বাৎসল্য

ম্যাট্রিকের গেজেটে খোকনের নাম খুঁজে না পেয়ে, সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এটা কেউই আশা, মানে আর কি, আশঙ্কা করে নি।

অবশ্য 'খোকন' বলতে যে জীবটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে ম্যাট্রিকের গেজেটের সম্বন্ধ ততটা নেই, যতটা অয়েলক্লথ পেরাম্বুলেটারের সঙ্গে আছে। কিন্তু 'চির-খোকা' ব'লে একরকম জীব আছে জগতে, কথা হচ্ছে তাদের

নিয়ে। দুর্ভাগ্য তাদের যারা 'খোকাত্বের' পারমানেন্ট পোস্ট পায়। স্কুলের জীবনে না-হয় ওটা কোনরকমে বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। যখন ধর, যে পার্কার পেনটা ইচ্ছাকৃত অসাবধানে কামড়াতে কামড়াতে, আর রিস্টওয়াচ্‌টার উপর মিনিটে তিনবার চোখ বুলোতে বুলোতে কলেজে যাওয়া-আসা করছে, 'সেলের' চশমার ভিতর দিয়ে পৃথিবীখানাকে দেখছে হাঁড়ির মুখের সরাখানার মতন—তখনও তো ঐ 'খোকন' নামটাই থাকে!

অথবা যখন 'রিম্‌লেস্' চশমাখানা কায়দা ক'রে নাকের উপর বসিয়ে মক্কেলের ব্রীফ্ দেখছে, কি রোগীর প্রেস্কৃপ্‌শন লিখছে, নয় তো লম্বা লম্বা চেকই কাট্‌ছে, তখনও তো সেই 'খোকা' ছাড়া আর কিছুই নয়! বেশী কথা কি, নাতি-নাতনীর ঠাকুরদাদা হ'য়ে তামাক খাচ্ছে, তখনও তাঁর বড় জেঠীমা কি সেজপিসীমা এসে বলবেন, 'খোকা, বেলা হ'য়ে গেল—কখন নাওয়া-খাওয়া করবি?' বুঝে দেখ ব্যাপারখানা!

'খোকা'র ভূত একবার যার ঘাড়ে চেপেছে, ইহজীবনে তার আর নিস্তার নেই। এদিকে দেখ নাতি-নাতনীরা আঁতুড়-ঘর থেকেই 'মন্দারকুসুম', নয় 'সরোজরঞ্জন,' কি 'দিব্যেন্দুবিকাশ' গোছের নাম নিয়ে বেরিয়ে আসছে, কারণ ঠাকুর্দামশাই সেই সর্ববাদীসম্মত সনাতন নামটি অধিকার ক'রে ব'সে আছেন। এতে যদি তারা ঠাকুর্দা মশাইকে যথোপযুক্ত 'মান্য' করতে না পারে, তাতে রাগ করা যায় কি? তোমরাই বল! আমাদের খোকনও হচ্ছে সেই 'চির-খোকা'দেরই একজন! অবশ্য ঠাকুর্দা এখনও হয় নি। কিন্তু হবে তো?

সে যাক্, পরীক্ষায় ফেল হ'লে আত্মীয়-স্বজন স্তম্ভিত না হবে কেন? ছেলেটি তো কোন কালেই 'নীরেট' নয়! ক্লাস-প্রমোশনে সমানেই ভাল হ'য়ে এসেছে, ফার্স্ট সেকেণ্ড ছাড়া কথাই ছিল না!

সেদিনটার কথা খোকনের চিরকাল মনে থাকবার মত। কারণ, 'কানাঘুষো' শুনলেও কথাটা ভাল ক'রে কেউ বিশ্বাস করে নি! মানে খুব বেশী আপত্তিকর ব্যাপারটা লোকে ইচ্ছা ক'রে বিশ্বাস করতে চায় না কিনা! আজ আর সন্দেহ করবার কিছু থাকল না! গেজেট খুঁজে নাম পাওয়া না গেলে আশা করবার আর কি বাকী থাকতে পারে? খবরটা আমদানি করলেন প্রথমে সেজদা। বেশী চেঁচামেচি

করতে তিনি ভালবাসেন না, অল্প বয়েসে ভুঁড়ি হ'য়ে যাওয়ার দরুন কিছু বিপন্ন, কিছু কুণ্ঠিত। ভুঁড়ি কমাবার জন্যে ইংরেজি বাংলা যত রকম প্রক্রিয়া আছে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে চলেছেন, তবু কিন্তু নিষ্ঠাবান ভুঁড়িটি আপনার সনাতন আসনে অচল অটল।

সেজদা ততক্ষণে চোখের উপর হাতটা আড় ক'রে সংসারের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় অনেক কিছু চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন, খানিক পরে আস্তে আস্তে বললেন—'আচ্ছা যেতে পার এখন (অর্থাৎ 'দূর হও')—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও (অর্থাৎ কিনা —'আমি এখন স্বপ্ন দেখব')।'

খোকনও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেচারা সবে মাত্র সাঁতারু ক্লাব থেকে ফিরছে। ভিজে তোয়ালেটা শুকোতে দিতে গিয়ে সেজদা'র ডাকে কাঁধে ফেলেই চ'লে এসেছে, 'ফর নাথিং' জামাটাই ভিজল।

সেজদা' সম্বন্ধে ব্যাপারটা যত নিরুপদ্রবে কেটে গেল, মেজদা'র বেলায় কিন্তু তা' হ'ল না। হবার কথা নয়। তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ, রোগা চটপটে চেহারা, অনর্গল কথা বলেন, কাউকে বকবার সুযোগ পেলে তার একতিলও অপব্যবহার করেন না। গলাটা ঈষৎ 'খোনা', বকাবকির সময় সেটা ভাল রকমই প্রকাশ পায়। ঢোকবার আগেই চেঁচাতে চেঁচাতে আসছেন, 'কোথায় গেল সেই স্টুপিড, শূয়ার, রাস্কেল, নন্‌সেন্সটা? আমি এঁকবার দেখতে চাই তাকে। খোকা—!'

খোকন বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় গুঁজে এসে দাঁড়ালো। চেহারায় বিনীত ভাবটা মোটেই ফুটল না। আসল কথা, ও মেজদাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। না হয় ম্যাট্রিক ফেল করেছে, তাই ব'লে কি ওর ষোল বছর বয়স হয় নি? সাঁতারু ক্লাবের মাস্টার, রামমোহন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান কি ওকে 'আপনি' ব'লে কথা কন না? এত গালাগাল কিসের বাপু?

মেজদা' ওর সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়া আধ-ঘণ্টা গালাগাল, আর লেকচার দিলেন। তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে—এরকম কুলাঙ্গার ছেলে তাঁদের বাড়ীতে আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করে নি! লোকের সামনে তাঁদের ভাই বলে সে যেন পরিচয় না দেয়, ইত্যাদি অনেক কিছু। বড়'দা অবশ্য একজন আছেন, কিন্তু তিনি জেঠতুতো ভাই—আলাদা

বাড়ীতে থাকেন। এসে গালমন্দ ক'রে যাবেন এ সম্ভাবনা কম। তারপর বাবার পালা।

বাবা শুনে গুম হয়ে গেলেন, কিছুই বললেন না। লাভের মধ্যে এক পেয়ালা চা বাঁচল। বাবার যে কারণেই রাগ হোক, চায়ের পেয়ালা ছাড়া সেটা বড় কেউ জানতে পারে না।

তারপর এলেন ছোড়দা'—শুধু ন'দার বকুনিটা মুলতুবী রইল; কারণ তিনি অনুপস্থিত, দূরে থাকেন। ইঞ্জিনীয়ার মানুষ হ'লেও কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ কবি। পাসের খবর শুনলে পাতা দেড়েক টেলিগ্রাম একখানা করতেনই নির্ঘাত। ফেলের খবরে ছ'পাতা আন্দাজ চিঠি একটা লিখে ফেলবেন খুব সম্ভব। আর তাতে 'আশা' 'নিরাশা' 'বর্তমান' 'ভবিষ্যৎ' 'চাকরির বাজার' 'পাস করার উপকারিতা', ইত্যাদি অনেক কিছু বড় বড় কথা থাকবে আশা করা যাচ্ছে। ভদ্রলোকের একমাত্র শখ বই কেনা। যা' রোজগার করেন, তার অধিকাংশ বইয়ের দোকানে যায়। বই নিজে পড়বার সময় পান না, অন্যকে খুব ঠেসে পড়াতে চান। আশা ছিল খোকন একবার পাস করলে হয়! তাঁর চিঠিটার জন্যেই খোকনের একটু উদ্বেগ থেকে গেল। যা' হবার একদিনে হ'লেই ভাল হ'ত। কিন্তু জয়পুর থেকে চিঠি আসা একটু পরের কথা। খোকন যখন সবে 'দ্বিতীয় ভাগ' ধরেছে তখন তাকে 'বলাকা' পড়াবার জন্যে ন'দা'র সে কী আপ্রাণ চেষ্টা—খোকনের আজও তা' বেশ মনে পড়ে। ভয় ন'দা'র চিঠিটাকেই বেশী!

যা হোক ছোড়দা' এলেন। তাঁর এম. এস্-সি'র প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস, আসতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়। এম. এস্-সি'র ছাত্র ছাড়া জগতের সকলের উপর তাঁর দারুণ অবজ্ঞা। যে ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি তাকে গালিগালাজ করবার মতন ছেলে-মানুষি তাঁর নেই। যে এম. এস্-সি পড়ে না, সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র। তাই তিনি খোকনের মুখের দিকে মিনিটখানেক ঘাড়টি কাত ক'রে তাকিয়ে থেকে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'বাঃ! খোকন, বেড়ে!'

অবিশ্যি পিত্তি জ্বলবার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। খোকনও জ্বলে উঠল, বললো, 'যাও, যাও, ভারী তো এম. এস্-সি পড়ছেন! ঢের এম. এস্-সি দেখেছি, হুঁঃ! কত এম. এস্-সি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। ইচ্ছে ক'রেই তো ফেল্ করেছি। তোমার মতন

কায়দা শেখার চেয়ে ফেল্ করা ঢের ভাল।'

ছোড়দা' ঘাড়টি আর একদিকে কাত ক'রে, আধ মিনিট ঠায় চুপ ক'রে থেকে মুচকি হেসে বললেন, 'না-কি ?'

লক্ষ্মীদি মানে গত বছরও খোকন যাকে 'লক্ষ্মী' ব'লে ডেকেছে এবং বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পর একটা 'দি' জুড়েছে মাত্র, তিনি এতক্ষণ দিদিগিরি ফলাবার সুযোগ না পেয়ে ছটফট করছিলেন। ছোড়দা'কে পৃষ্ঠপোষক পেয়ে তেড়ে এলেন। এসেই হাত নেড়ে বেশ বিজ্ঞের মত বললেন, 'সত্যি সত্যি খোকন করলি কি ? এ্যাঁ ?'

'কি আবার করেছি ? ফেল্ করেছি।'

'ছিঃ ছিঃ ! বলতে একটু লজ্জা করল না ?'

'মোটেই না।'

'আমার যে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে রে !'

'স্বচ্ছন্দে দিতে পার, তাতে পৃথিবীর ভার কমে।' (এ তো আর সেজদা'র সামনের খোকন নয়।)

'লোকের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো রে ? মা-মা-মা, শেষকালে কিনা ম্যাট্রিক ফেল্ !'

'মুখ না দেখানোই ভাল, জগতের লোক একটা কু-দৃশ্য থেকে অব্যাহতি পায়।'

'আরে গেল যা ! বেহায়া ছেলে ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! যা' ইচ্ছে তাই বলছিস যে ?'

কথায় না পেরে, লক্ষ্মীদি' শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, অর্থাৎ কিনা, তিনি মায়ের উদ্দেশে বললেন 'দেখ না মা, খোকন বাঁদরটা যা' ইচ্ছে তাই বলছে। ফেল্ ক'রে লজ্জা নেই শরীরে !'

মা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, ঘটনাস্থলে এসে যা' রায় দিলেন সেটা হ'ল বরং খোকনের পক্ষেই। ভদ্রমহিলা স-খেদে বললেন, 'এক 'ফোঁটা' ছেলে (যদিও ঐ ফোঁটাটি তাঁর চাইতে বিঘৎখানেক লম্বা) কি পড়ে, কি করে আপনার মনে, কেউ একটু দেখও না শোনও না, একটা মাস্টার রাখার নাম নেই, ফেল্ করবে না তো কি করবে ? ঠাট্টা করবার বেলায় তো সবাই দল পাকিয়ে দাদাগিরি, দিদিগিরি ফলাতে পারেন,

আর ছোট ভাইটাকে দু'বেলা একটু পড়ালে সব যেন ক্ষয়ে যান। (ছোড়দা' ইত্যবসরে চম্পট দিয়েছেন—কারণ, তিনি ভালই জানেন যে আক্রমণটা এবার ব্যক্তিগত হ'য়ে দাঁড়াবে)! ফেল্ করেছে তো বেশ করেছে! মুখ্যু মার মুখ্যু ছেলে হবে না কি হবে?'

তাঁর কোন ছেলেই পরীক্ষা-সাগর পার হ'তে কখনও নাকানি-চুবোনি খায়নি, সব ছোট ছেলেটি এরকম হওয়াতে একটু আঘাত পাওয়া বিচিত্র নয়, বিশেষতঃ খোকনের ওপর তাঁর চিরদিনের অগাধ বিশ্বাস। নইলে মাস্টারের নাম তো তাঁর মুখে এই প্রথম শোনা গেল। সে-সব তিনি ভালই বাসেন না। কারণ, তিনি জানেন মাস্টার-ফাস্টার রাখলে ভাল রেজাল্টের গুণটা মাস্টারেই বর্তায়, আর খারাপ করলে সবাই বলে, 'ছিঃ ছিঃ, এত চেষ্টা সব বৃথাই হ'ল! টাকাগুলো জলে গেল!' এ ছাড়া কেউ কিছু বলবে না।

লক্ষ্মীদি' 'শেষ চেষ্টা' করতে চেষ্টা করলেন। বললেন—'আহা! কি একেবারে কচি খোকা গো! 'খোকন' ব'লে আর বয়স হচ্ছে না? ষোল বছরের ধাড়ী ছেলে! ও বয়সে ছোড়দা' না ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ে?'

'আচ্ছা তা' জানি। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয় বাছা?'

খোকন হতাশভাবে আলোর বাল্‌বটার দিকে তাকিয়ে রইল। বকুনি, গালাগাল তবু সহজে হজম করা যায়, কিন্তু এই সহানুভূতি জিনিসটা ভীষণ গুরুপাক, একেবারে দুষ্পাচ্য বললেও চলে।

অভিমন্যু বধ করতে সপ্তরথীর যে রথীটি বাকী ছিলেন এবার তিনি রণস্থলে প্রবেশ করলেন। তিনি আর কেউ ন'ন, স্বয়ং শ্রীমতী খুকী। ক্লাস-ফ্রেণ্ডের জন্মতিথির নেমন্তন্ন ছিল, এইমাত্র বাড়ী ঢুকেই সুখবরটি সে সংগ্রহ করেছে। আর তাকে পায় কে? কাঁধের সেফটিপিন্‌টা খুলতে খুলতে ছিটকে সিঁড়ির তলায় প'ড়ে গেল। তা' যাক্। এখন উপরে যেতে পারলে হয়!

উপরে যেয়েই খুকী প্রশ্ন করলো, 'হ্যাঁ খোকন-দা'! তুমি নাকি ফেল্ করেছ?'

যে রকম আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করা হ'ল, অনায়াসে বলা যেত 'হ্যাঁ খোকন-দা', তুমি নাকি ইংলণ্ডের রাজা হয়েছ?'

খুকী খোকনের চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট হ'য়েও তিন ক্লাস নীচে পড়ে। খোকন কারণে অকারণে 'তুপীদিদি', 'গাম্‌লীমুখী' (বেচারার মুখটা শরীরের চেয়ে একটু বড়, এই অপরাধ) ব'লে তাকে ক্ষ্যাপায়। আজ তার শোধ না নিয়ে কি সে ছাড়বে? খোকন-দা'র ফেল্ হবার জন্যে ও কি পাঁচসিকে বাতাসা মানত করে নি? খুকীর জীবনে আজ তো একটা স্মরণীয় দিন! 'খুকীটা হাঁদা—ছেলে তো খোকন!'—এমন কথা সে তো অনেকের মুখে অনেকবারই শুনেছে, কিন্তু এইবার? এইবার সবাই তাঁদের গুণধর খোকনের বিদ্যা টের পেয়েছে তো?

খুকী আবার বললে, 'কি খোকন-দা'? কি হ'ল? শেষ পর্যন্ত ফেল্? ভাগ্যিস নীলিমাদের বাড়ীতে গোলমালে কেউ জিজ্ঞেস করে নি!'

খোকন অবলীলাক্রমে একখানা বাঁধানো খাতা—যা' হাতের কাছে পেলো—খুকীর গাল লক্ষ্য ক'রে তাগ করলো যাতে ঠাস ক'রে চড়ের মত পড়ে। মা ব'লে দিয়েছেন, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে আগামী জন্মে নাকি 'নুলো' হয়! খোকন তাই আর হাত তোলে না। তবে বইটা, খাতাটা, ঢিলটা তোলে, তা'তে তো আর দোষ নেই, কি বল?

আর যায় কোথা? খুকীর সুর সপ্তমে উঠল, 'ও মা—আ—আ—, খোকন-দা' আমার কান-বালা ভেঙ্গে দিলে, বুড়ো ধাড়ী ছেলে ফেল্ ক'রে আবার ফুটুটুনি করতে এসেছেন!'

খোকন দাঁত চিবিয়ে বললে, 'যা, যা, 'ভানুমতী বিদ্যালয়' ভাগ্। এ তোর দিদিমণির ইস্কুল পেয়েছিস কিনা যে নিয়মিত মাইনে দিলেই নম্বর পাওয়া যাবে!'

'আচ্ছা, আমার ভানুমতী বিদ্যালয় আমার আছে, অত আর মুখ নেড়ো না, ফেল ক'রে আবার কথা কইতে এসেছ!'

খোকন ছোড়দার অনুকরণে ঘাড়টি কাত ক'রে ব'লে গেল, 'সব ঢং!'

খোকন পড়ার ঘরে গেল। গিয়ে সশব্দে খিল দিয়ে, ড্রয়ার থেকে টেনে বার করলো (না আঁতকে উঠবার কিছু নেই। পটাশিয়াম্ সায়নাইডও নয়, রিভলবারও নয়, দড়ি-কলসীও নয়!) ডায়েরী খাতা! নিতান্ত নিরীহ বস্তু। ষোল বছর বয়সে ডায়েরীর খাতা থাকে না এমন ছেলে দুর্লভ, খোকনের থাকবে এটা কিছু আশ্চর্য নয়।

খাতাখানা খুলে কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে ভেবে নিয়ে, খোকন খস্-খস্ ক'রে লিখতে আরম্ভ করলো।

পরের চিঠি আর পরের ডায়েরী পড়া বে-আইনী বটে—তবে গল্প-লেখকের পক্ষে নয়। গল্প-লেখকেরা সবই করতে পারে। পার্লামেণ্টের গুপ্ত মন্ত্রণা-সভায় অনায়াসে ব'সে থেকে—বেওজর আস্ত মাথাটি নিয়ে বেরিয়ে আসাও তাদের পক্ষে কঠিন নয়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দাও।

তবে? অন্ততঃ আমার তো 'রাইট' রয়েছে পরের ডায়েরী পড়বার। কিন্তু এ যে দেখছি একখানা চিঠি! চিঠি কেন? বিবাগী হবে নাকি? কোথায় যাবে? পণ্ডিচেরী? না শবরমতী আশ্রম? আচ্ছা, 'হাতে পাঁজী মঙ্গলবার' কেন? পড়াই যাক্ না!

খোকন লিখেছে, 'প্রিয় গণেশ, আজ আমাকে সকলে মিলিয়া ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করিয়াছে! তা করুক, আমার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বন্ধুর জন্য আত্ম-বিসর্জন করিতে গেলে অনেক প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত বন্ধুত্বের মর্ম কয়জন বোঝে? সমস্ত বিশ্ব-বিখ্যাত মহাপুরুষই বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধর—টলস্টয় যখন—উঁহু, মনে পড়ছে না—নেপোলিয়ন—গ্যারিবল্ডী, শিবাজী—দূর ছাই, হাতের গোড়ায় তো শ্রীকৃষ্ণই রহিয়াছেন, বন্ধুর জন্যে মান-সম্ভ্রম খুইয়ে তিনি ড্রাইভারী করেন নাই কি?

অবশ্য এখনকার দিনে এরূপ বন্ধু-প্রীতি দুর্লভ, কিন্তু তোমার ন্যায় বন্ধুর জন্য আমি সবই করিতে পারি, পরীক্ষা দিতে গিয়ে সাদা পাতা রাখিয়া আসিয়া ফেল্ করা এমন আর বেশী কি? তাহা ছাড়া তুমি স্কুলে পড়িয়া থাকিলে, কলেজে গিয়া কাহাকে লইয়া 'নরক গুল্‌জার' হইবে? আজ ইহার জন্য এত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল, কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে এই অপূর্ব বন্ধু-বাৎসল্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—'

না, চিঠিখানা শেষ করতে দিলে না, দোরে সজোরে ধাক্কা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খুকীর গলার আওয়াজ এলো—'খোকন-দা'! শীগ্‌গির দরজা খোল, শীগ্‌গির!'

'কেন? হয়েছে কি? খুলব না! ভাগ্, 'গাম্‌লী' কোথাকার!'

'আচ্ছা বেশ, খুলো না। তোমার সেই গোবর-গণেশ বন্ধুটি নীচে এসে চেঁচামেচি করতে লেগেছেন, ভাগিয়ে দিতে চললাম।'

'যা, মিথ্যুক !'

'বেশ, আমি মিথ্যুকই থাকলাম, এর পর দোষ দিও না বলে রাখছি, এই চল্‌লাম তাড়াতে। "মিথ্যুক !" ভারী যেন অবাক কথা ! ওঁর বন্ধু গোবর-গণেশ আসাটা যেন লাটসাহেব আসার মত !'

খোকন এবার এক ঝট্‌কায় দোর খুলে, খাতাখানা হাতে নিয়েই হুড়মুড় ক'রে নেমে গেল।

গণেশ ওকে দেখেই মাথাটি নেড়ে ব'লে উঠল, 'কিরে সত্যেন, (খোকনের তা হ'লে নাম একটা আছে !) তুই নাকি পাস করতে পারিস নি ?'

খোকন একটু 'মিস্টিক' হেসে বললো, 'পারি নি নয়, করি নি।'

গোবর-গণেশ কিনা, কথাটার মর্ম গ্রহণ করতে পারল না বোধ হয়। বললো, 'ও একই কথা, কিন্তু তুই ফেল্ করলি কি ব'লে ! ফেল্ করব বরং আমরা ! তুই ফেল্ করবি এ তো স্বপ্নের অগোচর ! কারণটা কি বল্ দেখি !'

খোকন ঈষৎ গর্বিত, ঈষৎ রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে, খাতাটা গণেশের দিকে এগিয়ে দিলো, অবিশ্যি 'প্রিয় গণেশের'-পাতাটা খুলে।

গণেশ চিঠিখানার উপর চোখ বুলিয়ে সভয়ে স'রে দাঁড়ালো, বন্ধুর মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে—নাকি মার খাবার ভয়ে ?

গণেশকে স'রে যেতে দেখে খোকন বললো, 'কী হে, স'রে গেলে কেন ? এবার কারণটা বুঝেছ আশা করি !'

গণেশ আর একটু স'রে গিয়ে ঝাঁ ক'রে ব'লে ফেললো, 'কিন্তু আমি যে ভাই পাস করেছি !'

'তার মানে ? তুমি পাস করেছ ? জানতে চাই তার মানেটা কি ?'

'মানে ? গেজেটে নাম রয়েছে—!'

'বটে ? তুমি বলতে চাও গেজেটে তোমার নাম রয়েছে, অথচ আমার নেই ?'

'দেখছি তো সেই রকম—'

'তুমি ইয়ার্কি মেরে কলেজে যাবে, আর আমি পচা ইস্কুলে প'ড়ে থেকে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো ?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে!'

'তবে রে রাস্কেল! বড় যে বলেছিলি, শিবের বাবা এলেও আমায় পাস করাতে পারবে না?'

'ওটা সকলেই ব'লে থাকে—'

'সকলেই ব'লে থাকে? স্টুপিড, মাঙ্কি, শূয়ার, উল্লুক কাঁহাকার—'

'খামোকা গাল দিচ্ছিস যে?'

'গাল দেবো না? আলবৎ দেবো। খুন করব—"আই শ্যাল কীল ইউ"! হতভাগা জোচ্চোর! "সকলেই ব'লে থাকে!" একজামিন দিয়ে এসে সকলেই ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে থাকে? সারা বছর ধ'রে "নো হোপ, নো হোপ" ক'রে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে! পরীক্ষার আগে থেকে গেরুয়া কাপড় ছুপিয়ে রেখে থাকে, না?'

গণেশ একটু কায়দা ক'রে হেসে বললো, 'ওটা ফ্যাসান।'

'ফ্যাসান! বটে! তোমার এই ফ্যাসানের জন্যে আমার কি ক্ষতিটা হয়েছে জানো? বাড়ীতে—'

'বা রে! আমি তোকে ফেল করতে বলেছিলাম নাকি? তুই যে আবার এই কেলেঙ্কারি করবি তাই বা কে জানতো?'

খোকন গুম্ হয়ে গিয়ে, বুকের উপর ডায়েরীখানা ধ'রে, বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভাবে দু-একবার পায়চারি ক'রে নিয়ে গম্ভীরভাবে ব'লে উঠল, 'বেশ! যা' হয়েছে তো হয়েছেই। আশা করি তুমি আমার জন্যে এক বছর অপেক্ষা করবে।'

গণেশের কিন্তু তখন অবস্থান্তর দেখা গেল। সে হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠে খোকনের মুখের সামনে—বিশেষ আঙ্গুল দুটি নাচিয়ে নিয়ে সবেগে প্রস্থান করল।

'তারপর?'

তারপর আর কি? 'দুর্বাসা ও শকুন্তলা' ছবিখানায় শকুন্তলার মুখখানা দেখেছ তো তোমরা? না দেখে থাক তো একবার খোকনকে দেখে যেতে পার।

হো হো করে হেসে ওঠে বিশেষ আঙুল দুটি নাচিয়ে।

[পৃষ্ঠা—৩৪

জ্যান্ত মাছে পোকা

স্কুল-ম্যাগাজিনের জুলাই-সংখ্যাটা অনেক মেহনৎ ক'রে আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্রেসে দেবার উপযুক্ত ক'রে তোলা হয়েছে। শুধু প্রথম পৃষ্ঠার জন্য একটা লাইন কতকের কবিতার অভাব হচ্ছিল। বই খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠায় একটা কবিতা দেখতে না পেলে কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে। যদিও কেউই পড়ে না—এক লেখক নিজে ছাড়া। তবু আমার হাতে যখন ভার পড়েছে, জিনিসটা সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করতে হবে বৈকি।

চললাম ননীগোপালের সন্ধানে। বাবা! কি ঝক্‌মারির কাজ! কার্যাধ্যক্ষ কথাটার যে এতখানি মানে তা' আগে জানলে কোন্ ইডিয়ট্ সেধে এ ফাঁস গলায় পরতো?

ননীর ঘরেই তাকে পেয়ে প্রাণটা সুস্থির হ'ল। অবস্থাটা আশাপ্রদ। উপুড় হয়ে প'ড়ে কি যেন লিখছে—নিশ্চয়ই কবিতা। তা' নইলে এমন সুন্দর বিকেলবেলায় ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে প'ড়ে কেউ বোধ হয় 'ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ' মুখস্থ করে না। আশা হ'ল প্রার্থিত বস্তুটা নগদই পেয়ে যাব।

কষ্ট ক'রে না বললেও চলবে যে—ননী আমাদের একটি কবি। বড় বড় চুল-রাখা, কড়ে-আঙ্গুলে-লম্বা নখওয়ালা, হেজলীন-পাউডার-মাখা সাজা কবি নয়, দস্তুরমত লিখিয়ে কবি। সময় বুঝে বলতে পারলে যে কোন রকমের লাগ-সই একটা কবিতা ও লিখে দেবেই। এই তো সেদিন আশু মুখুজ্যের ছেলে ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ায় স্কুলে যে অভিনন্দন-সভা হ'ল, ছাত্রমহলের মুখপাত্র হয়ে ও-ই তো নিজের কবিতা নিজে আবৃত্তি ক'রে এলো। ফার্স্টক্লাস হয়েছিল কিন্তু! ও যখন আস্তে আস্তে আরম্ভ করল—

'অপার আনন্দ হৃদে ধরে নাকো আর—
আশুবাবুর পুত্র হলেন ভাইস্-চ্যান্সেলার।'…

তখন সকলেই বাহবা দিয়ে উঠেছিল—মাস্টার থেকে ছাত্র উপছাত্র সব। 'সুযোগ্য' 'মুখোজ্জ্বল' 'বঙ্গজননী' 'গৌরবে মহান' 'পবিত্র ব্রাহ্মণকুল' প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল কথা সে বেশ গুছিয়ে তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর কবির শক্তি তো ওইখানেই। মনে করুন—রাশি রাশি ভাল ভাল কথা আর ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ভাব, কার মগজেই বা গজগজ করছে না? কিন্তু অক্ষর গুণতি ক'রে ছন্দ গেঁথে ধোঁয়াটে ভাবকে পরিষ্কার ক'রে ফুটিয়ে তোলা কি একটুখানি কথা?

অন্য ছেলেরা ননীকে যাই বলুক, আমি কিন্তু আমাদের স্কুলে ননীর উপস্থিতি গৌরবের ব'লেই মনে করি। কবিদের ওপর আমার কেমন একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। ননীরও আমার ওপর একটু 'ইয়ে' আছে। শুধু কবিতায় যদি ম্যাগাজিনের পেট ভরানো যেত, তা' হ'লে জুলাইয়ের কাগজখানা জুন মাসে বের ক'রে ছাড়তাম নির্ঘাত। ননীর ধ্যানভঙ্গ না করেই আস্তে আস্তে পেছন থেকে উঁকি মারলাম। বলা বাহুল্য এ সময় ওকে ঠ্যালা না দিলে ধ্যান ভাঙ্গে না—যথার্থ সাধনার যা' লক্ষণ।

একটা কাগজে বড় ক'রে হেডিং দিয়ে কাটকুট ক'রে লাইন কতক লিখেছে! ভাল পড়া গেল না, খানিকটা ওর মাথার তলায় চাপা। হেডিংটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—'শোকোচ্ছ্বাস'। কিন্তু শোকোচ্ছ্বাস কেন? কিসের শোক? মালমশলা পেলোই বা কোথা? হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট বড় মাঝারি মাস্টার, পণ্ডিত, মায় দারওয়ান, মালী, দপ্তরী, ঘুগনীওলা, একসঙ্গে সবাইয়ের নাম আর মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠল। কই, এমন তো কাউকে দেখলাম না, সম্প্রতি শোকোচ্ছ্বাস লেখবার একটা 'চান্স' কবিকে দিয়ে গেছে? তবে কি ওর 'পার্সোন্যাল' কোনো—? আছেই বা ওর কে? এক বাপের কাকা, না মায়ের মামা গোছের দাদামশায় আছেন বুঝি—আপনার বলতে তিনিই সব। সুবিধে এই, ভদ্রলোকের আর কোন উত্তরাধিকারী নেই, তাঁরও যথাসর্বস্ব ওই ননী। তিনিই কি—?

আস্তে ডাকলাম—'ননী!' সাড়া নেই। ফিরে যাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু আমার নাকি কৌতূহল আর কাজ দুটোই প্রবল, তাই বাধ্য হয়ে একটু ঠ্যালা দিতে হ'ল, বললাম—'কি ননী, ঘুমুচ্ছ নাকি?' কথাটায় কাজ হ'ল—ননী মাথা তুলে বললো—'ঘুম? নাঃ ভাই!' সঙ্গে সঙ্গে একটু করুণ হাসি।

ভয়ে বললাম—'কবিতা লিখছিলে নাকি ?'

ননী একবার কড়িকাঠে চোখটা বুলিয়ে নিয়ে 'হতাশ গম্ভীর' স্বরে বললো—'কবিতাই বটে—বুকের রক্ত দিয়ে লেখা !'

ঘাবড়ে গেলাম—ননীর অবিশ্যি বরাবরই কথাবার্তা একটু থিয়েট্রিক্যাল, তাই ব'লে এতটা ? একটু ইতস্ততঃ ক'রে ঝাঁ ক'রে ব'লে ফেললাম—'হেডিংটার মানে বুঝছি না তো ?'

হঠাৎ ননী নেহাৎ অ-কবির মত 'ভেউ ভেউ' ক'রে কেঁদে উঠল—'আমার দাদামহাশয় আর নেই রে—এ অভাগার মায়া কাটিয়ে দিব্যধামে চ'লে গেছেন।'

যা' ভেবেছিলাম তাই—আহা বেচারা ননী ! শোকটা উচ্ছ্বসিত হ'তেই পারে, কিন্তু খবরটা পেলো কখন, দিলোই বা কে ? অথচ ইতিমধ্যে শোকোচ্ছ্বাসও লেখা হ'ল ! জিজ্ঞেস করলাম—'টেলিগ্রাম পেয়েছ ?'

ননী মাথা নেড়ে বললো—'আর কি দাদু আছেন ভাই ? সে বুদ্ধি আর কার হবে ? যত সব মুখ্যু ইডিয়েটের কাণ্ড ! নায়েব ব্যাটার চিঠি এসেছে একটা—'

ননীর মুখে সমানেই 'নায়েব মশায়' শুনে এসেছি, আজ দেখলাম শোকে দুঃখে ছেলেটার মাথা যেন বিগড়ে গেছে।

বালিশের তলা থেকে একটা পোস্টকার্ড বের ক'রে ছুঁড়ে বললো—'ব্যাটার আক্কেল ছাখ্ ! কিসে গেলেন, কবে গেলেন, সে-সব কিচ্ছু না, নেহাৎ যেন বাজে খবর একটা ! আপনার কথাই সাত কাহন !'

চিঠি পড়তে গিয়ে আমার তো আক্কেল-গুড়ুম ! কি লেখা রে বাবা ! উর্দ্দু না ফার্সি, তেলেগু না তামিল—তাই তো বুঝে উঠতে পারলাম না। নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার, মুদি এই লোকগুলো যেন বিধাতাপুরুষের কাছ থেকে একই মার্কার পেন নিয়ে ধরাধামে এসে অবতীর্ণ হয় ! আজ পর্যন্ত এই অবতারদের লেখার কোন তারতম্য দেখলাম না,—সেই কালো কালিতে ছোট ছোট অক্ষর, আর টানা টানা লম্বা লম্বা দাগ।

ননী আমার অবস্থা বুঝে নিজেই চিঠিটা প'ড়ে দিলো—ওর অভ্যাস আছে কিনা !

তোমাদের হয়তো শোনবার কৌতূহল হ'তে পারে, তাই লিখে দিলাম—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

সাং কুমারখালি
জিলা ২৪ পরগণা।

অশেষ স্নেহাস্পদভাজন নিরাপদ দীর্ঘজীবিতেষু—
শ্রীমান ননীগোপাল লাহিড়ী—

কার্য্যঞ্চাগে বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ অত্রপত্রে বাবাজী একটি দুঃসংবাদ জানাই যে,—পরশ্ব ১৯শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রে প্রবল ঝড়ে শ্রীশ্রী৺গোপাল জীউর মন্দিরের কিয়দংশ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরমধ্যে শৃগাল-কুক্কুরাদি প্রবেশ করিতেছে। ভোগ-রাগ প্রায় বন্ধ। সে কারণ জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বাবাজীবন অবশ্য অবশ্য করিয়া কতিপয় দিবসের জন্য জন্মভূমি পরিদর্শনার্থে আসিবেক। বোধহয় অবগত আছ, মহামহিম কর্তা মহাশয় ৺কাশীধামে গত হইয়াছেন। তিনি বিহনে এবম্প্রকার বিশৃঙ্খলায় আমি যারপরনাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। তুমি অতঃপর একবার না আসিলে আমি সুস্থির বোধ করিতেছি না। দেশে মিস্ত্রী-মজুর প্রভৃতি পাওয়া দুষ্কর, সকলেই দুরন্ত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও প্রায় শয্যাগত। বহু অর্থব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, আমি নিজের দায়িত্বে করিবার ভরসা করি না। কর্তা মহাশয় আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলিয়া গিয়াছেন। অধিক কি লিখিব। কুশল লিখিয়া সুখী করিবেক। ইতি তাং ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল।

নিত্য আশীর্বাদক—শ্রীব্রজদুর্ল্লভ ভট্টাচার্য

পুঃ—অতি অবশ্য আসিবেক। বাবা, বৃদ্ধেরা কিছু চিরদিনের নয়; নিজ বিষয়াদি সংরক্ষণাদি না শিখিলে আখেরে কি হইবে?

সত্যই তো—লোকটার আক্কেল কি? যেন কর্তা যাওয়ার চাইতে ওর মন্দির যাওয়াটাই গুরুতর বেশী। একটু হা-হুতাশ নেই, গৌরচন্দ্রিকা নেই, শ্রাদ্ধশান্তির কথা নেই কিচ্ছু,—আশ্চর্য!

ননীকে বললাম—'তোমার তা' হ'লে কালই যেতে হয়।'

ননী একটু মাথা নেড়ে বললো—'তা' তা' এখুনি তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ নেই। এটা শেষ ক'রে কালনাগাদ প্রেসে দেবো। মনে করেছি একখানা ফটোও লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না, আমার কাছে তো রয়েছেই। শ্রাদ্ধের দিন বিলি করতে হবে।'

লেখাটা দেখবার জন্য মনটা একটু উসখুস করল, কিন্তু দেখতে কেমন লজ্জা হ'ল।

খাচ্ছেই বা কি—স্টোভে ভাত রান্না, কোনদিন পোড়া, কোনদিন কাঁচা।

[পৃষ্ঠা—৩৯

ননীও কিছু উচ্চবাচ্য করলো না। অগত্যা কবিতার আশা ত্যাগ ক'রে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেলাম। ননীর দাদামশায়ের আর ঘণ্টাকতক পরে কাশীপ্রাপ্তি ঘটলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো ?···

ননীকে আমরা কবি ব'লেই এতদিন জানতাম। সে যে এমন ওস্তাদ ছেলে তা' কে ভেবেছিল ? এই তিন-চার দিন ধ'রে ওর পাত্তাই নেই। পেয়ারা-বাগান লেনে ওর কে এক ভবানীদাদা আছে, তাকে কর্ণধার ক'রে সারা কলকাতা শহরটা চষে বেড়ালো ! টোলে গিয়ে হবিষ্যির ব্যবস্থা নেওয়া থেকে—দ্বারিকের ওখানে সন্দেশের ফরমাস দেওয়া পর্যন্ত কিছু আর বাকী রাখলো না।

সকল সময়ই ব্যস্তসমস্ত ভাব। রুক্ষ চুলের গাদা, শুধু পা, গায়ে খড়ি উঠছে, চেহারা যেন কিম্ভূত-কিমাকার ! খাচ্ছেই বা কি—স্টোভে ভাত রান্না, নিজে পারেও না ছাই, কোন দিন পোড়া, কোন দিন কাঁচা। হবিষ্যির কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে আমাদের ডিমসিদ্ধ ও চায়ের জল গরম করবার স্টোভটাই গঙ্গাজলে ধুয়ে নিতে হয়েছে। রাত্রে যা' ছানাটানাগুলো খায়, তাই রক্ষে।

আজ বিকেল পাঁচটার ট্রেনে ও যাবে ঠিক হয়েছে। অশোকবাবু ছুটি দিতে একটু আপত্তি করছিলেন, গার্জেনের চিঠি না পেলে—খবরটা যথার্থ কিনা, এই সব বাজে ওজর। ননী বুঝিয়ে দিলো মৃত্যুটা এমন কিছু অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা নয় যে সন্দেহ করবার হেতু আছে। আর গার্জেনের চিঠি আনতে হ'লে যেখানে যেতে হবে, আপাততঃ ননীর সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই। আর সত্যি বলতে, ননী এখন ভয় করবে কাকে ? ও-ই তো এখন জমিদারির মালিক, পড়তে না চাইলেই বা কে কি বলবে ?

ননী আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে বার বার অনুরোধ করে রেখেছে যাবার জন্যে ; ওর সেই ভবানীদাদা যাবেন, আর সেইদিন দ্বারিকের লোক যাবে মিষ্টি নিয়ে। কপি যাবে দুশো, মটরশুঁটি আধ মণ—অসময়ের জিনিস পাড়াগাঁয়ের লোক চোখেও দেখে না এখন। ময়দা, চিনি, মেওয়া, পেশোয়ারী চাল থেকে ভিয়েনকর বামুন পর্যন্ত—অনেক কিছুর যাবার বন্দোবস্ত হয়ে আছে। ননীর তো আর থাকলে চলবে না, ওদিককার সব না দেখলে নয়।

বেলা একটা আন্দাজ সময়—মুটের মাথায় 'শোকোচ্ছ্বাসের' বোঝা চাপিয়ে ননী

প্রেস থেকে এলো। বাব্বাঃ একেবারে উনপঞ্চাশী কাণ্ড! সারা ভারতবর্ষে বিলোবে না কি! আপাততঃ স্কুলসুদ্ধ বিলানো হ'ল—ইনফ্যাণ্ট ক্লাসও বাদ গেল না।

শোকোচ্ছ্বাসটা চওড়া কালো বর্ডার-টানা বেগুনী কালিতে ছাপা—ফটোও দিয়েছে একটা। লেখাটা ছিল এরূপ ঃ

দাদা মহাশয়ের বিরহ বেদনায়
'অকৃত্রিম শোকোচ্ছ্বাস'

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত এ কি শুনি হায় রে—
শুনিয়া বিদরে বুক প্রাণ ফেটে যায় রে!
এমন দারুণ বার্তা শুনালো যে জন—
অবশ্য একদা তার ঘটিবে মরণ।
সহসা দাদুর নাকি প্রাপ্তি হ'ল কাশী—
আর না দেখিব সেই সুধামাখা হাসি।
আর না শুনিব সেই মধুময় বাণী—
আর না পড়িবে চোখে সেই মুখখানি।
আর না দেখিব সেই লম্বা সাদা দাড়ি—
ঠান্‌দি'র পরনে আর না দেখিব শাড়ী।
কে মোরে ডাকিবে আর—"ভায়া দাদামণি!"
কে খাওয়াবে কাছে ব'সে ক্ষীর সর ননী।
কে পাঠাবে দেশ থেকে গাদা গাদা টাকা—
হয়তো উইলখানা কর নাই পাকা।
আমার যা' হয় হোক পুরুষ কঠিন—
ঠানদি'র কি হইল ভাবি রাত্র-দিন।
মৎস্য বিনা ঠানদি'র যে রুচিত না ভাত—
কেমনে তুলিবে মুখে কচু শাক পাত?
প্রবীণা ঠানদি' তোমা' কি বোঝাব আর?
সকলি ললাট-লিপি—অনিত্য সংসার!

হতভাগ্য ননী

কোন কোন বিষয়ে ননীকে অনেকেই ঠাট্টা করে বটে, কিন্তু এটার বিষয়ে কারও বাস্তবিকই মতভেদ থাকল না। ফট্‌কে তো কেঁদেই ফেলেছিল, ও আবার একটু 'পান্‌সে' কিনা।

কাগজখানা নেড়ে বাতাস খেতে খেতে—ননী যে কালে একটা বড়দরের কিছু হবে তারই আলোচনা চলছে, এমন সময় গোবিন্দ এসে বললে—'ননীবাবু, আপনি একবার 'লাইবেরিলী' ঘরে যাও।'

গোবিন্দ ব্যাটা কথা কয়—যেন হুকুম চালাচ্ছে! ও চাকর, কি আমরা চাকর—সময় সময় স্মরণ করতে হয়।

কিন্তু ননীর তখন মেজাজ চড়া, সে বিরক্ত হয়ে বললো—'কেন, হয়েছে কি? বাবু যেন লাটসাহেব!'

গোবিন্দও নরম হবার পাত্র নয়, সমানভাবে জবাব দিলো—'লাটসাহেব গোবিন্দ লয় বাবু, লাটসাহেব দেখবে তো দেখ গিয়ে সেই তেনাকে, বসতে বলেছি বলে তো আমায় এই মারে তো এই মারে; নম্বা দাড়ি নেড়ে কত শাসিয়ে রাখলো, গোবিন্দকে দেখে লেবে—হঃ, গোবিন্দ যেন সবায়ের "নানাকালে" চাকর—অমন দাড়ি গোবিন্দ ঢের দেখেছে…'

গোবিন্দ যা' বকুকগে, আমাদের কিন্তু একটা কথা শুনে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। সকলের কথা জানি না, আমার তো উঠল। 'নম্বা দাড়ি!' ননীর আবার লম্বা দাড়িওয়ালা কে আছে? একটা কথা মাথায় এসে গেল বিদ্যুতের মত—সর্বনাশ! তা' হ'লে উপায়? কে জানতো বাবা, যে ননীর ওপর তাঁর এত টান ছিল? মৃত্যুকালে দেখা না হ'লে পরলোক থেকে এসে দেখা করবার কথা কানে শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ দেখতে হবে মনে ক'রে চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল—সর্বাঙ্গে সেই যে বইতে লেখে 'রোমাঞ্চ' না কি তেমনি ব্যাপার হ'তে থাকল।

ননীরও দেখি মুখ শুকিয়ে আম্‌সি—মেজাজ নরম হয়ে গেছে, আমতা-আমতা ক'রে বললো—'দাড়িওলা বাবু! কি রকম দেখতে? সঙ্গে কেউ আছে, না একলা?'

গোবিন্দও ধাতে এলো, বললো—'সঙ্গে লোক আছে বৈকি বাবু, উটপারা মুখ, গড়ুর পক্ষীর মত হাত জুড়ে ব'সে আছেন, তিনিও বড় কম লয়, আমায় বলে কি—"তুমি

কে হে বাপু, তোমায় ত কই দেখি নি।" গোবিন্দ ওঁয়ার সাতপুরুষের চাকর কিনা—তাই বাপ-দাদার আমল থেকে দেখে আসবেন! কত সায়েবের আপিসে কাজ ক'রে এলাম, একদিনের তরে কেউ কিচ্ছুটি বলতে পারলে নি। হরি হে তোমার-ই ইচ্ছে!'

গোবিন্দ কোন্ ক্লাইভের আমলে কোন্ চীনা সাহেবের দোকানে কাজ করেছিল জানি না, নিজে তো আজ পর্যন্ত ভোলে নি, আশেপাশে কাউকে যে ভুলতে দেবে সে ভরসাও নেই।

গোবিন্দ এখন গোবিন্দকে ডাকুক, আমাদের কিন্তু 'সঙ্গে লোক আছে' শুনে ধড়ে প্রাণ এলো, 'ওঁয়ারা' তো শুনেছি একলাই আসেন। দেখা যাক কে।

ননীও এবার ভরসা পেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামল।

আর কিছুক্ষণ গুলতানি ক'রে লোকটা কে এল দেখি ভেবে নীচে এলাম। এসে কি দেখলাম। বললে হয়তো লোকে পাগল ব'লে চাঁটি মেরেই বসবে, তবু বলি—

ননীর দাদামহাশয় স্বয়ং খোদ জলজ্যান্ত লম্বা দাড়ি আর বিশাল বপু নিয়ে চেয়ার আলো ক'রে ব'সে আছেন। সেই নায়েবমশায় (উটপক্ষীর মতই বটে) ঘাড়টি তুলে হাত নেড়ে কি বোঝাবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু মনে হচ্ছে ননী বুঝতে রাজী হচ্ছে না। গণ্ডগোল একটা কিছু হয়ে গেছে বুঝলাম, গুটি-গুটি ঢুকলামও ঘরের মধ্যে।

নায়েবমশায় আমাদের চেনেন—কলকাতায় এলেই এখানে ঘুরে যান। আমায় দেখে বলে উঠলেন—'এই তো বাপু, তোমরা শুনছি সকলেই পত্তরখানা পড়েছিলে—এ রকম "উনচুটে" খবর কোথায় আছে শুনি? "গত হয়েছেন" মানে "গমন করেছেন"—এ তো সোজাই প'ড়ে রয়েছে জলের মতন। এই ধর না কেন—কর্তামশায় এখন কলকাতায় আগত হয়েছেন, কয়েকঘণ্টা বাদে দেশে গত হবেন—ভুল কোথা হচ্ছে?'

সত্যি বটে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। অকাট্য যুক্তি! অগত্যা বললাম—'তা' বটে।'

দাদামশায় বললেন—'তা' তো বটে, অথচ ফলারের যোগাড়টি ক'রে তুলেছিলে মন্দ নয়। বলি হে বাপু, তোমাদের মাস্টারগুলিও কি ঘাস খেয়ে ছেলে পড়ায়?'

অপ্রতিভ হয়ে বললাম—'আজ্ঞে না, মানে আর কি—অর্থাৎ মাস্টারমশায়—ইয়ে—মানুষ তো আর অমর নয়, ননী তাই বোঝাচ্ছিল।'

'ঠিক বলেছ ভায়া—মানুষ তো আর অমর নয়—ফলার তোমাদের যাবে কোথা ?'

ননী গর্জে উঠল—'ফলারের জন্যে তো ভারী—একেবারে ! কেউ যেন খেতে পায় না ! হবিষ্যি খেয়ে পেটের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার খোঁজ রাখ !'

'কী সর্বনাশ ! আবার—হবিষ্যি !! কিছুই বাকী রাখ নি দেখছি ! সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন !'

ননী গোঁজ হ'য়েই থাকল—গজ-গজ ক'রে ও বললো—'হুঁঃ, এ শর্মাকে তেমন পাও নি। লোক নেমন্তন্ন, খাবারের ফরমাস, কলকাতার বাজারের ফর্দ—কোন্‌টা করতে বাকী আছে ? পদ্য পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেল !'

দাদামশায় একটু আশ্চর্য হ'লেন, বললেন—'পদ্য কিসের ? সঙ্গে সঙ্গে কারুর বিয়েও লাগছে নাকি ? তোমারই কনে জুটে গেল বুঝি ?'

ফস ক'রে পকেট থেকে পদ্যখানা বার ক'রে বললাম—'আজ্ঞে না, আপনার জন্যে শোকোচ্ছ্বাস লিখেছিল একটা—কাজে লাগল না, অনেক খেটেছিল ওর জন্যে বেচারা !'

দাদামশায় চশমাখানা নাকে লাগাতে লাগাতে বললেন—'তাই তো—ননী ভায়ার এতটা পরিশ্রম বাজে হয়ে গেল ? তাই তো—'

পদ্যটা পড়তে পড়তে দেখি ভদ্রলোকের ভুঁড়ি দুলে দুলে উঠছে—ছিঃ, লোকটা বড় হৃদয়হীন ! আমরা প'ড়ে কেঁদে ফেলেছিলাম, উনি একেবারে হাসির গ্যাস পাম্প-করা ফুটবলের মত ফুলে উঠছেন ! হ'লেই বা নিজের, শোকোচ্ছ্বাস তো ?

নায়েবটিও বড় কম যান না। দেখি আড়চোখে তাকাচ্ছেন, আর খুক-খুক কাশছেন, এটাও হাসি ঢাকবার ছল। ননী তো যে ক'রে তাকাচ্ছিল, সত্যযুগ হ'লে না জানি ভস্মই হয়ে যেতো বা।

দাদামশায় পদ্যখানি 'পকেটসাৎ' ক'রে বললেন—'তা' কিছু ভাবনার নেই, তারিখ বদলে দিলেই চ'লে যাবে, কাজটা কতক এগিয়ে থাকল।'

ননী সে-কথায় কান দিলো না, বললো—'তাই এলে এলে, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই আসতে পারতে তো ? এটা সুদ্ধু মাত্র আমায় অপদস্থ করা—নয় ?'

দাদামশায় বেচারা এইবার অপ্রতিভ হয়ে গেছেন, বললেন—'এতটা তো জানতাম না ভায়া—গিয়েছিলাম দু' মাস থাকব ব'লেই। গোপালজী টানলেন, ঘরবাড়ী ভেঙ্গেচুরে ব'সে থাকলেন, শুনে স্থির হ'তে পারলাম না। বাবা বিশ্বনাথকে এক প্রাতঃপেন্নাম ঠুকে, কাল রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়ায় নায়েবমশায়ের সঙ্গে দেখা। এই দু'জনে এদিক ওদিক ক'রে আসছি। মনে হ'ল ননীকেও একবার দেখে যাই। এখানে যে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়িয়েছে কে আর জানতো!'

নায়েবমশায় চোখ পিট-পিট ক'রে বললেন—'আমি উদিকে "পিত্যেক" দিন ইস্টিশনে লোক পাঠাচ্ছি, আসে আসে ক'রে। যা হোক হয়রানি! তা যাক, আজ নয় আমাদের সঙ্গে চল, ছুটি যখন নেওয়া হয়েছেই।'

ননী খিঁচিয়ে উঠল—'থামুন, আপনাকে আর সাউখুরি করতে হবে না। যত নষ্টের··· ইয়ে। আমার এখন মরবার সময় আছে কিনা? ভবানীদাদার কাছে কত জিনিসের বরাত দেওয়া রয়েছে, সব বারণ ক'রে আসতে হবে। কাজ কি একটা? তিতু ময়রার ওখানে অর্ডার ক্যানসেল ক'রে আসতে হবে। তা'পর গিয়ে দ্বারিকের দোকানে—মরতে এই সব ঝঞ্ঝাট পাকাতে গিয়েছিলাম—কি ব'লে যে বারণ করব ভাবছি। আমার যেন হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে, বিয়ের তারিখই না হয় বদলায়, 'ছেরাদ্দর' তারিখ বদলাতে কেউ কস্মিনকালে শুনেছে?'

দাদামশায় দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন—'তা' গ্রামে আমাদের কি আকাল পড়েছে যে, এখান থেকে সন্দেশ নিয়ে গিয়ে আমার "ছেরাদ্দ" হবে?'

'গ্রামের কথা আর ব'লো না—তোমার সেই দেদোমণ্ডা তো—যত রাজ্যের রাবিশ, ওই দিয়ে সারব তোমার মতন লোকের ছেরাদ্দ? সে-কথা মনেও ক'রো না—আমি অত কিপ্‌টে নই।'

'হুঁ, তা' তো দেখছিই। অমন ঘটার ভোজটা খাওয়া গেল না এই খেদ। তা' বামুনকে দুটো বেশী ক'রে ওই "দরবেশ" না কি বলে, তা' দিস! আজ না হয় দিন পেছিয়েছে, একদিন তো আসবেই—কি বল হে ভায়া?' ব'লে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

আমি অগত্যা দু'দিকেই একবার ক'রে ঘাড় নেড়ে নিলাম—হ্যাঁ-সূচকও বটে,

না-সূচকও বটে। এইবার ননীর ওপর একটু রাগও হ'ল। কী গোঁয়ার গোবিন্দ! কবিরা এত গোঁয়ার হয় জানতাম না। লোকটা মারা গিয়েছে শুনে 'সুধামাখা' 'মধুময় টয়' কত কি লেখা হ'ল, জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে দেখে কোথায় আনন্দে গদ-গদ হবি, তা' না—আবার বাক্যযন্ত্রণা দেওয়া!

ননী আবার কথাটার জবাব দিল—'সেই তো একদিন মরবেই। দু' দিন আগে মরলে যে তোমার কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো!'

না! ননীটা একেবারে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ···মানে আর কি···কাণ্ডজ্ঞান নেই। বুড়ো বেচারা অপদস্থর একশেষ—মাথা চুলকে শেষটা দোষ স্বীকার করলেন (না করে উপায়ই বা কি), বললেন—'তাই তো—তাই তো—কাজটা ভাল হয় নি দেখছি! কি জানিস দাদা—একাদিক্রমে আজ সত্তর বছর বেঁচে আসছি, বেঁচে থাকাটাই কেমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। মরি নি ব'লে কোন দ্বিধা ছিল না, আজ দেখছি—এই বেঁচে থাকা কাজটা বড্ডই বে-আক্কেলে হয়ে গেছে।'

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট

আমাদের পাড়ার কিশোরী বেনের অবস্থাটা বেনে-মহলে বেশ ভালই ছিল। বাড়ী-ঘর জমি-জিরাতও কিছু ছিল, গিন্নীর গায়ে দু'চারখানা সোনাদানাও দিয়েছিল। লোকে বলে—'কিশোরী নগদ টাকাও বেশ জমিয়েছে।' সে যাক—লোকে কিনা বলে? দুঃখের মধ্যে—ঘর-বাড়ী ফাঁকা-ফাঁকা—ছেলেপিলে নেই। না থাক, কিশোরী-গিন্নী নেত্যকালী একাই একশ'; তার দাপটে বাড়ী তো দূরের কথা—পাড়াসুদ্ধ তোল্‌পাড়!

বছর দুয়েক আগের কথা—কিশোরীর সে বছর আয়-উন্নতিটা একটু বেশী হওয়াতে বাজারের উপর একখানা মুদিখানা খুলবার মতলব করছিল। তাই দুপুরবেলা

বাইরের দিকের ঘরে ব'সে, একখানা হিসেবের খসড়া তৈরী করছে, আর দিন দিন কি রকম বাড়বাড়ন্ত হবে তাই আন্দাজ ক'রে আহ্লাদে ফুলে উঠছে ; এমন সময়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কে গম্ভীর গলায় ব'লে উঠল—'জয় বিশ্বনাথ কি জয়, গৃহস্থের মঙ্গল হোক !' কিশোরী চমকে উঠে দেখে—এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী !

কিশোরীর সাধু-সন্ন্যাসীতে বড় ভক্তি—সাধুবাবাকে সে সমাদর ক'রে ঘরে এনে বসালো। সাধুবাবা বেশ ক'রে জেঁকে-জুঁকে ব'সে জানালেন, তিনি আজ কিশোরীর বাড়ীতে 'সেবা' ক'রে তাকে কৃতার্থ করবেন।

কিশোরী তো পরম ভাগ্য মেনে ব্যস্ত হয়ে সাধুসেবার আয়োজন করতে গেল। সাধুবাবা ঝোলাঝুলির ভিতর থেকে গাঁজার কল্কেটি বা'র ক'রে সাজতে বসলেন।

আহারাদি করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। তারপর কেন জানি না, সাধুবাবা এবং কিশোরীতে মিলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ঘণ্টাখানেক ধ'রে বিশেষ কিছু গোপন পরামর্শ হ'ল ; কাকপক্ষীতেও টের পেল না, কি যে পরামর্শ—তা' কেবল তারাই জানে। ঘর থেকে বেরিয়ে কিশোরী কিন্তু মুখখানি কাঁচুমাচু ক'রে ভিতর-বাড়ীতে চলল।

কিশোরী-গিন্নী নেত্যকালী তখন সবে পাড়া-বেড়ানোটি সেরে রোয়াকে পা ছড়িয়ে ব'সে চুল ক'গাছি নিয়ে 'বেনে খোঁপা' বাঁধছে। এমন সময়ে কিশোরী মাথা চুলকোতে চুলকোতে এসে আমতা-আমতা ক'রে বললে—'এই—এই দেখ বড়বৌ, বলছি কি—তোমার "সেই"—অনেক দিন তো তোমার সেই "গঙ্গাজলের" বাড়ী যাও নি। তা আজ একবার যাও না কেন ?'

অসময়ে এমন কথা শুনে নেত্যকালীর বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠেছে, সে বললে—'কেন গা—কিছু মন্দ খবর আছে নাকি—গঙ্গাজলের অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?'

বেনের পো'র বুদ্ধি। মাথাটা আরও একটু নীচু ক'রে কিশোরী বললে—'না—হ্যাঁ তা'—তোমার গঙ্গাজলেরই বড় অসুখ—বাঁচে কিনা···।'

'ওমা সে কি কথা গো—ওমা আমি কোথা যাব গো—ওগো গঙ্গাজল গো—নেত্যকালী প্রায় গলা ছেড়ে সুর তুলবার যোগাড় করলো।

কিশোরী তাড়াতাড়ি বললো—'আরে ছাই—এখুনি কাঁদছ কেন ? শক্ত রোগ

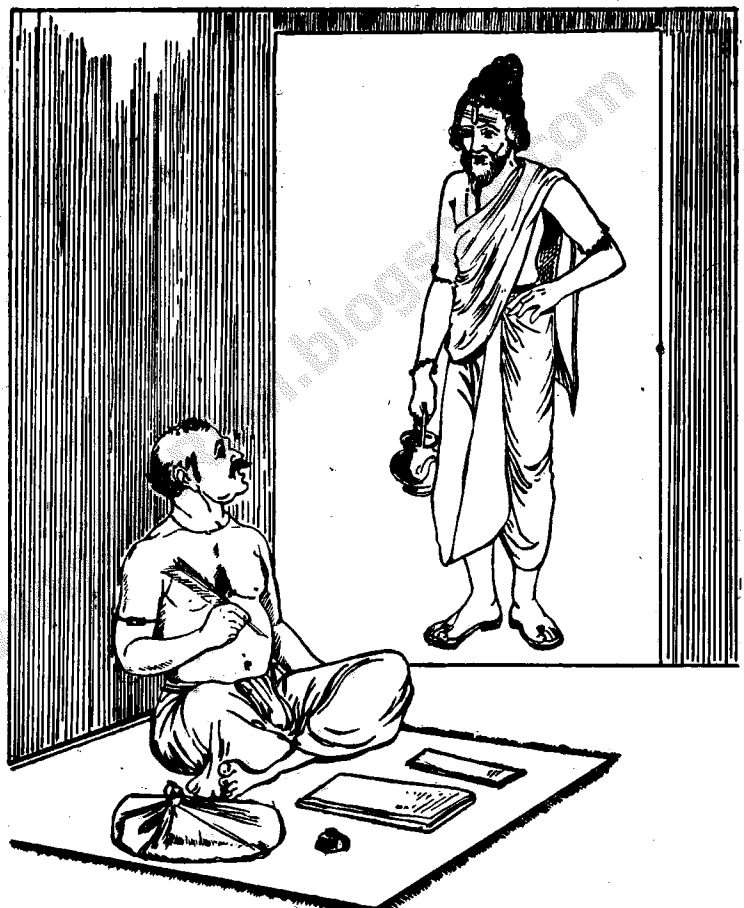

কিশোরী চমকে উঠে দেখে—এক গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী।

[পৃষ্ঠা—৪৬

হ'লেই কি মরতে হয় ? ডাক্তার-বদ্যি দেখছে। হাজার হোক তোমার অতকালের ভাব, তাতেই বলছি—একবার দেখতে যাও।'

নেত্যকালী গলা নামিয়ে বললে—'তা' বেশ—আমায় তা' হ'লে রেখে আসবে চল।'

গঙ্গাজলের বাড়ী ক্রোশ দুয়েক দূরে ; দিনের বেলা হ'লে নেত্যকালীর কিছুই নয়, সন্ধ্যে হয়ে আসছে ব'লে একটু ভয়।

কিশোরী তো দেখে মহা বিপদ ! মুখখানি ভালমানুষের মত ক'রে বললে—'তা' বড়বৌ—আমি ঠিক যেতাম, কিন্তু আজ যে আমার বিষম মুশকিল, দোকানের সব খাতা-পত্তর মিলাতে হবে। আমি বলি কি—তুমি বরঞ্চ মানকের মাকে সঙ্গে ক'রে যাও।'

মানিকের মা পাড়ার একটি গরীবের মেয়ে—লোকের উপকার করতে খুব পটু। কিশোরীর কথায় সম্মত হয়ে নেত্যকালী মানিকের মা'র বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছে। এমন সময় কিশোরী তাড়াতাড়ি পেছনে পেছনে গিয়ে বললো—'দেখ, সন্ধ্যে হয়ে এলো —অতখানি রাস্তা যাবে, পথে কত রকম কি হ'তে পারে, গয়না ক'খানা না হয় খুলে রেখে যাও।'

নেত্যকালী একটু ইতস্ততঃ করলো—'আহা অনন্ত জোড়াটা নতুন গড়ানো হয়েছে, গঙ্গাজল এখনও দেখে নি। তা' যাক ; সেরে উঠুক—দেখবে তখন ; হে হরি, গঙ্গাজল আমার সেরে উঠুক—আমি পাঁচসিকের হরির লুট দেবো।'

অনন্ত, বালা, হার, বিছে, মায় নাকের নথটি পর্যন্ত খুলে কিশোরীর হাতে দিয়ে নেত্য হনহনিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিশোরী দরজাটি বেশ ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে হাসিমুখে আবার বাইরের ঘরে ফিরে চলল। তাকে ফিরতে দেখেই সাধুবাবা গম্ভীরভাবে বললেন—'কাজ সুসিদ্ধ হয়েছে ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে—এখন কি আজ্ঞে হয় ?'

সাধুবাবা বললেন—'একটা বড় হাঁড়ি, হোমের জন্য কিছু শুকনো বেলকাঠ আর কোশাকুশি চাই, তারপর তোমার পেতল আর তামা যা' দিতে পার।'

কিশোরী অন্য সব জিনিস বাড়ী থেকেই যোগাড় করলো ; শুধু শুকনো কাঠ বাকী। ভর-সন্ধ্যেবেলা তা' যোগাড় করা একটু কঠিন কাজই তো বটে। যাক—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে ?—এই ভেবে কিশোরী বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জিনিসটি যোগাড় ক'রে কিশোরী যখন ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। তখন চারদিকের দোর-জানলা সব বন্ধ ক'রে কাজ আরম্ভ হ'ল।

সাধুবাবা হাঁড়িটিকে ঠিক মাঝখানে বসালেন, তার ভিতরে সাজিয়ে সাজিয়ে বসালেন—কিশোরীর সংগৃহীত যত ছোট ছোট পেতলের আর তামার বাসন ; তারপর তার উপরে একখানি কলাপাতা বিছিয়ে বললেন—'এইগুলো হবে রূপো—যে জিনিসটির যে গড়ন আছে ঠিক থাকবে—ঠিক বারো ঘণ্টা পরে পাতা তুলে দেখবে—আগাগোড়া সব রূপোর।'

তারপর কিশোরী অতি যত্নের ধন টাকার বাক্সটি খুলে, নোট আর টাকার একটি কাঁড়ি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে বললে—'এই নাও বাবাঠাকুর, আমার যথাসর্বস্ব—হ্যাঁ বাবা, ঠিক হবে তো—টাকাগুলো মোহর হয়ে যাবে তো ?'

সাধুবাবা উদাসস্বরে বললেন—'নিশ্চয় হবে বেটা, এ মন্তর স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথের কাছে পাওয়া। হ'তেই হবে।'

'হ্যাঁ বাবা—আচ্ছা বাবা—তা' নোটগুলো কি হবে ?'

'সব দশ-দশ গুণ হবে—দশ টাকার নোট সব একশ' টাকার হবে, একশ' টাকার…'

'না বাবা, সবই দশ টাকার।'

'আচ্ছা তা-ই হবে, ওই একশ টাকার।'

সাধুবাবা সেগুলো একটি নেকড়ার পুঁটুলি ক'রে হাঁড়ির ভিতর কলাপাতা-খানির উপর রাখলেন। রেখে, তেমনি উদাসস্বরে বললেন—'সোনার গয়না যা' দিবি বেটা, সব হীরে হয়ে যাবে ; একেবারে আসল হীরে—কোহিনূর।'

কিশোরী নেত্যকালীর প্রাণের অধিক সেই গয়নাগুলো একখানি একখানি ক'রে সাধুবাবার হাতে তুলে দিলো। সাধুবাবা সে ক'টিও পুঁটুলি ক'রে তাতে রেখে বললেন—'এইবার এতে মন্ত্রপূত চাল দিয়ে ভরাতে হবে। আমার ঝোলায় আছে, সেই

বিশ্বনাথের ঝোলার চাল। আমি এক কণা ভাগ্যগুণে পেয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই মিশিয়ে রেখে দিয়েছি। যে নেহাৎ ভাগ্যবান হয়, সে-ই আমার দয়া লাভ করে।'

কিশোরী তো আনন্দে গদগদ! সাধুবাবার দয়া তো বড় সামান্য জিনিস নয়—সবাই তা' লাভ করতে পারে না! সে নাকি বড় ভাগ্যবান, তাই ফাঁকি দিয়ে লাভ ক'রে ফেলেছে!

তারপর সাধুবাবা তাঁর ঝোলা থেকে কতকগুলো চাল বার ক'রে হাঁড়িটা ভরিয়ে দিলেন; হাঁড়ির মুখ দেখে মনে হ'তে লাগল শুধু চালেরই হাঁড়ি। হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়ে সাধুবাবা তা'র উপর 'রক্ষামন্ত্র' পাঠ করলেন—যাতে ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ কেউ কিছু করতে না পারে।

এই সব করতে রাত প্রায় ন'টা বেজে গেল, সাধুবাবা বললেন, 'যা বেটা, এইবার তুই ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমো গে যা। আমি এখন রাত বারোটা পর্যন্ত হোম করব। তারপর বেরিয়ে গিয়ে শ্মশানে ব'সে কাল বেলা ন'টা পর্যন্ত 'স্বর্ণসিদ্ধি' মন্ত্র জপ করব। এক লক্ষ জপ করতে হবে। দেখিস বেটা, কাল ন'টার আগে কিছুতেই হাঁড়ির মুখ খুলবি না। তা' হ'লেই সমস্ত জিনিস বিষধর সর্প হ'য়ে তোকে দংশন করবে।'

কিশোরী জিভ কেটে মাথা নেড়ে জানালে—কিছুতেই সে এমন অন্যায় করবে না।

'স্বর্ণসিদ্ধি মন্ত্র'—না জানি সে কি! কিশোরীর মুখে নাল পড়ছে—হাত কচলাতে কচলাতে সে বললে—'হ্যাঁ বাবা, সেই মন্ত্রটি একবার বললে দোষ আছে?'

সাধুবাবা বললেন—'দোষ আছে বৈকি—যাকে তাকে মন্ত্র বললে তো আর মন্ত্রের ফল থাকে না। তবে তুই আমার নেহাৎ ভক্ত, তোকে একবার বলতে পারি; কিন্তু দেখিস বেটা, যেন পাড়াসুদ্ধ সকলকে ব'লে বেড়াসনে।'

'না না, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

সাধুবাবার দাড়ি-গোঁফের আড়ালে একটু মুচকি হাসি দেখা দিল; তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে চমৎকার সংস্কৃত সুরে মন্ত্র আওড়ালেন—

'কিশোরী দাস নামায় ভক্ষয়া অশ্বডিম্বায়াৎ
কাঁচকলা-কচু-দগ্ধানাং অষ্টরম্ভা ইতি ভবেৎ।'

মন্ত্র শুনে কিশোরী তো একেবারে ভাবে বিভোর, তারপর ব্যগ্র হ'য়ে বললে—'হ্যাঁ বাবা, ওই যে বললেন 'কিশোরী দাস' ওর মানে কি ?'

'হাঃ হাঃ হাঃ—এটা আর বুঝলি না বেটা! যার জন্যে জপ করতে হবে—তার নাম করতে হবে না? তা' নইলে আমি সেই শ্মশানে ব'সে জপ করব—আর তোর ঘরে সোনা হবে—এ কি সামান্য কথা ?'

অতঃপর সাধুমহারাজ হোমের যোগাড় করতে লাগলেন, আর কিশোরী গুটি-গুটি বাড়ীর মধ্যে ফিরে এলো শুতে। দু'জন থাকলে নাকি কাজ সিদ্ধি হয় না।

এলো তো ঘুমোতে! কিন্তু ঘুম কি আর হয়? বেচারা কিশোরীর সারারাত 'শয্যাকণ্টকী'। এপাশ ওপাশ, কতক্ষণে রাত কাটবে। ভাগ্যে নেত্যকালী বাড়ী ছিল না—তা' নইলে কিশোরীর অবস্থা দেখে সে ঠিক সকল কথা ফাঁস ক'রে নিত।

ভোরের বেলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিশোরী একটু ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখে, নেত্য কখন এসে বাসন-পত্তর খন্‌খন্ ঝন্‌ঝন্ ক'রে বিষম ব্যাপার ক'রে তুলেছে। বেলাও হয়েছে অনেকটা, রোদ চড়চড় করছে। কিশোরীর ঘুম ভাঙ্গতে দেখে নেত্য হাতের কাজ ফেলে এসে খরখর ক'রে ব'লে উঠল—'বলি হ্যাঁগা, এ আবার তোমার কি রকম ছিষ্টিছাড়া ন্যাকরা করা? গঙ্গাজল মরে—হেন তেন, অলুক্ষণে কথা নিয়ে আবার ঠাট্টা কি ?'

কিশোরী হাসতে হাসতে বললে—'আঃ ছাই, চটছ কেন? কতদিন পরে গঙ্গাজলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল বল দিকিন? ভালই তো হ'ল। তা' সব কি বললো ?'

নেত্যকালী একটু নরম হয়ে বললো, 'তা' খুব আহ্লাদ করলো। কাল আবার গঙ্গাজলের জামাই এসেছেন। ভাল-মন্দ রান্নাবান্না করা—একলা মানুষ কি ক'রে পারে! আমি যাওয়াতে খুব উপকারও পেলে। তা' পাঠালে ভালই করলে, অমন ন্যাড়া-বোঁচা ক'রে পাঠালে কেন? গঙ্গাজল কত দুঃখু করলো গয়নাগুলো নতুন জামাই দেখতে পেলো না ব'লে। আমার নতুন অনন্ত জোড়াটা দেখতে না পেয়ে কত আপসোস—একদিন আসবে বলেছে। তা' ওর তো আর আমার মতন হুট্ বলতেই আসবার জো নেই—ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী হয়েছে—দেখলে চোখ জুড়োয়।' এক

দমে সব কথাগুলো ব'লে ফেলে নেত্য একটু দম নেবার জন্যে থামলো।

'কার সঙ্গে এত সকালে এলে?'

'এলাম মানকের মা'র সঙ্গেই। তাকে কি আর সেই রাত্তিরে একলা ছাড়ি? আর তা' ছাড়া গঙ্গাজল বললো, 'পাঁচখানা রাঁধছি, মানুষ তো, এসেছে যখন খেয়ে যাবে না? খেতে খেতে রাত হয়ে গেল। হ্যাঁ দেখ একটা কথা, গঙ্গাজল বলছিল, ও নীচুকাঁটা বালা এখন আর কেউ পরে না; নেহাৎ সেকেলে হয়ে গেছে। এবার কিন্তু আমায় তারের বালা গড়িয়ে দিতে হবে।'

কিশোরী হাসতে হাসতে বললো, 'তারের বালা কি বড়বৌ, এবারে যদি না তোমায় হীরের বালা পরাই তো—কি বলেছি!'

নেত্য ঠাট্টা ভেবে হাসলো। এদিকে কিশোরীর প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে—কতক্ষণে ন'টা বাজবে!

স্নানটান ক'রে শুদ্ধ হয়ে কিশোরী হন্‌হনিয়ে আসছে, এমন সময়ে রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বেজে গেল। আর তাকে পায় কে! সে তাড়াতাড়ি নেত্যকে ডেকে বললো, 'বড়বৌ—বড়বৌ! শীগ্‌গির এসো—একটা ভয়ানক আশ্চয্যি জিনিস দেখাবো।'

নেত্য রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বললো, 'কি আবার ছাই?'

'আঃ চলই না—রাশ রাশ সোনা, রূপো, গিনি, মোহর, তোমার গয়না-গাটি সব হীরের—আগাগোড়া আসল হীরে।' কিশোরীর আর তখন সব কথা গুছিয়ে বলতে সইছে না।

নেত্য বললো, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? চল তো দেখি।'

বাইরের ঘরে এসে শিকল খুলে ঢুকে কিশোরী তো আগেই এক সাষ্টাঙ্গে নমস্কার, তারপর তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ঢাকনা খুলে হুড়হুড় করে উপুড় ঢেলে দিলো। ঝনঝন শব্দ ক'রে তামা-পেতলের বাসনগুলো ছড়িয়ে পড়ল। হায় হায়! সোনা কোথায়?

কিশোরী 'ভ্যাবাচ্যাকা' খেয়ে হাতড়াচ্ছে; 'মন্ত্রপূত' চাল, কলাপাতার টুকরোখানি পর্যন্ত আছে—কেবল পুঁটুলি দুটিই অদৃশ্য!

নেত্য এতক্ষণ কিছুই বলে নি—অবাক হয়ে দেখছিল ব্যাপারটা কি! এইবার

সে বললো, 'কি হয়েছে তাই বল দিকিন, আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

কিশোরী আমতা আমতা ক'রে জড়িয়ে সব কথা খুলে বলতেই নেত্য ধরলে একেবারে নৃত্যকালীমূর্তি, বললো, 'বটে, এইজন্যে আমায় গঙ্গাজলের বাড়ী পাঠানো হয়েছে! একটা ঠক-জোচ্চোরের কথা শুনে আমার গয়নাগুলো ঘোচালে?'

টাকা গেছে দুঃখু নেই—গয়নার শোকটাই নেত্যর বেশী।

কিশোরী জিভ কেটে বললে, 'সাধু-সন্ন্যাসীর নামে কিছু ব'লো না বড়বৌ, আমার মনে হচ্ছে সাধুবাবা যে আমায় মন্তরটি ব'লে ফেললেন, তাতেই এই হ'ল।'

'হ্যাঁ, তোমার যা' কথা। সব কিছুই রইল, খালি সোনাদানাগুলোই উবে গেল? কি মন্তর তাই শুনি আমি?'

কিশোরী কাল মন্ত্রটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছিল, একটু ভেবেই বেধে বেধে ব'লে ফেললে।

আহা, নেত্যর তখনকার অবস্থা যদি তোমরা একবার দেখতে! সে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কান্না জুড়ে দিলো, 'আ—আমার কপাল! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ব্যবসা ক'রে খাও? 'কচু কাঁচকলা' আবার শাস্তরের মন্তর? তোমায় কচুপোড়া খাইয়ে গেল, এই কথাই ঘুরিয়ে ব'লে গেল। হায় হায়! আমার কী হ'ল গো!'

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার সব লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। কথা শুনে তারা কিশোরীর গায়ে তো শুধু ধুলো দিতে বাকী রাখলো! কিশোরীর যে যথাসর্বস্ব গেল তার জন্য কারও ভাবনা নেই। 'ছিঃ ছিঃ' শুনতে শুনতে বেচারী একেবারে কোণঠাসা —যেন চোরটি।

পাড়ার পাঁচজনকে দেখে নেত্যর শোক উথলে উঠল। সে অবশেষে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না জুড়ে দিল, 'ওগো আমার গোলাপপাতার অনন্ত গো, ওগো আমার সাধের বিস্কুট হার গো, ওগো আমার নতুন বিছে ছড়াটা গো, ওগো আমার শাউড়ীর হাতের বালা জোড়া গো!'

লোকে দুঃখু করবে কি! নেত্যর রকম দেখে সবাই মুখ টিপে হাসতে হাসতে স'রে পড়ল।

সারাদিন ধ'রে তার ধুয়ো আর থামে না। তা না থামুক, আমাকে কিন্তু

থামতে হবে। কিশোরীর বোকামির কথা বলতে বলতে যে আমারও বেলা ফুরালো।

এখনও বলছ 'তারপর'?

তারপর আবার কি? নেত্য এখনও সে গয়নার শোক ভুলতে পারে নি, যখন-তখনই সুবিধে পেলে কিশোরীকে মুখনাড়া দেয়, আর কিশোরী মাথা চুলকে বলে, 'আচ্ছা বড়বৌ, এবার পূজোয় যদি না আমি তোমার নথটানাটা গড়িয়ে দিই তো আমি কিশোরীই নই।' আর মনে মনে বলে, 'শুধু নাকেই এই, না জানি নথ নাড়লে কেমন!'

ফস্কা গেরো

আমাদের বাড়ীতে একটা আমওয়ালা আসত। আমের গুণ-বর্ণনায় সে বলত 'বাবু, আম ভাল, তবে আঁটিতে টক্।' আমাদের ভবতোষবাবুকে সেই আমের সঙ্গে তুলনা করছিলাম। ভদ্রলোক লোক ভাল, তবে ঐ আঁটিতে যে টকটুকু, সেজন্য বাড়ীর লোকের ছিল মুশকিল। আর কিছু নয়, রাগী ঝাঁজী বদমেজাজী—সে সবের ধার দিয়েও যান না। লোকটা 'অতি সাবধানী'। যেখানে বিপদের আশঙ্কা, তিনি তার সাড়ে সাত মাইল দূর দিয়ে চলতে চান। ছোটবেলা থেকে ভূত-পেত্নী, সাপ-বাঘ, চোর-পুলিস, জল-আগুন, রেল-মোটর, অশ্লেষা-মঘা, হাঁচি-টিকটিকি ইত্যাদি জগতের যাবতীয় ভীতিকর বস্তুকে এড়িয়ে এড়িয়ে ভদ্রলোক এই চল্লিশটা বছর অতিকষ্টে প্রাণটি রক্ষা ক'রে এসেছেন। মনে ভরসা এই যে, এইভাবে 'তারা' নাম জপ করতে করতে জীবনের বাকী দিন ক'টা (মেরে কেটে আর না-হয় গোটা পঞ্চাশ বছর) নির্বিবাদে কাটিয়ে যাবেন, যদি না·····কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

দুই ছেলে 'ন্যাড়া' আর 'বিল্বে', এক মেয়ে 'বুলি'। ভবতোষবাবু তাদের তালিম দিয়ে দিয়ে 'সিপাই-কা ঘোড়া' ক'রে তুলবার চেষ্টায় কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নি এবং তাঁর

বিশ্বাস তাতে কৃতকার্য হয়েছেনও। তিনি সর্বদা বলতেন, 'দেখ্ বাবারা, আমার কথাটি যদি মেনে চলিস্, তা' হলে অন্ততঃ বেঘোরে প্রাণটা যাবে না।'

বড় ছেলে ন্যাড়া সম্প্রতি ম্যাট্রিক দিয়েছে, তাই ব'লে যে সে ব'সে আছে এমন মনে করবার হেতু নেই। তার বাবা তাকে তা' থাকতে দেবেনও না। এক্‌জামিনের পরই (ন্যাড়া যখন মনে মনে একশ' রকম মতলব ভাঁজছে তখন) ভবতোষবাবু ছেলেকে ডেকে বললেন, অর্থাৎ তিনি যা' বললেন তার সারাংশ হচ্ছে এই—জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ততোধিক ভঙ্গুর 'জীবনাধার' এই দেহ! এ-কে টিকিয়ে রাখতে হ'লে চাই একখানি সুদৃঢ় দুর্গ, মানে ঘরের কোণ! কারণ (তাঁর কথায় বলতে গেলে) 'সঙ্গীগুলো হচ্ছে আসল শয়তান, খেলার মাঠ যমের বাড়ী, গল্পের বই খাঁটি "পয়েজন", ক্লাব-লাইব্রেরীগুলো "ব্যাসিলি"র আড়ত।' অতএব তাদের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে হলে চাই এমন একটা আশ্রয়, যাতে ক'রে ঐহিক পারত্রিক দু'দিকেরই মঙ্গল। গবেষণার ফল ফলতে দেরি হ'ল না। ভদ্রলোক পুরো পাঁচ মিনিট পা চালিয়ে নগদ তিন আনা খরচ ক'রে একখানি পকেট গীতা এনে ছেলেকে উপহার দিলেন। উপহার বলছি এইজন্য যে, ওর চেয়ে লাগসই কথা এখন চট্ ক'রে মাথায় আসছে না বলে, 'স্কন্ধে চাপালেন' বললেও নেহাৎ ভুল হয় না। যাই হোক, দিলেন এই শর্তে—লম্বা ছুটির মধ্যে আগাগোড়া বইখানা, মায় 'বন্দনা' থেকে 'মাহাত্ম্য' পর্যন্ত, মুখস্থ হওয়া চাই। ভবতোষবাবু একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন, সারা দুপুর দৌরাত্ম্য ক'রে অন্ততঃ বেঘোরে প্রাণটা যাবে না। আহা বেচারা ন্যাড়া! তার এমন ছুটিটা যে তোমাদের মতন নিষ্কণ্টক নয়, তা' বোধ হয় বেশ বুঝতে পারছ!

এ জগতে নিষ্কণ্টকে থাকতে ক'জনেই বা পায়! এই ভবতোষবাবুর কথাই ধর না! বেলা দশটায় খেয়েদেয়ে ধীরেসুস্থে সহজ মেজাজ নিয়ে আপিস গেলেন—সন্ধ্যায় বাড়ী এলেন যেন 'আষাঢ়ের অমাবস্যা'! মানে, মুখখানি সেই রকম ক'রে আর কি! এসে জুতা জোড়াটি খুলে, বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলেন।

দুর্গাকালী ব্যস্ত হয়ে—হবারই কথা—ফুটন্ত ভাতে ঘটি ছয়েক জল ঢেলে দিয়ে ছুটে এলেন, ব্যাপার কি? কি হ'ল? দুঃসংবাদ? পকেট-কাটা? চাকুরি-বিয়োগ? সাহেবের গালি? বন্ধু-বিচ্ছেদ? শরীরের—নাঃ, ওসবের একটাও নয়। তবে—?

ভবতোষবাবু বারতিনেক পাশ ফিরে, গোটাচারেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে জানালেন, 'মফঃস্বলে যেতে হবে, সাহেবের সঙ্গে। "বেটার-ছেলে" সাহেব আর লোক পেলো না—আমার ঘাড়ে এই বিপদ্ চাপানো! উঃ, প্রাণভ'রে গালি দিলেও যে রাগ মেটে না। সোজা কথা তো নয়, স্ত্রীপুত্র-পরিজনকে অসহায় ক'রে রেখে বিদেশ-যাত্রা!'

দুর্গাকালী রুদ্ধনিঃশ্বাস ছেড়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'এই কথা! তা' কোথায় যেতে হবে? কত দিনের জন্যে?'

'কোথায়?' ব'লে ভবতোষবাবু উঠে বসলেন, নস্যির কৌটো খুলে এক টিপ্ নিলেন এবং মুখখানি কুঁচকে, নাকটি সিঁটকে, অবশেষে না বললে নয় ব'লেই বোধ হয় বললেন, 'বড় কাছেও নয়—সে-ই আসানসোল। যেতেও হবে পাকা প-নে-র-টি দিনের জন্য! শুনে হাসছ তুমি? তা' হাসবে বই কি! "কত ধানে কত চাল" বোঝ না তো কিছু!'

অবশ্য দুর্গাকালী যদি হেসেও থাকেন—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না—তবে না হাসাই ভাল, কি বল? যাই হোক, তিনি গম্ভীর হ'লেন, বললেন, 'হাসি নি—তুমি এত ভাবনায় পড়েছ কেন? যাবে সাহেবের সঙ্গে, আরামে থাকবে—দিন পনের বৈ তো নয়—'

ভবতোষবাবু আবার ফোঁস করলেন, 'হুঁ! তুমি তো বলছ, তা' দিন পনের চারটিখানি কথা কি? পাঁচদিনে একটা রাজ্য ছারখারে যেতে পারে, একদিনে একটা প্রলয়কাণ্ড হ'তে পারে, এক ঘণ্টায় আগাগোড়া পৃথিবীটাই—'

দুর্গাকালী বাধা দিয়ে বললেন, 'পারে তো পারে, যত সব আজগুবি ভাবনা—কিচ্ছু হবে না।'

'না হ'লেই ভাল—খবর তো রাখ না কিচ্ছু, আজকাল রেলে যে রকম অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে—'

মেয়েরা এসব কথায় বড় একটা কথা কয় না, দুর্গাকালীও এইটুকু ব'লেই থামলেন যে 'আচ্ছা এই রাত্রেই তো আর যাচ্ছ না? মুখ ধোও—চায়ের জল চড়াচ্ছি।'

সে-রাত্রে ভবতোষবাবু ভাতের সামনে বসলেন মাত্র, কথাও প্রায় না কওয়ারই মত। কিন্তু পরদিন থেকে তিনি তার শোধ তুলে ছাড়লেন। সকাল-সন্ধ্যা দিনে-রাত্রে ছেলেদের, মেয়ের, গিন্নীর—এমন কি বাড়ীর চাকরটার সুদ্ধ কানগুলো উপদেশে উপদেশে একেবারে ভারী হয়ে উঠল।

দিন তিনেক থেকে খুঁটিনাটি সব গোছানো হ'তে থাকল—মাটি থেকে কাঠি পর্যন্ত। অবশেষে সেই দিন এলো—১লা জুন। পয়লা ব'লে একটু খুঁৎ হচ্ছিল—যাই যাক, বিলেতি পয়লায় অগস্ত্যযাত্রা না হওয়াই সম্ভব।

ভবতোষবাবু রাত চারটের সময় উঠলেন, বাড়ীসুদ্ধ লোককে তাড়া দিয়ে ওঠালেন, ঠিক পৌনে আটটায় ভাত খেলেন, এইবার নিয়ে একশ' একবার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বাড়ীর সবাইকে সাবধান করতে করতে ট্রেন ছাড়বার একশ' আটাশ মিনিট আগে 'তারা' নাম স্মরণ ক'রে (দুর্গা-কালী দুটো নামেই বাধে) ভবতোষবাবু প্রবাসে যাত্রা করলেন। আমরাও এখানে আমাদের গল্পের প্রথম পর্ব শেষ করলাম।

... ...

তোমরা শুনে নিশ্চিন্ত হবে যে, ভবতোষবাবু 'যথাসময়ে নিরাপদে পৌঁছিয়েছিলেন'। ট্রেন মিস হ'ল না, 'কলিশন' হ'ল না, লেট্ পর্যন্ত হয় নি। আরও সুখের কথা, যে কাজ পনের দিনে হ'বার আশঙ্কা ছিল, সেটা দিন দশেকেই মিটে গেল। যেই সারা, সেই ছুট্। ভদ্রলোক এবারে রেলে চড়তে চার পা তুলে লাফান আর কি! তা' ব'লে যেন ভেবো না ভবতোষবাবুর চারখানি পা। থাকলে লাফাতেন নিঃসন্দেহ। পাঁচদিন আগেই গিয়ে পড়ায় বাড়ীতে সবাই কী খুশিই হবে! আহা!

রাত্রি আটটা, গরমের দিনে সন্ধ্যাই বলা চলে। ভবতোষবাবুর ট্যাক্সী বাড়ীর দোরে এসে থামল। ধীরে-সুস্থে গাড়ী থেকে নেমে, ব্যাগ-বিছানা নামিয়ে, আর কিছু আছে কিনা বার বার দেখে, ভাড়ার পয়সাগুলো রাস্তার গ্যাসের আলোয় বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে, ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বাড়ীর রকে ব'সে ভবতোষবাবু ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। পাঠক! এ নিঃশ্বাসটির তুলনা কোথায়?

বন্ধ দরজা দেখে ভবতোষবাবু খুশীই হ'লেন। কলকাতা শহর—চোর-ছ্যাঁচোর

ভবতোষবাবুর চোখে পৃথিবী বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

[পৃষ্ঠা—৫৭

তো কথায় কথায়।

কড়া নাড়তেই বিল্বে এসে দোর খুললো এবং বাবাকে দেখে হঠাৎ ভূত দেখার মতনই চমকে উঠল। ভবতোষবাবু (যদিও এতটা চমকাবার হেতু ঠিক বুঝলেন না) বললেন, 'কি রে চমকে গেছিস ? কাজ হয়ে গেল—চ'লে এলাম। বাপ! ভদ্রলোকে বিদেশে যায় ? ভাবনায় ভাবনায় মাথার শির ছিঁড়ে পড়বার যোগাড়। তোরা সব ভাল আছিস তো ? কোন বিপদ-আপদ হয় নি তো ? খুব সাবধানে ছিলি তো ? বাড়ী থেকে বেরুস-টেরুস না তো ?'

ভবতোষবাবুর তাই হুকুম ছিল—দিন পনের পর্দ্দানশীন থাকলে কিছু আর প্রাণত্যাগ হয় না। পথে তো ফি পদে বিপদ! বিল্বে এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে যা' বললো সেটা 'হ্যাঁ' কি 'না' ধরা গেল না। ভবতোষবাবু আপনার আনন্দে ব'কে চলেছিলেন, হঠাৎ খেয়াল হ'তে ভাবলেন—বিল্বে এ পর্যন্ত একটাও কথা কয় নি কেন ? সবাই আছে তো ? ইতিমধ্যে কিছু ঘটে যায় নি তো ? তারপর বললেন, 'হ্যাঁরে বাবা! তুই এত চুপ কেন ? খবর ভাল তো ? সাড়া নেই কারুর! বুলি, ন্যাড়া, তোদের মা—কারুকে দেখছি না কেন ? বাবা বিল্বে! কোথায় তারা ?'

বিল্বে গম্ভীরভাবে জবাব দিলে, 'কেউ নেই।'

'কেউ নেই ? এঁ্যা ? যা' ভেবেছিলাম তাই—দু' দিনের মধ্যে সব ফরসা ?'

ভবতোষবাবুর চোখে পৃথিবী বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগল। তিনি ধুলোভরা উঠোনে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন।

বিল্বে বেচারা অপ্রতিভের একশেষ। 'নেই' কথাটার যে এরকম অর্থবিকৃতি হবে তা' কি ও আগে জানতো ?

অনেকক্ষণ পরে আকাশের পানে চোখ মেলে ভবতোষবাবু বললেন, 'তারপর—কি হয়েছিল সব ? কিসে গেল ?'

বিল্বে ধড়ে প্রাণ পেলো, বললো, 'গাড়ীতেই গেছেন। কিছু তো হয় নি—বাড়ী নেই তাই—'

'বাড়ী নেই! তাই বল্। দেখছিস তো বাবা! দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেছে! কোথায় গেছে ? টুলুদের বাড়ী ? রাত-বিরেতে বেরোবার

কি দরকার? ডেকে আন।'

বিল্বের আজ হ'ল কি? ভাল ভাল সাহিত্যিকেরা যাকে বলেন 'তুষ্ণীভাব অবলম্বন', বিল্বে তাই ক'রে আছে কেন? বাপের কথায় মৌনভাবে বললো, 'না, টুলুদের বাড়ী নয়—'

'তবে? কোথায় গেছে তাই বল্ না? তুই যে হেঁয়ালি হয়ে উঠেছিস দেখছি—'

বিল্বে হঠাৎ গড়গড় ক'রে অনেকগুলো কথা ব'লে ফেললো, 'দাদা রাজগঞ্জে, বুলি মামার বাড়ী, মা উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে—'

'মা কি করতে? কি বললি?'

ভবতোষবাবুর কি আজ মাথার সঙ্গে সঙ্গে কানেরও কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটেছে? ভাল শুনতেও পান না নাকি?

'উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে গেছেন মা।'

'উদয়শঙ্কর? সে আবার কি রে বাবা! পাহাড়-পর্ব্বত আবার নাচতে শুরু করল নাকি?'

বেশ বোঝা গেল বিল্বে রীতিমত চটেছে, কেননা এবার যে কথাগুলো শোনা গেল, তা' মোটেই মিহি নয়। সে বললো, 'পাহাড়-পর্বত কি বলছেন? গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ ভাবছেন বুঝি? উদয়শঙ্করকে জানেন না? পৃথিবী-বিখ্যাত লোক! কত কাণ্ড হচ্ছে—'

'ওঃ তাই নাকি? ইনি হ'ন তা হ'লে একটি মানুষ! উদয়শঙ্কর—উদয়শঙ্কর শুনেছিলেম বটে, আমি বলি গৌরীশঙ্করের মতন একটা নূতন কি আবিষ্কার-টাবিষ্কার বুঝিবা! তিনিই 'নেত্য' করছেন, বটে! সেইখানে গেছে তোর মা? অবাক্ কাণ্ড যে সব! কোথায় তার বাড়ী? কে নিয়ে গেছে?'

'ছোটমামা এসেছিলেন, তিনিই নিয়ে গেলেন। আগে থেকে টিকিট কেনা ছিল ছোটমামীর জন্যে, তা' তিনি হঠাৎ বাপের বাড়ী চ'লে গেছেন, তাই ছোটমামার অনুরোধে মা—আমাকে অনেক আদর ক'রে—বাড়ীতে রেখে, তবে গেলেন।'

'বটে—হুঁ! কতক্ষণ পর্যন্ত সে 'ভূতের নেত্য' হবে? কত রাত্তিরে আসা হবে সব?'

'তা' ঠিক জানি না। মা তো যেতেই চাইছিলেন না, একে দাদা বাড়ী নেই। তবে ছোটমামা ব'লে গেছেন—যত রাতই হোক তিনি মাকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন—'

'কেতাথ্য করবেন—আস্পর্দাও সব কম নয়। এ্যাঁ, ওই একটুখানি পট্‌কা তোর মামা, ফুঁ দিলে প'ড়ে যায়, এই রাতদুপুরে মেয়েছেলে নিয়ে—এক গা গয়না সুদ্ধু—নাঃ, আমায় ওরা সবাই মিলে পাগল না ক'রে ছাড়বে না—একেই আমার মাথা খারাপ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ—ভবতোষবাবু গম্ভীর, বিল্বে নিশ্চল।

ভবতোষবাবু আবার আরম্ভ করলেন, 'হ্যাঁ, তোমার দাদাটি কোথায় গেছেন শুনি?'

'দাদা রাজগঞ্জে গেছে, কোন্ বন্ধুর নাকি বোনের বিয়ে!'

'কবে গেছে? কিসে ক'রে গেছে?'

'কাল গেছে—স্টীমারে—দু'-তিনদিন থাকবে বলেছে।'

'বলিস্ কি!—স্টীমারে? মনে ভেবেছে কি সব? এই ঝড়বৃষ্টিতে—যা' ইচ্ছে তাই করবে নাকি—তারপর এই তিনটি দিন এখন প্রাণ হাতে ক'রে বসে থাক। তোর মা যেতে দিলে অমনি স্বচ্ছন্দে?'

'কেন দেবেন না, মা তো বলেন, বাড়ী ব'সে ব'সে সব কুনো হয়ে গেল।'

বিল্বে আজ মরীয়া।···হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এমন অসময়ে বাবাকে আসতে দেখে ওর চিত্ত চ'টে গেছে একদম্।

'ওঃ, ভিতরে ভিতরে এসব শিক্ষাও চলছে! আমার কথা তা' হ'লে কিছুই শোনা হয় না?'

'কিস্যু না—সেরেফ্ কিস্যু না। আপনি মনে করেন দাদা সারাদিন গীতা পড়ে? ছোঁয়-ই না, খালি বিকুদের ছাতে গিয়ে ঘুড়ি ওড়ায়।'

'বিকুদের ছাতে? সে তো ন্যাড়া ছাত!'

ভবতোষবাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—চোখের সামনে ভেসে ওঠে—ভাঙ্গা পা, ফাটা মাথা, ব্যাণ্ডেজ, স্ট্রেচার, হাসপাতাল, আরও কত কিছু।

আবার বহুক্ষণ নিস্তব্ধতা। ভবতোষবাবুই সে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন, 'তোরা তা' হ'লে কি খেলি আজ? তুই আর নিবারণ? রান্না-টান্না হয় নি তো?'

'নাঃ, কৈ আর হ'ল? বিকেলেই তো মা নাচ দেখতে গেলেন। টাকা রেখে গিয়েছিলেন, বাজারের খাবার এনে খেয়েছি, ডালপুরী—সিঙাড়া—'

ভবতোষবাবুকে কি পেঁচোয় পেলো? ভদ্রলোক চমকে চমকে আধখানা হয়ে গেলেন যে! কিন্তু না চমকে উপায় আছে কিছু? এরকম হৃদয়-বিদারক সংবাদে ক'জন স্থির থাকতে পারে? ভবতোষবাবুও পারলেন না—আবার চমকালেন। চমকে বললেন, 'দিয়ে গেল তোর মা? হাতে ক'রে বিষ কিনতে টাকা দিয়ে গেল? বাজারের খাবার? কলেরার জার্ম! খেলি তোরা তাই? মরণের ভয় নেই?'

'হ্যাঁ, মরলেই হ'ল কিনা, তা' হ'লে কলকাতার শহরসুদ্ধ লোক একদিনেই পটল তুলতো—কিস্যু হবে না।'

'ওরে বাবা! সবাইর সঙ্গে তোদের তুলনা কি? তাদের 'অব্যেস্' আছে, আছে তোদের তা'? খেয়েছিস্ কখনও?'

বিল্বে বোধ হয় মনে করেছে হয় এস্পার, নয় ওস্পার ক'রে ছাড়বে। বললো, 'কেন খাবো না? রোজই তো খাই, আপনি যখন বাড়ী থাকেন না। দাদা তো রোজ "মালাই কুল্লি"ও খায় বাগানের জানলা দিয়ে ডেকে।'

দাদা একলাই খায় এরকম মনে করবার কারণ নেই, তবে কিনা 'রাজসাক্ষী' হ'তে হ'লে একটু ন্যাকা-খোকা না সাজলে চলে না।

দাদা মজাসে তিনদিন ধ'রে নেমন্তন্ন চালাবে, মা নাচ দেখবেন, বুলি যে বুলি সেও তোফা আরামে মামার বাড়ী ব'সে হয় রেডিও শুনছে, নয় ক্যারম ঠুকছে। আর বিল্বে কিনা বাড়ী আগলাবার জন্যে একলা প'ড়ে থাকল। এতে কা'র না রাগ হয়?

ভবতোষবাবুর বুকে কে যেন বিশ-মণী বোঝা চাপিয়েছে, আর নয় তো ঠিক মাথার কাছেই প্রকাণ্ড সিঁদ্ কাটা হয়েছে, হঠাৎ সকালে উঠে নজর পড়েছে।

খানিক পরে ভবতোষবাবু বললেন, 'হুঁ, বেশ বাঃ! তারপর তুমি? তোমায়

নিয়ে গেল না ব'লে তুমি কিছু বললে না যে?'

'আমার আবার বলা, সে যা' হবার তা' হয়ে গেল। মা আমায় একটা ফুটবল কিনতে টাকা দিতেন, তা' ভাঙানো ছিল না ব'লে দেওয়া হ'ল না। কবে থেকে ব'লে রেখেছিলেন, আর কি দেবেন? সব দিক দিয়ে আমারই কপালে অষ্টরম্ভা!'

'কেন, দেবে না কেন?'

'হুঁ, আর দিয়েছেন! আপনি যে হঠাৎ এরকম দুম্ ক'রে এসে পড়বেন, তা' আর কে জানতো?'

ভবতোষবাবু তখন ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে—জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সাপ, ব্যাঙ, বিচ্ছু, ইঁদুর, আরশোলা প্রভৃতি বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য ক'রে।

www.boiRboi.blogspot.com

অথ পরেশ-ঘটিত

পরেশ আমার চাকর, কি আমিই পরেশের চাকর, সেটা সব সময় বুঝে ওঠা শক্ত। অচেনা লোক তো ভুল করবেই—আমারই ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তুলনামূলক হিসেব করলে অপদস্থ হ'তে হবে আমাকেই।

গরমের দুপুরে আমি ঘেমে-টেমে ভিজে থসথসিয়ে খালিগায়ে ছটফট করে বেড়াই, পরেশ ফর্সা ধুতির ওপর 'সামারকুল' গেঞ্জি চড়িয়ে স্বচ্ছন্দে বসে বসে বিড়ি খায়।···আবার শীতের দিনে আমি একটা মোটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে জবুথবু গোছ হয়ে বসে থাকি, পারতপক্ষে নড়ি না, ও লংক্লথের শার্টের ওপর রামধনু-রঙা সোয়েটার পরে স্মার্টভাবে ঘুরে বেড়ায়।···বর্ষায় আমি মাথায় দিই ছাতা, ও গায়ে দেয় ওয়াটারপ্রুফ্।

আমি এখনো বাড়ীর সামনের রোয়াকে উবু হয়ে বসে পিঠে খবরের কাগজ

ঢাকা দিয়ে দিশী নাপিতের কাছে চুল ছাঁটি, পরেশ সেলুন ছাড়া চুল ছাঁটার কথা ভাবতেই পারে না।

এসব খরচ, মিথ্যে বলব না, সবটাই যে আমাকে করতে হয় তা নয়, ও নিজেও কিছু খরচা করে। মা যদিও বলেন, 'তা'তে কি? বাজার দোকান থেকে দৈনিক যে আট-দশ গণ্ডা পয়সা উপায় করে পরেশ, সে তো আমাদেরই পয়সা?' কিন্তু আমার মতে যে যেটা উপায় করে, সেটা তার নিজের সম্পত্তি, 'উপায়ে'র উপায়টা যাই হোক।

কাজেই পরেশের বাবুয়ানায় আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই।

থাকা উচিতও নয়।

তাছাড়া থাকলেই বা শুনছে কে? চাকরগিরি করতে এসেছে ব'লে তো আর চাষা হ'তে পারে না পরেশ? চাষা হয়েই যদি থাকবে তো কলকাতায় এসেছে কেন?

তবে কতকগুলো অভ্যাস, যেমন বেলা আটটা অবধি ঘুমোনো, বা আমার চিরুনীতে টেরিকাটা, আর আমার সাবান গায়ে মাখা প্রভৃতি বদ অভ্যাসগুলো সব সময় বরদাস্ত করা যায় না। রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়। তবুও পরেশকে ছাড়াতে পারি না। এ বাজারে চাকর একটি গেলে কি আর হবে? এরকম চালাকচতুর চটপটে চাকর! হাঁদারাম চাকর আমার দু'চক্ষের বিষ! বরং ফিচেল সহ্য হয় তো উজবুক সহ্য হয় না।

ঘুম থেকে উঠে আমিই আগে সদর-টদর খুলি, গয়লা আর কাগজওয়ালার ডাকের জন্যে তৎপর হয়ে উঠি, তারপর উনুনে কেটলী চাপিয়ে পরেশকে ডাকাডাকি করি।...জল ফুটে ফুটে মরে যায়, পরেশ আর উঠতে চায় না। অনেক সাধ্য সাধনায়, অসন্তোষ অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে অবশেষে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে উঠে বসে। ভারী গলায় বলে, 'চা-টুকুন ভিজিয়ে দিন গে যান না দাদাবাবু! এমন কি মহামারী কাজ? যাচ্ছি! ঘুম থেকে উঠেই বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করে, কাজে গা লাগে না।'

অগত্যা চা আমি নিজেই তৈরী ক'রে নিই। সত্যি, একটা মানুষের বুক ধড়ফড় করলে তো আর তাকে কাজের হুকুম করতে পারি না? আমি আবার একটু ইয়ে গোছের, যাকে বলে সাম্যবাদী। তাই পরেশের চা-টাও তৈরী করে কাঁচের গেলাসে ঢেলে দিয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসি। তখন পরেশ এসে কাজে যোগ দেয়,

'দাদাবাবুর যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই সাড়ে আটটার সময় আপিসে গিয়ে বসে আছে, ওনার টাইমে পঞ্চব্যঞ্জন যোগাতে কে পারবে মা ?'

[পৃষ্ঠা—৬৩

মানে মুখের সঙ্গে গেলাসের যোগাযোগ স্থাপন করে।

চায়ের পর ঝাঁটপাট দেওয়া, বিছানা তোলা, প্রভৃতি কাজগুলোই করার কথা—মা তাই বলেন, কিন্তু বাজার যাবার গরজ পরেশের ষোল ছাড়িয়ে আঠারো আনা। চা খাওয়া হ'লেই ফুলকাটা চটের থলিটি নিয়ে কেটে পড়ে। বেলা হয়ে গেলে নাকি মাছ পাওয়া যায় না!

অবিশ্যি সকাল সকাল গেলেও পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। জানা সম্ভবও নয়, কারণ পরেশ যখন বাজার করে ফেরে, আমি তখন অফিসে পুরনো হয়ে গেছি। মার মুখে শুনতে পাই, আমার খাওয়ার অসুবিধে নিয়ে মা বকাবকি করলে পরেশ উল্টে বিরক্ত হয়ে বলে, 'দাদাবাবুর যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই সাড়ে আটটার সময় আপিসে গিয়ে বসে আছে, ওনার টাইমে পঞ্চব্যঞ্জন কে যোগাতে পারবে মা?'

আমিই বারণ করি মাকে, বলি, 'কি দরকার বকাবকিতে? আলুভাজা থাকলেই যথেষ্ট ভালো খাওয়া হয়।

রোজদিনের মতো আজও ঘুম ভেঙে নীচে নামছি, দেখি পরেশ ইতিমধ্যে উঠে বড় বড় দুটি কাঁচের গ্লাসে চা ঢালছে। খুশী হয়ে উঠি, একগাল হেসে বলি, 'কি হে, পরেশবাবু যে আজ গুড্‌বয়! ব্যাপার কি?'

পরেশ গম্ভীর ভাবে বলে, 'রাত্তিরে ভাইপোটা এসেছে দাদাবাবু, তার জন্যেই তাড়াতাড়ি। সে আবার এক পাগল-ছাগল মানুষ, ঘুম থেকে উঠেই খেতে না পেলে রসাতল!···বিস্কুট দু'খানা দেন দেখি।'

দু'খানা বিস্কুট দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু হঠাৎ পাগল-ছাগল মানুষের আবির্ভাবের খবরে চমকে উঠি।

বললাম, 'সে আবার কে রে পরেশ? কই কখনো তো ভাইপোর কথা শুনিনি?'

'গরীবের কথা কবে কান দিয়ে শুনেছেন বাবু? আছে সবই, ভুঁইফোঁড় তো

আর নই। পঞ্চু, অ পঞ্চু আয়রে—'

কথার সুরে বাৎসল্য স্নেহ ঝরে পড়ে। পড়বে নাই বা কেন? চাকর বলে কি মানুষ নয়? পরেশের ডাকে গুটিগুটি যে জীবটি এসে দাঁড়ালো, তাকে হঠাৎ দেখলে 'পাগল ছাগল' ভাবা বিচিত্র নয়। বড় বড় চুল, মুখটা তেল-চকচকে, হাত-পা অপরিষ্কার, পরনে শুধু একটি লুপ্তবর্ণ খাকী প্যান্ট—তাতে সাদা কাপড়ের তালি মারা। পেটের গড়ন দেখলে পীলের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে একটা কথা বলতে হয় তাই বলি, 'কি হে, কাজকর্ম করবে বলে এসেছ কলকাতায়?'

পঞ্চু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বিস্কুট চিবোতে থাকে।

'কাজ করবে না? তবে?'

পঞ্চু বিরক্তভাবে বলে, 'কাজ করতে যাবো কি দুঃখে? ভূঁইয়ের ভাত কে খায় তার ঠিক নেই। মামাদের একশো বিঘে ধানজমির মালিক কে? এই পঞ্চুই তো! মামা তো শিঙে ফুঁকলো।'

বুঝলাম পরেশের ভাইপো আর কিছুতে না হোক, ভাষার ছটায় কাকার উপযুক্ত। ক'শো বিঘে জমিতে ওরা কথার চাষ করে কে জানে।

চায়ের গেলাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে নিজের মনেই আবার বলে, 'এমনিই এসেছি কলকাতায়। বেড়াতে আসে না মানুষ? কাকার বাসা রয়েছে যেখানে…'

পঞ্চু রয়ে গেল।

আজও আছে কালও আছে।…কিন্তু থাকবে না কেন—নিজের কাকার বাসা রয়েছে যখন?

মা থেকে থেকে এসে বলেন, 'হ্যাঁরে উদয়, পরশার ভাইপোটা রয়ে গেল এর মানে? একে তো রেশনের চাল কমিয়ে দিয়েছে, তার ওপর ওই পাড়াগেঁয়ে দস্যি পোষা! একশো বিঘে জমির ধানের ভাত খাওয়ার ধাত ওদের, আমাদের এক মাসের চাল সাতদিনে কাবার করলে! তাড়া ওকে?'

'তুমিই তাড়াও না মা।'—কাতর ভাবে বলি।

'আমি? রক্ষে করো বাবা! যা তোমার আদরের চাকরের লম্বা লম্বা কথা! সেদিন একটু বলেছি, আর পরশা বলে উঠলো কিনা, আপনার এমন ছোট নজর কেন মা? কুকুর শেয়াল নয়, মানুষের ছেলে, দুটো ভাত খাচ্ছে, তাও প্রাণে সইছে না? ওকি ভাতের অভাবে পড়ে আছে? পাগল-ছাগল উদোমাদা ছেলেটা মন টেঁকিয়ে আছে এই ঢের! কই দাদাবাবু তো কিছু বলে না? আপনি বুড়োমানুষ, ধম্মকম্ম করুন—এদিকে দিষ্টি কেন?'

শুনে চক্ষুলজ্জা একটু না হয়ে পারে না।

সত্যিই বটে, মানুষের ছেলে দু'টো ভাত খাচ্ছে—তাও ঘরে যার ভাতের ছড়াছড়ি, তাকে যেতে বলি কোন্ লজ্জায়?···তবু রেশন সিস্টেমের সুবিধে, চক্ষুলজ্জার বালাই কমে যায়। যুদ্ধ এ সুবিধে করে দিয়েছে।

সময় বুঝে একদিন বলি, 'হ্যাঁরে পরেশ, তোর ভাইপোর কলকাতা বেড়ানো হ'ল?'

পরেশ বিরক্তভাবে হাত উল্টোয়, 'কই আবার? সময় কোথা পাচ্ছি বলুন? চব্বিশ ঘণ্টাই তো আপনার কাজ। ওকে তো আর একলা ছেড়ে দিতে পারিনে? শুধু চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, হগমার্কেট, কোম্পানীর বাগান, হাবড়ার পুল, আর লেক্, এই দেখা হয়েছে—'

খুশী হয়ে বলি, 'তবে তো সবই হয়েছে রে? বাকা কি? আর আছে কি কলকাতায়?'

'দাদাবাবুর এক কথা! কলকাতার জিনিস দেখে ফুরোয়? লালদীঘি, গোলদীঘি, পরেশনাথের মন্দির, হাইকোর্ট, লাটসায়েবের বাড়ী, এসব বাদ দিলেও—সিনেমা? সিনেমা আছে কটা তার হিসেব আছে? এই তো মোটে সাতটা দেখা হয়েছে, সবগুলো দেখতে একবছরেও কুলোবে কিনা সন্দেহ। নিত্যি নতুন বই উঠছে।'

আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।

কলকাতার শহরের সমস্ত সিনেমাগুলো দেখে শেষ করতে হ'লে একজন্মেও কুলোবে কিনা সন্দেহ হয়। মোটে সাতটা! কিছুই নয় তার কাছে।···সেই

অনির্দিষ্টকাল পঞ্চুর ভাত যোগাতে হবে!

মরিয়া হয়ে বলি, 'তোর মা যে বকাবকি করছিলেন! রেশন কমে গেছে…'

'মার কথা বাদ দেন, যত বুড়ো হচ্ছে তত কেপ্পন হচ্ছে।'

অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টে চলে যায় পরেশ।

আর কি বলবো?

কিন্তু পারাও যায় না।

সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশঃ।

গরম হ'লেই পঞ্চু আমার ঘরে ঢুকে টেবিল ফ্যান খুলে দিয়ে ঈজিচেয়ারে শুয়ে থাকে। খিদে পেলেই আমার মীট্‌সেফ্ থেকে মাখন, বিস্কুট, পাকাকলা, আর কমলা-লেবুর সদ্ব্যবহার করে। আমার চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর কলকাতায় এসে সেলুনে ছাঁটা বাহারী চুলগুলি আমার 'মহাভৃঙ্গরাজে' চকচকে ক'রে রেখে দেয়। অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গেলাম—

গেলাম যেদিন দেখলাম আমার অনেক কষ্টে যোগাড় করা আটচল্লিশ ইঞ্চির ধোয়াসুতোর ফাইন ধুতিখানি পরে পঞ্চু থিয়েটার দেখতে গেছে।…রাগে গম গম করতে করতে সারাবাড়ী ঘুরে বেড়াই…নাঃ, খুড়ো ভাইপো দু'টোকেই আজ কোতোল করবো। ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার! খুনই করবো! মাকে ডেকে বলি, 'মা, পঞ্চা আর পরশার চাল নিও না আজ, দু'টোকেই দূর করে দেব।…উঃ, ইচ্ছে করছে কেটে ফেলি হতভাগা দু'টোকে।…ভালোমানুষির কাল নেই।'

খানিক বাদে পান চিবোতে চিবোতে দুই মূর্তিমানের উদয়।

মেজাজে শান দেওয়া ছিল, তেড়ে উঠে বললাম, 'পরশা! স্টুপিড হতভাগা রাস্কেল, দূর হয়ে যা! একখুনি দূর হয়ে যা! বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে, আর দ্বিতীয়বার যেন তোর মুখ দেখতে না হয় আমাকে।'

পরেশ চিরদিনই গম্ভীর। গায়ের পাঞ্জাবি খুলে তারে মেলে দিতে দিতে গম্ভীর ভাবেই বলে, 'এখন রাতদুপুরে দুটো দুটো মানুষ কোথায় যাবো শুনি! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে আর 'দূর হয়ে যা, বেরিয়ে যা' বলতে হ'ত না। যা জল আসছে,

রাস্তায় তো মা গঙ্গা বইবেন। তবে যদি গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন আলাদা কথা। ধম্মে হয়, দিন।'

আমি আর সহজে টলবো না ঠিক করেছি, হুঙ্কার দিয়ে বলি, 'তবে কি তুই ভেবেছিস বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি?'

পরেশ কিছু বলার আগেই পঞ্চু ফিক করে হেসে বলে, 'দাড়িই নেই আপনার তো উপড়াবে কি?'

ওঃ! ওরও আবার কথা! দেখ আস্পর্ধা! সরাসর ওকেই ধমকাই, 'লক্ষ্মীছাড়া বদমায়েস! কিছু না বলে সাহস বেড়ে গেছে! আমার ধুতি পরেছিস কেন?'

পঞ্চু করুণভাবে বলে, 'আমার প্যান্টটা যে ছিঁড়ে গেছে।'

'তাই বলে আমার কাপড় পরবি?'

'ছেঁড়া প্যান্ট পরে থিয়েটারে যাবো বুঝি? বা রে, হিঃ!'

'না যাবি তো ভেলভেটের সুট আনিস নি কেন হনুমান?'

'আনবো কি করে শুনি? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছি না?'

'বেশ করেছ। এখন ভাল চাও তো মানে মানে সরে পড়ো।'

পঞ্চু ম্লানমুখে চলে যায়। একটু যে মায়া না হ'ল তা' নয়—কিন্তু মরুগ গে।

ও হরি! একটু পরেই নিজের ছেঁড়া প্যান্টটি পরে ছাড়া ধুতিখানি হাতে ক'রে পঞ্চুবাবু এসে হাজির।··'এই নাও তোমার কাপড়!···বাবা! একখানা কাপড়, খেয়েও ফেলি নি চুরিও করি নি, তার জন্যে এত মুখনাড়া! শ্যাল-কুকুরের মতন 'দূর হ বেরো' করে খেদিয়ে দেওয়া—ছি! ভদ্দর নোকের ক্ষুরে দণ্ডবৎ!'

বিছানার ওপর কাপড়খানা রেখে চলে যায়।

মানুষ তো, তাই 'বাস্ট' করি না, আস্তই দাঁড়িয়ে থাকি···কথা যোগায় না বলেই চুপ মেরে যাই।

পরেশ অমায়িক হেসে তাড়াতাড়ি কাপড়টা তুলে নিয়ে বলে, 'সাধে বলি উদোমাদা পাগল-ছাগল! আক্কেলের ছিরি দেখ।···দাদাবাবু তোর ছাড়া কাপড়খানা ফেরত নেবেন?···নে চল্। কাপড় কাপড় করে মরছিলি, হ'ল একটা কাপড়! ভালো

কথা—গণ্ডা কতক পয়সা দেন দিকি, মা আবার আজ চাল নেয় নি আমাদের। দু'টো দু'টো মানুষ রাতউপোসী থেকে গেরস্থর পাপ বাড়াতে পারি না তো! চট করে দেন, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

দাঁত কিড়মিড় করে পাগলের মত একটা টাকা ছুঁড়ে দিই।

'আস্ত টাকাটাই দিলেন? বেশী খরচা করা দেখছি এক রোগ আপনার!···নে পঞ্চু, হিঙের কচুরি আর আলুর দম খাবো খাবো করছিলি—চল্।'

পরদিন আবার ভাতের চাল নিতে হয়। উপায় কি? রোজ রোজ বাজারের খাবার খেলে পয়সা কি কম লাগবে?

ওরা তো রয়েই গেল।

আবারও সহ্যের সীমা অতিক্রম করলাম বই বিক্রীর ঘটনায়!

ক'দিন থেকেই দেখছি, যে বইটাই খুঁজি, পাই না। আলমারির তাক হালকা লাগে—সেল্‌ফ্ টেবিল ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। কেন রে বাবা, পঞ্চু কি বইও পড়ে? ইংরিজী বই!

সেদিন থেকে পরশার সঙ্গে কথা কই না, আজ বাধ্য হয়ে ডাকতে হ'ল। কিন্তু ডেকে কি শুনলাম?···পুরনো কাগজ বিক্রী হয় দেখে শখ ক'রে বইগুলো নাকি শিশি-বোতলওয়ালাকে বেচে দিয়েছে পঞ্চু। পাগল-ছাগল মানুষ, কোন্ বইয়ের কি দর জানে না তো!

রাগারাগি করবার স্পৃহাও চলে যায়।

স্থির হয়ে বলি, 'কাল সকালে তোমাদের যেন আর দেখতে না পাই, অনেক সহ্য করেছি আর নয়।'

পরেশ ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'মানছি আপনার ক্ষেতি হয়েছে! কিন্তু বাবু, সহ্য আমিই কি কম করেছি? বাপ-মরা ভাইপোটা দু'দিন এসেছিল—মার কি খিটখিটুনি,

দু'টো ভাতের জন্যে রাতদিন গজ গজ! ছেলেমানুষ অবুঝ, একটা অপরাধ করে ফেললে আপনার এ্যইসা রাগ! দুই হোক ছাই, গরীবের আবার আপনার লোক, তার আবার মায়া! যাক গে—ও আপদকে বিদেয় করেই দিচ্ছি। কাল সকালে উঠে যদি ওর মুখ দেখতে পান, তবে আমার নামে কুকুর পুষবেন।'

সকালে উঠে হঠাৎ মার তীব্র চিৎকারে চমকে উঠি। কান্না, না গালাগাল? না কি হাত-পা আছড়ানি? কি হ'ল? সাপে কামড়ালো?···ঊর্ধ্বশ্বাসে যাই, হাঁফাতে হাঁফাতে বলি, 'মা, কি হ'ল তোমার?'

মা কপালে থাবড়া মেরে আলমারির দিকে দেখিয়ে দেন।

কপাট খোলা, দেরাজ খোলা, মার গহনার বাক্সটি লোপাট।

বুঝতে দেরী হয় না—পঞ্চুর কাজ। মুখ দেখাবে না বলেই বোধ করি চিরদিন যাতে মুখটা মনে থাকে তার ব্যবস্থা করে গেছে।

মা আমাকে দেখেই প্রবল চীৎকার করে ওঠেন, 'তোর আদরের চাকর আর পঞ্চা হতভাগাকে যদি ফাঁসি না দিবি উদয়, তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।···নয় তো দে আমাকেই একখানা বঁটী-কাটারী এনে দে, দু'টোকে আমিই কেটে ফাঁসি যাই।'

'তার দরকার কি মা?' পরেশ পাশ থেকে উদাসভাবেই বলে, 'আমাকেই দাও অস্তরখানা—সে ছোঁড়াকে খুঁজে এনে কেটে কুচি কুচি করে নিজের গলায় চোপ দিই। মনের বাসনা মিটুক তোমার।···বলছি জিনিস তোমার চুরি যায় নি—পাগল মনিষ্যি, মনের ভুলে নিয়ে গেছে, তবু এমন চণ্ডাল রাগ যে দু-দু'টো খুনই করতে রাজী! ···চুড়ি, বালা, হার, অনন্তর শোকে ক্ষেপেই উঠলে একেবারে!···তা'ও বলি বিধবা মানুষ, গয়নায় তোমার দরকারটা কি তাই শুনি?'

নিবারণের বারণ

নিবারণ উকিল হরকালীবাবুর পুরনো বন্ধু।

কেউ কারুর পরামর্শ ভিন্ন সহজে কিছু করেন না। নিবারণ নামকরা উকিল, আর যুদ্ধের বাজারে হরকালী দস্তুরমতো ফেঁপে উঠেছেন। অতএব কারুরই অপরের কাছে টাকা ধার করতে হয় না, কাজেই বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কোনো কারণ ঘটে নি।

সকালবেলা ডাক পড়তেই নিবারণ এসে হাজির, রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়তে পাড়তে আসেন, 'কি ভায়া, কি খবর? সকালবেলা জরুরী তলব কেন?'

আষাঢ়ের অমাবস্যার মতো মুখ নিয়ে হরকালী বললেন, 'আমি উইল করবো।'

নিবারণ তো আকাশ থেকে ডিগবাজী খেলেন।

'উইল করবে কি রকম? খামাকো উইল করবে মানে কি? কি উইল?'

'একসঙ্গে দুটো চারটে প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা সকলের থাকে না নিবারণ, একে একে বলো।'

'একে একেই তো বলছি, বলি হঠাৎ রাত পুইয়েই উইল করবার কুমতলব কেন?'

'সু-ই বল আর কু-ই বল, মন আমি স্থির করেছি নিবারণ! আমার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে কাশীবাসী হবো।'

'বিষয়-আশয় মিশনে দেবে মানে? তোমার ছেলেরা?'

'সব ব্যাটাকে তেজ্যপুত্তুর করবো, বুঝলে নিবারণ, একধার থেকে সব ক'টাকে।'

'বল কি? হঠাৎ?'

'তা বলতে পারো, কিন্তু ঠিক হঠাৎ বলা চলে না। আমি অনেক সহ্য করেছি বুঝলে, কিন্তু আর না। তুমি বন্ধুমানুষ, তোমায় বলতে বাধা কি—ছেলে তিনটি আমার এক-একটি ধনুর্ধর, বুঝলে? যেমনি পাজী তেমনি গোঁয়ার, উড়নচণ্ডে আর বেয়াদবের একশেষ। একফোঁটা মানে না আমাকে—এক ফোঁটা না। বলে কিনা, "দেশের কাজ," করবে। শুনেছ কথা নিবারণ? দেশের কাজ করতে যাবি কি দুঃখে

'সব ব্যাটাকে তেজ্যপুত্তুর করবো, বুঝলে নিবারণ, একধার থেকে সব কটাকে।'

[পৃষ্ঠা—৭০

তাই বল ? সে করুক যাদের ঘরে ভাত নেই তারা। তোদের মনে কর, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেয়ে জীবন কেটে যাবে, তোদের এ উঞ্ছবৃত্তি কেন ?···"চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"—সেই ছোটলোকের মতন হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে, আবার বলে কিনা —আমি সেকেলে, আমি বুড়ো ! এ্যাঃ নিজের বাপকে বলে কিনা সেকেলে বুড়ো !'

নিবারণ হাসি চেপে বলেন, 'এ্যাঃ কী ভীষণ বেয়াদপি, নিজের বাপকে বলে বুড়ো ? তা এ ছেলেদের শিক্ষার দরকার, উইলই করা হোক, কি বল ?'

'নিশ্চয়ই, এখুনি ! এই নাও কাগজ কলম, খসড়াটা হয়ে যাক।'

'হয়ে যাক।'

নিবারণ লিখতে শুরু করেন, হরকালী বলে যান।

হরকালীর তিন ছেলের যাবতীয় দোষ বর্ণনা করে অবশেষে লেখা হ'ল, 'যেহেতু তাঁর ছেলেরা এরূপ অবাধ্য দুর্বিনীত লক্ষ্মীছাড়া, সেহেতু হরকালী তাঁর নগদ ত্রিশ হাজার টাকা রামকৃষ্ণ মিশনে দান করতে ইচ্ছুক। বাড়ীখানিও বিক্রয় করা হবে, সে টাকা হরকালীর নিজের ভবিষ্যতের জন্য থাকবে, কারণ কাশীবাস করলেই তো আর বাবা বিশ্বনাথ দু'বেলা ভাত যোগাবেন না !

নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছায় সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে তিন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন হরকালী।'

নিবারণ লিখেটিখে কলমটি নামিয়ে বলেন, 'একেবারে তেজ্যপুত্তুরই করে ফেললে হরকালী ? একটু দয়া-ধম্ম—'

হরকালী তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, 'দয়াধম্ম ? দয়াধম্ম কি হে ? ওদের দেখে নেবো না আমি ? কত ধানে কত চাল দেখিয়ে ছাড়বো না ? বাপকে মানবে না ! বাপ বুড়ো ! এখন বোঝো সুখ। তেজ্যপুত্তুর করবো না ? আলবাৎ করবো, একশো-বার করবো। কালই ঘাড় ধরে বার করে দেবো বাড়ি থেকে সব ক'টাকে।···বলি আমাকে তোদের দরকার, না তোদের নিয়ে আমার দরকার ? আমার কি ? একটা সুটকেস হাতে করে কাশী চলে যাবো, ব্যস্। টাকা দেবো, পেসাদ খাবো—কার কি তক্কা রাখি ?'

'কাশী যাওয়াই ঠিক করলে তা'হলে ?'

'তা'হলে মানে? এখনো আবার তা'হলে কি? এই আজই উইল রেজিস্টারী করবার দরখাস্ত দাও গে যাও, একদিনও বিলম্ব নয়, কাশী যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। বাড়ীতে আমার একদণ্ড সুখ নেই, বুঝলে? আঃ, ঝাড়া হাতপায়ে কাশীবাসী হবো, এর চেয়ে আর সুখ কি আছে? একটি সুটকেস, একখানি রেলওয়ে টিকিট, আর আমি, ব্যস্!'

'তা' যা বলেছ হরকালী।···তা'হলে মন তুমি স্থির করে ফেলেছ?'

'কি বারে বারে সন্দেহ করছো? হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। হ'ল?'

'না না, তাই বলছি, রাগ করো না। আচ্ছা দেখি এটার ব্যবস্থা।'

নিবারণ উঠে দাঁড়ান, উইলের খসড়াটা গুটিয়ে পকেটে পুরে একটি হাই তুলে একটু ইতস্ততঃ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'তোমার এই গড়গড়াটা রূপোর, না হরকালী?'

'তাতে আর সন্দেহ আছে?' হরকালী গর্বিতভাবে বলেন, 'খাঁটি রূপো দিয়ে গড়ানো, আড়াই সের ওজন জিনিসটার। আজকালকার বাজারে ওর দাম···'

'হ্যাঁ দাম অনেক, কিন্তু এটা তো তুমি আমায় প্রেজেন্ট করতে পারো?'

'প্রেজেন্ট?' হতবুদ্ধি হরকালী অবাক সুরে বলেন, 'প্রেজেন্ট মানে? হঠাৎ কি হ'ল তোমার? বিয়ে না জন্মতিথি?'

'সেসব কিছু নয়, মানে—এটা তো আর তোমার কাজে লাগবে না?'

'কেন? হঠাৎ কি আমি ধূমপান ছেড়ে সাধু বনে' গেলাম নাকি?'

'তা নয়, মানে—একটা সুটকেসে আর কতই ধরবে তোমার? জামা-কাপড়ও তো নিতে হবে চারটি? তা'ছাড়া আমারও ওটার ওপর অনেক দিনের লোভ।'

'কি বললে? অনেক দিনের লোভ? হুঁ!'

হরকালী একবার গম্ভীরভাবে নিবারণের দিকে তাকান, 'আমার এই শখের জিনিসটির ওপর তোমার অনেকদিনের লোভ, কেমন? বেশ! তা'হলে নিও···'

'নিও' কথাটার মধ্যে যে সুরটি সেটি মোটেই বন্ধুবাৎসল্যের সুর নয়, তবু নিবারণ সুযোগ ছাড়েন না—গড়গড়ার ওপর থেকে কলকেটি নামিয়ে গড়গড়াটা হাতে করেন।

'কি, ওটা তুমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। নিলামই যখন—মানে দিলেই যখন,···আচ্ছা হরকালী, বাড়ী তো বেচবে, তোমার এইসব ফার্নিচার-টার্নিচার? মেলাই তো করে ফেলেছো!'

গড়গড়ার ব্যাপারে বেশ একটু তেতে ছিলেন হরকালী, বিরক্তভাবে বলেন, 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, জাহান্নমে যাক ওসব, বুঝলে?'

'তাই তো বুঝছি—মানে, তোমার ওই উড়নচণ্ডে লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলোর হাতে পড়লে জাহান্নমে ছাড়া আর কোথায় যাবে?'

হরকালী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'আমার ছেলেদের সমালোচনা করতে তো তোমায় ডাকি নি নিবারণ!'

'আরে ভাই, বন্ধুমানুষ তুমি, তাই এত ভাবনা। আমি বলি কি, কাশী যাবার আগে বেচে দাও না ওগুলো, অবিশ্যি পুরো দাম কি আর পাবে? সিকি আধা যা পাও! ধরো না কেন, আমিই তো নিতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি হরকালী, রোজগার করি বটে, তোমার মতন এমন সাজানো-গোছানো ফিটফাট বাড়ী আমার নয়, বরং এ জিনিসগুলো পেলে—'

'তোমার বাড়ীটা সাজানো হয়, কেমন?'

হরকালীর কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস।

নিবারণ একগাল হেসে বলেন, 'সে যা বলেছ! বিশেষ তো তোমার এই বুককেসগুলো পেলে কি সুবিধেই যে হয়! বরাবরই এগুলোর ওপর ঝোঁক আছে আমার, তা' তোমার যখন আর কাজে লাগছে না···আমার বৌমারা বলেন, "ও-বাড়ীর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ী কেমন সুন্দর আরশি-বসানো আলমারির গাদা! আমাদের নেই।" এইবার তাদের খেদ মিটলো। তা'হলে মোটামুটি দর একটা দিয়ে ফেল হরকালী! মানে, নেহাৎ দেওয়া বলেই দু'চারশো টাকা দেওয়া—নইলে আমার কাছে আবার দরদাম, হ্যাঁঃ!'

হরকালী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিবারণের দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে বলেন, 'বৌমাদের আর খেদ থাকে না, কেমন? আর বুককেসগুলো, আর্শি-আলমারি পেলে হ'ল তোমার? আর তোমার ছেলেদের?'

'ছেলেদের! সে তুমি ইচ্ছে করে যদি কিছু দাও, মাথায় করে নেবে। মানে,

চিরদিনের মত কাশীবাসী হবার আগে ওদের নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে যাবে তুমি, নিজের ভাইপোর মতনই ভালোবাসো যখন। তা' তোমার ছোট গাড়ীখানা আমার মেজ ছেলেটাকে দাও না ভাই! সে ডাক্তার মানুষ, আলাদা একটা গাড়ী থাকলে সুবিধে হয়।'

'ও! তা'হলে গাড়ীটাও তোমার চাই?'

'আমার নয়', নিবারণ উদাসভাবে বলেন, 'আমার ছেলের। ছোট একটা গাড়ীর ইচ্ছে তার বরাবরের। আর তোমার নিজের উড়নচণ্ডে হতভাগা ছেলেদের যখন তেজ্যপুত্তুর করে দিচ্ছ, তখন আমার সোনার চাঁদ নীরেন, নেপেনকে বেশ কিছু দিয়ে যাবে তুমি—'

'চোপ রও!' হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন হরকালী, 'তোমার ছেলেদের গুণের কথা আর বলতে হবে না। বলি আমার ছেলেদের হতভাগা উড়নচণ্ডে বলবার কি রাইট আছে তোমার নিবারণ? কি রাইট আছে?'

'চটছো কেন হরকালী? রাইট বল, প্রমাণ বল, সে তো আমার পকেটেই আছে, কিন্তু মোটের ওপর আমার কথাগুলো যেন ভুলো না। আমি বরং এখনই গিয়ে একটা লরী পাঠিয়ে দিই গে, আলমারি-ফালমারিগুলোর জন্যে, আর নেপেনকেও বলি গে "গাড়ীর ভাবনা তোর ঘুচলো"! আঃ হরকালী! কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো, আজকের বাজারে এত সব জিনিস যোগাড় করা—'

'তা'হলে আমার কাশীবাসে তোমার খুব সুবিধে হচ্ছে?'

হরকালীর স্বর ভীষণ!

'নিশ্চয় নিশ্চয়, তা' আর বলতে? অবিশ্যি ছেলেগুলোকে তেজ্যপুত্তুর না করলে এত সব কিছুই হ'ত না। সেটাও—'

'সেটাও তা'হলে তোমার পক্ষে রীতিমতো লাভ?' হরকালীর স্বর বিভীষণ!

'সংসারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—'

'লাভ? কেমন? তোমার সুবিধে, তোমার ছেলেদের সুবিধে, তোমার বৌমাদের সুবিধে! বলি হ্যাঁ হে নিবারণ, তোমার গুষ্ঠির সুবিধে করবার জন্যে আমি কাশীবাস করতে যাবো ভেবেছ?'

'তা ভাই, "কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস" এ তো জগতের রীতি।'

'নিকুচি করছি তোমার রীতির! উইল ফেরত দাও আমায় শিগগির!'

'সে কি হে, এত কষ্ট করে লেখালে—'

'আমার খুশী লিখিয়েছি, আমার খুশী ছিঁড়বো, দিয়ে দাও!'

নিবারণ করুণমুখে বলেন, 'তা'হলে এ উইল বাতিল? ছেলেদের তেজ্যপুত্তুর—'

'করবো না। হ'ল?'

'আর ওই ওরা তোমাকে অপমান করবে, বুড়ো বলবে—'

'আলবৎ বলবে। তোমাকে তো বলতে যায় নি? বুড়ো বলবে না তো কি তরুণ বলবে আমাকে? সরে পড়ো হে নিবারণ, সরে পড়ো। মতলব বোঝা গেছে তোমার, হরকালী মিত্তির ঘাসের বিচি খায় না!'

পকেট থেকে উইলখানা বার করে নিবারণ দুঃখিতভাবে বললেন, 'মতটা বদলালে তা'হলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ'ল?'

'তা'হলে যাই, আর কি করবো? সকালবেলা ঝুটমুট খানিক সময় নষ্ট!'

আশাভঙ্গের হতাশ মুখ নিয়ে নিবারণ গড়গড়াটি নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

'ওটা নিচ্ছ মানে? রেখে দাও, যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কল্‌কে বসিয়ে দাও। ব্যস, যেতে পারো তুমি।'

'কাশীবাসও তা'হলে···'

'করবো না, হয়েছে? খুব দাঁও মারবে ভেবেছিলে, কেমন? নাও এখন এইটি—'

বয়সের মর্যাদা ভুলে পাকাচুল হরকালী মিত্তির নিবারণ উকিলের মুখের সামনে চিরবিশিষ্ট আঙ্গুল দুটি নেড়ে দেন।

নিবারণ কি খুব বেশী অপদস্থ হয়ে গেলেন? হবার তো কথা, কিন্তু হলেন আর কই! দিব্যি তো প্রসন্নমুখে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ী ফিরলেন।

বলবার মতো নয়

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই জামাই সাংঘাতিক বেঁকে বসলো। আর একদিনও থাকবে না। না, একটি রাত্রিও নয়। সকাল বিকেল দুপুর সন্ধ্যা যখন ট্রেন পাবে চলে যাবে।

শুনে বাড়ীসুদ্ধ লোক 'থ'।

সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনভাড়া দিয়ে আটদিনের কড়ারে নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছে নতুন জামাইকে, আর এখন কিনা জামাইয়ের মুখে এই বার্তা!

কে কি বলেছে? কে কি অপমান করেছে? কি জন্যে জামাই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো? নিশ্চয়ই অজান্তে কোন অপরাধ করে ফেলা হয়েছে। শনি, সত্যনারায়ণ, আর জামাই, কখন যে কিসে বিগড়ে যান, তা নরলোকের বোঝা অসাধ্যি!

শ্বশুরমশাই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে ডেকে রীতিমত জেরা শুরু করে দেন। গতকাল জামাই আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কে কি কথা কয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু না, দোষণীয় কিছু পান না।

পানের মধ্যে আরসোলা পুরে দেওয়া, জুতার মধ্যে আলতা ঢেলে রাখা, ন্যাকড়ার লুচি, ময়দার সন্দেশ, আর ঘাসের শাকভাজা খাওয়ানোটা তো নেহাৎ পুরনো ঠাট্টা, আদি-অন্তকাল থেকে চলে আসছে! ওর জন্যে রাগের কি আছে? ওদের বাড়ীতেই কি নতুন জামাইকে এভাবে অপদস্থ করবার চেষ্টা চলে না শালা-শালী-মহলে?

অতএব ওটা কারণ নয়।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি শুনছি বাবা? তুমি নাকি আজই চলে যেতে চাইছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে কি কথা বাবা, কত আশা করে আছি তুমি ছুটির কদিন থাকবে!

ছেলেরা ধরেছে একদিন পিক্‌নিক করবে। তা'ছাড়া আমি তোমাদের নিয়ে এখানের কালীমন্দিরে যাবো···'

'কি করবো বলুন, না গিয়ে উপায় নেই আমার।'

'বেশী দরকারী কাজ আছে কিছু?'

জামাই নিরুত্তর।

'কই আগে তো শুনি নি, কি কাজ?'

জামাই বোবা।

'তা' হলে যাবেই?'···শাশুড়ী ঠাকরুণ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

শ্বশুর এসে বললেন, 'কি ব্যাপার? হঠাৎ প্রোগ্রাম চেঞ্জ করছো কেন? ছুটিটা এখানেই কাটিয়ে যাবার কথা ছিল···এখন না না, ওসব শুনবো না, চলে যাবে কি বল? পাগল!'

'আমায় মাপ করবেন।'

শ্বশুর ভেবেছিলেন তাঁর অনুরোধ কি আর ঠেলতে পারবে? যতই হোক শ্বশুর পরম পূজনীয় গুরুজন! দেখলেন জামাইটি কথায় ভেজবার নয়। তবু শেষ চেষ্টা···

'আচ্ছা কারণটা কি বল দেখি? কাল এসেছ, তখন কিচ্ছুই বললে না!'

'তখন বুঝতে পারি নি।'

জামাই লাজুকও আছে, বাচালও নয়, কিন্তু একগুঁয়ে বটে একখানি! তারাপ্রসন্নবাবু এখানকার কোর্টের একজন বাঘা উকিল, জজসাহেব পর্যন্ত ওঁর দাবড়ানিতে ভয় খান, আর তিনি কিনা এই গোবেচারা জামাইয়ের কাছে কথা ভুলে যান? জেরা করে পেটের কথা আদায় করতে পারেন না?

বড় শ্যালক, তারাপ্রসন্নবাবুর বড় ছেলে, অফিস বেরোবার পথে একবার নিজের ক্যাপাসিটি পরীক্ষা করতে আসে।

'কি হে, খবর কি? তুমি নাকি রটাচ্ছো আজ চলে যাবে? না না, ওসব নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। মা তো ভেবে নিয়েছেন সত্যি। যাও যাও, রহস্য ফাঁস করে এসো।'

'ঠাট্টা নয় বড়দা, আর একদিনও থাকা অসম্ভব, অন্ততঃ আমার পক্ষে।'

'বাস্তবিকই যাবে?'

'তাই ঠিক করলাম।'

'কারণটা বলতে আপত্তি আছে কিছু?'

'বলবার মতন নয় বড়দা!'

'রাবিশ্!'···অস্ফুটে এইটুকু মন্তব্য করে বড় শালা আর একবার অন্তঃপুরে ফিরে যায়, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে ডাকে, 'বুড়ি, বুড়ি!'

'বুড়ি' হচ্ছে বাড়ীর সব চেয়ে ছোট মেয়েটি, যার সম্পর্কে জামাই 'জামাই'!

বুড়ি দাদার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'কি বলছো বড়দা?'

'বিমলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস কেন?'

বুড়ি আকাশ থেকে পড়ে। এ কী অন্যায় দোষারোপ বেচারার ওপর! প্রতিবাদ করতেও সাহস হয় না।

'বল্ কেন ঝগড়া করেছিস্ লক্ষ্মীছাড়ি? বাবার আদরে আদরে গোল্লায় গেছো একেবারে?'

'কই আবার ঝগড়া করলাম! বাঃ রে!'

'তবে ও চলে যেতে চায় কেন?'

'আমি কি জানি?'

বলে বুড়ি ছুটে পালায়।

বড়দারও দাঁড়াবার সময় ছিল না—অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। নইলে হেস্তনেস্ত দেখে ছাড়তেন। বুড়িটা যে একের নম্বরের শয়তান আর আহ্লাদী এ তো আর জানতে বাকী নেই বড়দার!

এরপর এলেন ঠাকুমা।

একগাল হেসে ঠ্যাঙ্ ছড়িয়ে বসে বললেন, 'নাতজামাইয়ের এত রাগ কেন গা?'

'কই ঠাকুমা, রাগ কে বললে?'

'আবার রাগ কা'রে বলে? রাগ কি আর গাছে ফলে? বলি ধুলোপায়ে

বিদায় চাইছো যে! রাগ নয় তো কি?'

জামাই মাথা নাড়ে।

'তবে কি রান্না পছন্দ হয় নি ভাই? বুড়ো হয়েছি, রান্না ভুলে গেছি। আজ নয় তোমার শাশুড়ী রাঁধবে।'

'কি যে বলেন ঠাকুমা, রান্না আবার পছন্দ অপছন্দ!'

'তবে?'

'সে বলবার মতো নয়।'

ঠাকুমা অনেক সাধ্য-সাধনা করতে থাকেন, কিন্তু বিমলের সেই এক কথা, 'সে বলবার মতো নয়।'

বড় শালী এসে ঠাট্টা জুড়ে দেয়, 'জামাইয়ের বোধ করি মাথার ভেতরকার দু'চারটে "স্ক্রু" আলগা আছে, তাই আচমকা কখন বিগড়ে বসে থাকে।···মধ্যমনারায়ণ তেল আর আইস-ব্যাগ আনা হোক, মাথা ঠাণ্ডা করে "স্ক্রু"র প্যাঁচ্‌গুলো বসুক ভালো করে।···খোকার বুঝি হঠাৎ মার জন্যে মন কেমন করে উঠেছে? বাড়ীতে কি ভুলে ঝুমঝুমিটা ফেলে এসেছ? বলো তো একটা আনিয়ে দিই।' ইত্যাদি।

জামাই নির্বিকার।

তা বলে যাওয়ার মতলব ছাড়ে নি। ইতিমধ্যে তার নিজস্ব সাবান, তোয়ালে, আর শেভিং সেট গুছিয়ে সুটকেসজাত করে ফেলেছে এবং ফাঁক পেলেই টাইমটেব্‌ল ওল্টাচ্ছে।

অবশেষে হতাশ হয়ে সবাই পাড়ার সিংহী খুড়োকে ডেকে আনলো।

সিংহী খুড়ো জবরদস্ত লোক। আগে দারোগা ছিলেন, এখন 'পেন্সিল নিয়ে' বসে আছেন। কিন্তু নিষ্কর্মা হ'য়ে নয়। সারা পাড়ার হিসেব-নিকেশ তাঁর নখদর্পণে। মাসভোর পাড়াসুদ্ধু ছেলেমেয়ের অপরাধের তালিকা তৈরি করে রাখেন, আর মাসান্তে নিজের বৈঠকখানায় 'কোর্ট' বসিয়ে বিচার করেন। রায়ও দেন সঙ্গে সঙ্গে। জেল-টেল তো নয়—শুধু জরিমানা।

'বলাই, তুই সেদিন ঘুঁষি লাগিয়ে জগদীশের দাঁত ভেঙেছিস্।···তোর আট আনা।···খেঁদি, তুই ছোট ভাইটাকে ঠেঙিয়েছিলি।···তোর দু আনা।···নেপী, তুই

রাস্তার ধারে 'ইয়ে' করিস্!···তোর চার পয়সা।···ন্যাড়া, তুই ভাইকে 'শালা' বলেছিলি।···তোর নগদ এক টাকা।'—সমস্ত জরিমানা আদায় হলেই সিংহী খুড়ো তোড়জোড় করে একদিন চড়ুইভাতি লাগিয়ে দেন।

উঠোনের মাঝখানে উনোন জ্বেলে, প্রকাণ্ড ডেকচি চাপিয়ে, নিজেই রান্না করেন, তোফা মাংসের ঝোল আর ভাত। তারপর সমস্ত ছেলেদের ডেকে এনে মনের সুখে হৈ-চৈ করে চড়ুইভাতিপর্ব সারা হয়। ছেলেরা জানে জরিমানার খাতায় নাম সই হলেই মাংসের ঝোল আসন্ন, তাই আপত্তি করে না।

এহেন সিংহী খুড়োকে ডেকে আনার কারণ অবশ্য ঠিক জরিমানা আদায়ের জন্যে নয়—জেরা করবার জন্যে। হাজার হোক, পুলিসের দারোগা! পেটের ভেতরকার বিশ বাঁও জলের তলার খবর টেনে বার করতে পারেন।

জামাই যায় যাক।

ওরকম একগুঁয়ে, জেদি, আর মুখ সেলাইকরা জামাই থেকেই বা কি চতুর্ভুজ করে দেবে?···কিন্তু কেন যাবে তার একটা কৈফিয়ত দিয়ে যাক্!···শুধু 'সে বলবার মতন নয়' বলে সরে পড়বেন, আর কলকাতায় গিয়ে আত্মীয়-বন্ধুমহলে যা ইচ্ছে তাই বলবেন, ওসব চলবে না।

সিংহী খুড়ো কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে এসেই খাতা খুলে নাম ডাকলেন, 'জামাই বিমল, বয়স চব্বিশ, বি-এ পাস, লম্বা একহারা গড়ন, ফর্সা রং'···কই হে বাপু?···এই যে ঠিক মিলে যাচ্ছে অবিকল।

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে, 'কি ব্যাপার? আমি কি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খুঁজে বার করছেন?'

'না, বিচার হবে।'

'বিচার? কিসের বিচার?'

'এক নম্বর, তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে পালাতে চাও। দু নম্বর, কারণ জানাতে চাও না।···জানো এ রীতিমত বেআইনী? যাবে যাও, বলে যাও।'

'সেটা আজ্ঞে বলবার···'

'মতন নয়? কেমন? শুনতে শুনতে কান পচে গেছে সবাইয়ের। বলবার

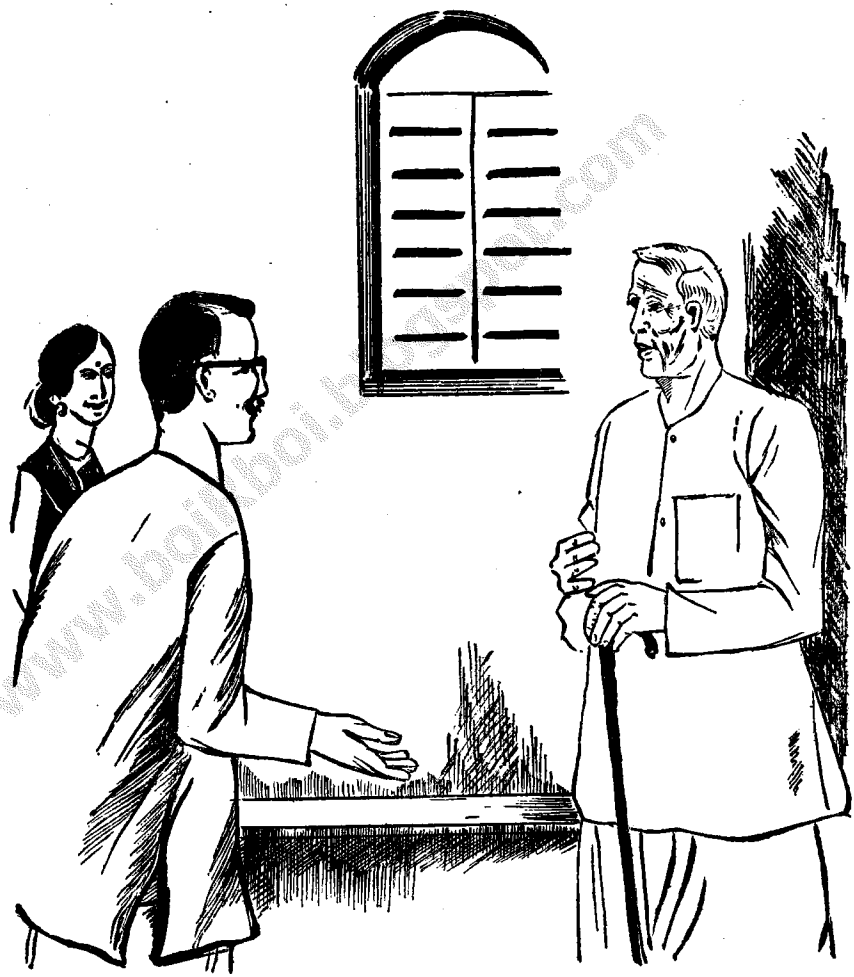

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে, 'কি ব্যাপার ? আমি কি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খুঁজে বার করছেন ?'

[পৃষ্ঠা—৮১

মতন না হলেও বলতে হবে, এই আইন। না হলেই ফাইন। বেশ লিখে নিচ্ছি ফাইন, পঁচিশ টাকা!

'সে কি? সে কি?'

জামাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শ্বশুরবাড়ী আসবার সময় কি আমার চেক-বই সঙ্গে এনেছি? এ কি চুরির দায়ে ধরা পড়া মশাই? ছেড়ে দিন, আমি দুপুরের গাড়ীতেই যাবো।'

'যাবো বললেই যাবে? দিচ্ছে কে যেতে? জরিমানার টাকাটা সদ্ব্যয় হোক আগে!···কি বলিস্ মান্‌কে? এবার ভাতের বদলে লুচি, কেমন?'

জামাই হতাশ হয়ে বলে, 'আপনাদের ভাত-লুচির রহস্য আমার বোঝা অসম্ভব। তবে জরিমানা? উঁহু, সে আশা ছাড়ুন।'

'তবে বলে ফেল ভায়া, খামোকা পাততাড়ি গুটোতে চাইছো কেন? ধরো এরপর যদি বাড়ী থেকে ঘড়িটা-আসটা আংটিটা বোতামটা হারিয়ে যায়, বদলোকে তোমাকেই সন্দেহ করতে পারে। পারে কিনা?'

জামাই অবাক হয়ে বলে, 'বলেন কি?'

'আবার কি? ওই তো আইনের মার-প্যাঁচ। আমার এ হাতে আইন, আর ও হাতে "ফাইন"।'

'আমারও এ হাতে কাঁচকলা, আর ও হাতে লবডঙ্কা, বুঝলেন?' বলে জামাই গরগর করে উঠে সুটকেসে তালা লাগিয়ে চুলে টেরি বাগাতে বসে।

সিংহী খুড়ো বিপুল ভুঁড়ির, মানে কোমর তো আর নেই, দু'পাশে দুই হাত রেখে দারোগাই চালে বলেন, 'তা'হলে কবুল করবে না তুমি?'

'ধেত্তারি নিকুচি করেছে, কবুল কবুল! বলেছিলাম, বলবার মত নয়—কিছুতেই হ'ল না। না শুনে আর ছাড়বেন না! তা সে, বলবার মত নয়, দেখবার মত। এই দেখুন!'

ব'লে জামাই হঠাৎ বীরবিক্রমে খাটের বিছানা তচ্‌নচ্ করে গদি উল্টে ফেলে বিরক্ত স্বরে বলে, 'এই দেখুন, দেখুন, শুতে পারে এতে জ্যান্ত মানুষে? দৈনিক আধ পোয়া করে রক্ত খরচ হলে কতটা জমাতে পারবো শ্বশুরবাড়ীর মাছের মুড়োয়?

"কবুল! কবুল!" হয়েছে? ছারপোকার ভয়ে দেশত্যাগী, শুনতে খারাপ বলেই বলতে চাই নি।···শ্বশুরবাড়ীর একটা বদনাম তো বটে!···আইন তো দেখাচ্ছেন আমিও ইচ্ছে করলে নালিশ করতে পারি, জানেন?'

'তোমার আবার কিসের নালিশ হে?'

'কেন? নিমন্ত্রণের ছলে জামাই বধের চেষ্টা! আটদিন থাকলে আর বেঁচে ফিরতাম বলে মনে করেন?'

হস্তীপ্রমাণ সিংহী খুড়ো গম্ভীরভাবে বলেন, 'তা যা বলেছ ভায়া, ঠিক বলেছ। বাঁচতাম না, আমিও বাঁচতাম না। তোমরা তো আমার কাছে মশা। ক'ছটাক রক্তই বা আছে তোমাদের গায়ে?'

সকল অনর্থের মূল সেই বিরাট রক্তবীজ-বাহিনী ততক্ষণে গদি থেকে খাটের খুরোয়, খাটের খুরো থেকে ঘরের মেজেয় এবং সেখান থেকে কোঁচার খুঁট বেয়ে উঠতে শুরু করেছে খুড়োর ঢাকাই ভুঁড়ির উদ্দেশে।···এখানে রসদ মিলবে সে কি আর ওরা বোঝে না?

'ছার' পোকা মাত্র হলেও, নেহাৎ বোকা পাত্র নয় ওরা!

জুতোর দৌলতে

রতনলালের টাকায় ছাতা ধরছে, লোহার সিন্দুকে মরচেই প'ড়ে গেল, তবু একটি আধলাও খরচ করতে নারাজ। টাকার কথা তুলেছ কি অমনি সে জোড়হাত। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় সারা ক্লাসে তার মতন দীন-দুঃখী বুঝি দ্বিতীয়টি নেই।

সে বলে, 'আমরা ভাই মুদি-মাকাল মানুষ, তোমাদের জুতোর সুখতলা। মেহেরবানি ক'রে রেখেছ, তাই দুটো খেয়ে প'রে টিঁকে আছি। তা-ই বা কদিন থাকতে পাচ্ছি বল? এ বাজারে ব্যবসা ক'রে আর বেশী দিন খেতে হবে না। কিসে যে তোমরা টাকা দেখ আমার—'

এরকম বেয়াড়া কথা শুনলে কার না রাগ হয়? বন্ধুবান্ধব চটছে দারুণ ওর ওপর। পরের বেলায় 'ওয়ান পাইস ফাদার মাদার', কিন্তু নিজের বিষয়ে রতনলাল আমাদের মুক্তহস্ত। আট আঙুলে আটটা হীরের আংটি পরে, বাহান্ন টাকা জোড়ার ধুতি আটপৌরে পরে, রাতদিন মোটরে চড়ে এবং আরও কত কিছু করে, যা তার পক্ষেই শোভা পায়, যার বাবা চিত্রগুপ্তের নোটিশ পাবার আগে ছেলের জন্যে একটি 'টাকার হিমালয়' গ'ড়ে রেখে যেতে পারেন। অবিশ্যি ওসব খরচে ওর 'দুধে হাত পড়ে না, জলের ওপর দিয়েই যায়'। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের যা সুদ আসে মাসে মাসে, তা' থেকে সংসার-খরচ চালিয়েও আবার কিছু আসলে জমা দেওয়া চলে। এ ছাড়া আছে চালের আড়ত, যার জন্যে রতনলাল নিজকে বিনয় ক'রে 'মুদি-মাকাল' বলে চালাতে চায়।

যদিও রতনলালের সেই 'হিমালয়'-সৃষ্টিকর্তা বাবা মগনলাল ঝুনঝুনওয়ালা মাথায় বাঁধতো আটচল্লিশ গজ মলমল থানের এ্যায়সান্ এক পাগড়ী, আর পায়ে পরতো নৌকোর মতন প্রকাণ্ড এক জরির নাগরা এবং কানে ঝোলাতো মুক্তোর মাকড়ী, আর কথা কইতো খাস মাড়বারের—রতনলাল কিন্তু সে সবের মধ্যে নেই। কথা কয় সে চোস্ত বাংলায় এবং সাজসজ্জায়ও সে মডার্ন বাঙালী। সামান্য একটু যা ধরা প'ড়ে যায় সে ওই আংটির বহরে। আট আঙুলে আটটা আংটি, বাঙালীর ছেলের? কই দেখি নি তো কখনও। পরবেই বা কোথা থেকে? পাবে কোথায়? চোখেই দেখে নি ওরকম একখানা হীরে।

যদিও ওরা সকলেই প্রায় বড়লোকের ছেলে—সিতেশ, সুকান্ত, অজিত, মণিময়, দেবব্রত—মোটর চ'ড়েও আসে, ভাল ভাল জুতো-জামাও পরে, তবু ওরা ডাল-ভাতের বড়লোক। ছাতুর বড়লোকের সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ!

অজিত বলে, 'হবে না টাকা? চোখের ওপর চামড়া না থাকলে টাকা জমানো খুব সহজ। আজ পর্যন্ত দেখলাম না এক পয়সা ছোলাভাজা কোনদিন কিনতে, অথচ পরের মাথায় হাত বুলিয়ে "খ্যাঁট্"টি বাগাতে পারলে ছাড়ে না!"

সুকান্ত বলে, 'ওর মাথায় হাত বুলিয়ে একদিন ভালমতন একটি "খ্যাঁট্" বাগাতে পারা যায় তবে বলি বাহাদুর!'

'সে আর পেরেছ!' দেবব্রত বলে, 'পকেট হাতড়ে একটা দু'আনি পেলাম

না কখনও যে দু'চারটে চিনেবাদাম খাওয়া যায়!'

'দূর, তার চেয়ে ধ'রেই পড়া যাক!' মণিময় বলে পেন্সিলের মাথাটা কামড়াতে কামড়াতে, 'উঠতে বসতে জ্বালাতন ক'রে মারলে শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারবে না।'

অজিত বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'হ্যাঃ, ওই করি আর কি, একদিন খেয়ে তো চতুর্ভুজ হব!'

মণিময়ের মত হচ্ছে, 'চতুর্ভুজ হওয়া ব'লে কিছু নয়, ওর থেকে কিছু খসানো নিয়ে কথা। দশটা টাকাও যদি খরচ করিয়ে দিতে পারি তো বুঝব। অন্ততঃ মুখের চেহারাখানাও দেখবার জিনিস হবে। দেখলি না সেদিন, পুওর ফাণ্ডের খাতায় সই ক'রে ফেলে কী আপসোস? বলে কিনা "আমরাই তো পুওর ম্যান বাবা, চাঁদা ক'রে দিক না কিছু।" তাও তো দিলে মোটে চার আনা!'

অতএব আর মতভেদ রাখা উচিত নয়, রতনলালের পিছনে লাগা সম্বন্ধে।···

ইতিমধ্যে একদিন মণিময় একটা মজার খবর এনে দিলো, রতনলালের নাকি (যেটা সে বরাবর চেপে এসেছে) বিয়ে-ফিয়ে হয়ে গেছে কোন্ কালে, এখন সম্প্রতি একটি খোকা হয়েছে। এর চেয়ে সুবর্ণসুযোগ আর কি হতে পারে?

তারপরই শুরু হ'ল।

'কি হে রতনলাল, একি শুনছি?'

'রতনলাল, এমন একটা দামী খবর এতদিন চেপে এসেছ ভাই?'

'রতনলাল, তোমাদের সমাজটি ভাই খাসা, বাল্যকালেই একটা হিল্লে হয়ে যায়। আর আমাদের? হুঁঃ, তিনটি দাদা এখনও পথ আগলে ব'সে! লাইন ক্লিয়ার হ'তে চুল পেকে যাবে।'

'রতনলালের কপালটা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস। এই বয়সে, গ্রাজুয়েট হবার আগেই, পিতৃদেব হয়ে বসল, সোজা সম্মান?'

'রতনলাল, আর ছাড়ছি না ভাই! এবার একদিন খাওয়াতেই হবে।'

প্রফেসর এন. দত্ত ভালমানুষ লোক, তাঁর পিরিয়ডে ছাত্রদের প্রায় এই ধরনের পড়াশুনাই চলে।···

রতনলাল আমাদের, বলেছিই তো, সব সময় বিনয়ের অবতার। হাত দুখানি

জোড় করতে এক সেকেণ্ডও সময় লাগে না তার। সে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'কি বল ভাই, তোমরা সব আমীর-ওমরা লোক, এই গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেবে, এও কি সম্ভব? রাম রাম! বসবে কোথায়? খাবেই বা কি? আমাকেই বরং পালা ক'রে দু'চার দিন খাইয়ে দে' তোরা। দেখছিসই তো কত খরচ বাড়ল আমার, খাওয়ার মুখ একটা বেড়ে গেল সংসারে!'

যেন এখুনি ওর সবে জন্মানো ছেলে ঘি, রুটি, লাড্ডু, মিঠাই খেতে শুরু করেছে!

সে যাক, রতনলালের বিনয়ে আর কেউ গলে না। সাব্যস্ত হ'ল, রতনলাল একদিন ওদের পাঁচজনকে সিনেমায় নিয়ে যাবে নিজের খরচায়, আর খাওয়াবে পরিতোষ ক'রে। নাছোড়বান্দা বন্ধুদের জ্বালাতনে অস্থির রতনলাল অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল।

শুধু মিনতি ক'রে সে বললো, 'আমরা ভাই মেড়ো মানুষ, মাছ-মাংস আশা ক'রো না, তবে পেটটা ভরিয়ে দেব। তোমাদের কে. সি. দাস আর দ্বারিক ঘোষ আছেন, আর ঘরের লাড্ডু মিঠাই আছে।'

'তাই সই! সাথে সিনেমাটা রয়েছে যখন।' ব'লে বন্ধুরা রাজী হয়।

শনিবার কলেজ-ফেরত 'প্যারাডাইসে' গিয়ে হাজির হ'ল সবাই। যদিও 'বন্ধন' ওরা সকলেই দেখেছে দু-একবার। না দেখবেই বা কেন? তবু দুবারের ওপর তিনবার দেখলেই বা ক্ষতি কি, পরের পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে যখন? ভালো বই পাঁচবার দেখতেই বা কি দোষ?

'অমনি এক গ্লাস ক'রে আইসক্রীম, বুঝলে রতনলাল!' বলে সুকান্ত, 'প্রোগ্রাম-বুকটা না হয় আমিই কিনব, নিজের পয়সায়। অতটা, সবটা আর চাপাতে চাই না তোমার ঘাড়ে।'

'কিনবে' মানে বাড়ী থেকে নিয়েই এসেছে একখানা, ছোট বোনের নিজস্ব সংগ্রহের ভাঁড়ার ওলোট-পালট ক'রে।

অজিত মন্তব্য করে, 'নেহাৎ যেন থার্ড ক্লাস কিনে ব'সো না রতন, হাজার হোক, তোমার নিজেরও তো একটা মান-মর্যাদা আছে!'

'রাম রাম! আর লজ্জা দিও না ভাই, রতনলাল যখন সাথে ক'রে এনেছে তোমা সকলকে, ইজ্জতমাফিক কাজই করবে।' বললো রতনলাল, 'থার্ড ক্লাস টিকিট কিনব? সরম নেই আমার?'

একেবারে ফার্স্ট ক্লাস টিকিটই কিনবে সে, ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে।

মবলগ টাকা সে খরচ করবে আজ। বন্ধুদের টিট্‌কিরি আর সইবে না।···কিন্তু একি কাণ্ড! টাকার জন্যে পকেটে হাত দিতেই হাতটা সোজা নেমে আসছে কেন? গোলগাল কচুরী-প্যাটার্নের হাতখানি রতনের! সাধারণ নিয়মে পকেটে হাত ঢোকালে, আটকেই যায়। নামতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হাতটাকে থামতেই হয় শেষ পর্যন্ত। পকেট ভেদ ক'রে অবাধে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় কি ক'রে? রসগোল্লার মতন মুখখানি চট্ ক'রে বাসি-জিলেপীর মতই বা হয়ে পড়ে কেন? কি ব্যাপার!

ব্যাপার আর কিছুই নয়—'পকেটমার'! ব্ল্যাকআউটের বাজারে সিনেমা-থিয়েটারের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই ভূতনামানো গোছের 'আধো-আলো আধো-ছায়ায়' ভিড়ের মধ্যে পকেট তো কাটবেই লোকে। পেশাদারী পকেট-কাটিয়ে যারা, দস্তুরমত পকেট-কাটনেওয়ালা—তারা ত কাটছেই, কেটে আসছে চিরকাল, কাটবেও। ভদ্দর লোকেই সুযোগ পেয়ে এই ব্ল্যাক্‌আউটের সুযোগে কি করছে না করছে কে বলতে পারে?

কিন্তু যে-ই কাটুক, চমৎকার সাফাই হাতখানা তার। এমন ফাইন ক'রে—সুদ্ধু পকেটের তলাটুকুন্ কেটেছে, মনে হচ্ছে সরু কাঁচি দিয়ে সেলাই ক'টাই বুঝি কে কেটেছে ব'সে ব'সে।···মরুক গে, চুলোয় যাক্। মোটকথা হচ্ছে এই, পকেটমারা গেলে টিকিট কেনা চলে না। অগত্যা ফিরেই যেতে হবে, আর উপায় কি?

কিন্তু ছিঃ ছিঃ, তাও কখনও হয়? রতনলালের 'সরম' আছে, আর এদের নেই? পাশের লোকগুলো বলবে কি? রতনলালের পাশে দাঁড়ানো ওই দন্তবাগীশ টিকিওয়ালাটা যে হাসবে দাঁত বা'র ক'রে! ভাববে—'বাবুদের পকেটে নেই এক আনা পয়সা, প্রাণে আছে ষোল আনা শখ!'

'নাঃ, কখনই না, যাক্ প্রাণ থাক্ মান।' প্রত্যেকেই নিজের নিজের পকেট

হাতড়াতে শুরু করে। কিন্তু রতনলাল দিতে দিলে তো? "হাঁ হাঁ" ক'রে উঠে বলে, 'দোহাই ভাই, তোমরা একটি পয়সাও বা'র ক'রো না। সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কি করব, আজ দেখছি নসীবটাই খারাপ।' ব'লেই রতনলাল হাত থেকে একটা হীরের আংটি খুলতে উদ্যত হ'ল।

সবাই অবাক হ'য়ে গেছে, বলে, 'ওকি হচ্ছে?'

'এই এটা বন্ধক রেখে এখন ত দেখে নিই, তারপর বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে দিলেই চলবে। সোফারটাকে ছেড়ে দিয়েই মুশকিল হয়েছে—'

যদিও রতনলাল সোজা হিসেব দেখালো, কিন্তু এরা বাপু ওতে রাজী নয়। হীরের আংটি বাঁধা দিয়ে বায়োস্কোপ দেখা? সভ্যতা ব'লে একটা জিনিস তো আছে—নাকি নেই? শুনলে যে গায়ে ধুলো দেবে লোকে!

কাজে-কাজেই সবাই রতনলালের হাত চেপে ধ'রে বললো, 'ক্ষেপেছ? কি ভাববে ঐ দন্তবাগীশ লোকটা? আমরা তো এখুনি যাচ্ছি তোমার বাড়ী। ধার শোধ ক'রো তখন। দুঃখের বিষয় বহুত লোকসান গেল তোমার। কত ছিল পকেটে?'

'কে জানে কে খেয়াল রেখেছে! বড় নোট তো ছিল খানতিনেক, রেজকি পাঁচ-সাত টাকার থাকতে পারে। যেতে দাও, বেটা পকেটমার একটু স্ফূর্তি ক'রে বাঁচুক।'

অজিত মনে মনে ভাবে···ইস্, ভারী যে লম্বা-চৌড়া কথা দেখছি আজ!

যা হোক, পাঁচ বন্ধুর পকেট ঝেড়ে বেরোল কিছু টাকা—মানে কেউ তো আর হ্যাংলাঘরের ছেলে নয়! রতনলালও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজের নোটবুকে টুকে নিলে কার কাছে কত ধার নেওয়া হ'ল।

বায়োস্কোপ দেখাটা ভালই হ'ল। আইসক্রীমও বাদ গেল না, রতনলালই খাওয়ালো (আপাততঃ ধার নিয়েই খাওয়ালো)। আর পরের পয়সায় পেলে কে না দু'চার গ্লাস খায়, দেনেওয়ালার ঢালা হুকুম পাওয়া গেছে যখন!

বায়োস্কোপ ভাঙলে সোজা রতনলালের বাড়ী। রতনলালের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলেও আগে কেউ কখনও ভেতরে ঢোকে নি। সাজসজ্জায় 'মাড়বার মাড়বার' গন্ধ একটু পাওয়া গেলেও বাড়ীটা বড়লোকের বাড়ী ব'লে বোঝা যায়। বড় দালান, হলঘর, চারদিকে গাদা গাদা ছোট ছোট ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি। আর দেয়ালে রয়েছে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং—বোধ করি রতনের পূর্বপুরুষবর্গের, কারণ তাঁদের পাগড়ী আর ভুঁড়ি দেখলে 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'র কথা মনে প'ড়ে যায়।

ঘরের মেঝেয় কার্পেট পাতা। এরা মনে মনে ভাবলো, ভাগ্যিস্ বাবা সব চেয়ে দামী ভাল জুতোগুলো প'রে এসেছি! এই কার্পেটের ওপর বাজে জুতো প'রে বেড়ালে মান থাকত না। বাড়ী-ঘর দেখা হ'লে খাবারঘরে ডাক পড়ল। রতনলালেরা পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু, জুতো প'রে খাবারঘরে ঢোকাই চলে না। তাই বাইরের দালানে জুতো খুলে রেখে আসতে হয়। উচিতও সেটা, কারণ সারা ঘরের মেঝেয় জাজিম বিছানো। প্রত্যেকের জন্য একটা ক'রে মোটা মোটা তাকিয়া, আর তার সামনে একটা ক'রে রূপোর রেকাবিতে গুটিকতক ক'রে ছোট এলাচ এবং একটা ক'রে আতরদানি।

গায়ে খানিকটা ক'রে আতর মেখে গোটা দু'চার এলাচ চিবিয়ে হাসি-গল্পে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে, অবশেষে সিতেশ অধীর হয়ে ব'লে ওঠে, 'কই হে রতনলাল, এই এলাচদানা চিবিয়েই থাকতে হবে নাকি? পেট যে চুঁই-চুঁই করছে, এখানেও কি পকেট মারল বাবা?'

'তাই তো হে রতন, ভাবিয়ে তুললে তুমি।' সুকান্ত বলে, 'ব্যাপার কি? খাওয়াবে ত শুনলাম দ্বারিক ঘোষ, আর কে. সি. দাস, এত বিলম্বের হেতু কি? গিন্নি রাঁধলেও বুঝতাম দেরির মানে আছে।'

মণিময় বলে, 'সত্যি রাতও যথেষ্ট হ'ল, কি খাওয়াবে বা'র কর বাবা, আর যার যা ধার আছে শোধ ক'রে ফেলে বিদায় দাও।'

ধারের কথাটা মণিময় ইচ্ছে ক'রেই তোলে, কি জানি গোলমালে যদি ভুলেই যায় রতন!

রতনলালের হাত জোড় করতে দেরি হয় না, সে কথা তো জানই। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা তুলে গলায় দিয়ে, হাত জোড় ক'রে মিনতির সুরে সে বলে, 'মেহের-বানি ক'রে গরীবকে মাপ করতে হবে ভাই, একটু দেরি হয়ে গেল। মনে কিছু ক'রো না। আর মনে করবার আছে কি? সবই তো তোমাদের জুতোর দৌলতে, আমি

তো নিমিত্ত মাত্র।'

বাক্‌চাতুরীতে আবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকতে হয়। না থেকে উপায় কি, ভদ্রতা ব'লে জিনিস আছে তো?

নাঃ, ভারী ভুল করছিল তারা সত্যি, রতনলালের প্রতি অবিচার করছিল। এমনিতে এক পয়সার ছোলাভাজায় নারাজ হোক, বাড়ীতে ডেকে এনে খেতে দেবে না, এও কি হয়? ওই তো, দুটো চাকর বড় রূপোর থালায় ক'রে খাবার এনে হাজির করছে! এক-দুই-তিন···ছখানা থালা!

রূপোর গ্লাসে শরবত, রূপোর ডিবেয় পান। পেল্লায় আয়োজন! সন্দেশ, রাজভোগ, ছানার মালপো, শোন্‌পাপড়ি, মোহনপুরী, রসোমালাই, মনোহরা, সরের-লাড়ু, পক্কান্ন, দইবড়া, সিঙাড়া, কচুরী, ডালপুরী, ডালমুট, ঝুরিভাজা, সেঁউভাজা ইত্যাদি 'মেড়োবাঙালী' সংমিশ্রিত নানাবিধ সুখাদ্য, তার ওপর আবার দই, রাবড়ী আর আনারস!

আঃ, একে পেটের ভেতর অগ্নিদাহন অবস্থা, তার মুখে এই! যাকে বলে আগুনে জল পড়ল। এর পরে আর রতনলালকে কে কিপ্‌টে বলবে? খেতে খেতে মাঝে মাঝে রব উঠতে শুরু হ'ল, 'জয় রতনলালকী জয়! জয় রতনলালের নিউ এডিসনের জয়!'

'নিউ এডিসন' মানে ওর নতুন খোকাটি আর কি! দেবব্রত একমুঠো ডালমুট মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বললে, 'বাচ্চাটিকে একবার দেখালে না রতনলাল? ওরই 'অনারে' ভোজটা হচ্ছে যখন!'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!···এই শিউশরণ, বাচ্চালোগ্‌কো হিঁয়া পর লে আও।'

'বাচ্চালোগ' তো একটি তুলোর পুঁটুলি বিশেষ। শিউশরণ তাকে নিয়ে আসতেই অজিত কথা তুললো, 'আমরা হ'লাম সব পিতৃবন্ধু, একরকম পিতৃব্য তো বটেই, বিনামূল্যে ছেলের মুখ দেখা ঠিক হবে?'

মণিময় দুটো পকেটেই হাত দিয়ে উল্টে বা'র ক'রে বলে, 'কি আর দেব বাবা, পকেট তো গড়ের মাঠ!'

ব্যস্ত রতনলাল তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'আরে ভাই, তার জন্যে কি, সে দেওয়াই হয়ে গেছে ধ'রে নাও।'

কাজে-কাজেই 'ধ'রে নিয়ে' ছেলেটাকে নিয়ে দু-চারজন নাড়াচাড়া করল। নেহাৎ শিশু, নিয়ে তো আর লোফালুফি চলে না!

এইবার ওঠার পালা, বেজায় খেয়েছে কিনা সবাই, নড়তে পারে না এমন অবস্থা। অনেক কষ্টে উঠে বলে, 'রতনলাল, দেদার খাইয়েছ ভাই, খাবার-টাবার-গুলোও ফার্স্ট ক্লাস! না, বাস্তবিক রতনলালের বদনামটা এবার ঘুচল!'

রতনলালের সেই পেটেন্ট বিনীত হাসি, আর জোড়হাত। হেঁ হেঁ ক'রে বলে, 'আমি আর কি করলাম ভাই, কিছুই নয়। আমার কোন কেরামতি নেই, সবই তোমাদের জুতোর দৌলতে। মেহেরবানি ক'রে কসুর মাফ ক'রো।'

'বিলক্ষণ! কসুর কিসের? বিনয়ের অবতার একেবারে!···কই হে আর নয়, ওঠ এবার। যাওয়া যাক, যথেষ্ট রাত হ'ল। কি রে সিতেশ, আরও খাবি নাকি?'

'না বাবা, আর খেলে ভুঁড়ি সেলাই করতে ডাক্তার ডাকতে হবে।'

'নাঃ, 'দেবা'টাকে নিয়ে পারা গেল না আর, এখনও ব'সে ব'সে ডাল-মুটের নুন-লঙ্কা চাটছে!'

'আরে মিষ্টি-ফিষ্টি বেজায় খাওয়া হয়ে গেছে, মুখটা কি রকম যেন করছে।'

মণিময়টাই একটু ঠোঁটকাটা কিনা, রুমালে মুখ মুছতে মুছতে গম্ভীরভাবে বলে, 'কিন্তু রতনলাল, মিষ্টি খাইয়ে যেন ধারের কথাটা ভুলে যেও না।'

ওর পকেটে কিছু 'অধিক মাল' ছিল কিনা, তাই ওরই গা করকর করছে বেশী।

রতনলাল তার নিজস্ব হাসি ছাড়ে না, 'আরে যেতে দাও না ভাই। সামান্য কথা, ছোট কথা, সে তো আমার হিসেবের খাতায় উঠেই গেছে। এই যে—, ব'লে নোটবুকটা খুলে ধরে রতনলাল।

পরিষ্কার বাংলায় লেখা হিসেব। 'বাচ্চাবাবুকো নজরানা' অর্থাৎ খোকার মুখদেখানি, আর কি!

সিতেশ চোধুরী : দু'টাকা ছয় পয়সা।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই একটু আগে এত খেয়েছে।

[পৃষ্ঠা—৯১

অজিত দত্ত ঃ এক টাকা বারো আনা।

সুকান্ত হালদার ঃ তিন টাকা।

দেবব্রত ঘোষ ঃ চার টাকা সাড়ে পাঁচ আনা।

মণিময় খাস্তগীর ঃ ন' টাকা তিন পয়সা।···

বায়োস্কোপে যার পকেটে যা ছিল তারই হিসেব।

সোজা হিসেব। তা ছাড়া 'সামান্য কথা' মনে রাখবার মত কথাই নয়।

পঞ্চরত্ন প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই একটু আগে এত খেয়েছে। 'আমসি'র সঙ্গে তুলনীয় মুখ পাঁচখানি।

উঃ, ধড়িবাজ রতনলাল এমন বাবদ হিসেবটা ফেলেছে যে, কারুর আর আপত্তি করবার পথ নেই। ওই জন্যেই ছেলে দেখাবার সময় বলছিল 'ধ'রে নাও দেওয়াই হয়ে গেছে'! ওর ওই খ্যাঁদামুখো ছেলের মুখ দেখে মুঠো মুঠো টাকা দিতে কার দায় পড়েছিল? সাংঘাতিক ফিচেল! বায়োস্কোপ-হলেই লিখে রেখেছে দেখা যাচ্ছে।

কি আর করা যায়? মনের রাগ মনে চেপে দেঁতো হাসি হেসে বলতে হয়, 'তা বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা! কিন্তু রতনলাল, পকেট-কাটাটা তা হ'লে—'

'আরে যেতে দাও না ভাই, সামান্য কথা, ছোট কথা। পাতলা কাঁচি হাতে পেলে পকেটের সেলাই ক'টা কাটতে কতক্ষণ? আধ মিনিটের কাজ!'

অর্থাৎ তা হ'লে রতনলাল নিজেই, বাড়ী থেকে বেরোবার আগে, ওই আধ মিনিটের কাজটুকু সেরে বেরিয়েছিল!

আর কোন্ ভদ্রলোক সেখানে আধ মিনিটও দাঁড়াতে সাহস করে? কে জানে ফস্ ক'রে মুখ থেকে একটা রাগের কথাই বেরিয়ে পড়ে যদি? সামান্যর জন্যে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে? কোন রকমে মুখের হাসি বজায় রেখে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। এ্যাঃ, শেষে কিনা ব্যাটা মেড়ো—তাদের মতন ওস্তাদ ওস্তাদ 'কলকাত্তাই' ছেলেদের আহাম্মুক বানিয়ে ছাড়ল?

'কৈ হে শিউশরণ! আমাদের জুতোগুলো কোন্ দিকে ফেললে? তোমার মনিব-বাড়ী ব'সে থাকলে তো আমাদের চলবে না বাবাজী, নিজেদের আস্তানায় ফিরতে হবে তো!···এই তো এইখানে কার্পেটের ওপর ছাড়া ছিল—বেশ ছিল, তাকে আবার

যত্ন ক'রে "আয়রন চেস্টে" তুলতে গেলে নাকি ?" বললো মণিময়।

নীরেটমুখ্যু শিউশরণ এসে এক লম্বা সেলাম ঠুকে ভারী গলায় বললো, 'জী হুজুর! লোট্টু চামার তো "জুত্তি উত্তি" লে গই।'

আবার একবার মুখ চাওয়াচায়ির পালা।...

'সোজা বাংলায় খুলে বল না হে বাপু ব্যাপারটা। "লে গই" আবার কি! বড় যে গোলমেলে লাগছে।' বললে দেবব্রত।

'সোজা বাংলায় কথা বলা' শিউশরণের চতুর্দশ পুরুষেরও সাধ্য নেই। তবে অতঃপর সে যা বললে সেটা সোজা বাংলায় এই দাঁড়ায়, 'পূর্ব বন্দোবস্ত মত 'লোট্টু' নামক জনৈক মুচি বাবুদের জুতো পাঁচ জোড়া দশ টাকা হিসাবে পঞ্চাশ টাকা নগদ দামে খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং শিউশরণ উক্ত টাকায় মনিবের পূর্বপ্রদত্ত ফর্দ মাফিক 'মিঠাই পিঠা' আনিয়া, রূপার থালায় সাজাইয়া...ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, আগাগোড়া ব্যাপারটা আগে থেকেই সাজানো ছিল, মায় লোট্টু মুচির আসার টাইম পর্যন্ত। রতনলাল বন্ধুদের জুতোর বদলে খাইয়েছে, অর্থাৎ...কিন্তু থাক্, বাকীটা না বলাই ভাল, স্পষ্ট ক'রে বলে আর কাজ নেই। হাজার হোক, এদের একটা প্রেস্টিজ ব'লে জিনিস আছে তো ?

নতুন আর দামী দামী জুতো সব, এক-এক জোড়া বিশ-বাইশ টাকার কম নয়।

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে আর ক্রুদ্ধ হাসি হেসে পাঁচজনে সমস্বরে ব'লে উঠল, 'বাঃ রতনলাল, বেশ! তোফা! চমৎকার! মার্ভেলাস! ওয়াণ্ডারফুল!'

রতনলাল তাদের পেছনে পেছনে আসছিল। অতি বিনীত হাসি হেসে হাত দুটি জোড় ক'রে অমায়িক স্বরে বললো সে, 'আগেই তো ব'লে রেখেছি ভাই, আমার কেরামতি কিছুই নেই, সবই তোমাদের জুতোর দৌলতে।'

'কি কিপ্‌টে হয়ে যাচ্ছিস রে ছোড়দা দিন দিন !'

[পৃষ্ঠা—৯৩

পাকচক্র

পুতুল আব্দার ধরেছে সিনেমা না দেখে ছাড়বে না আজ!

হঠাৎ একদিনের জন্যে কি নাকি অদ্ভুত ভালো একটা বই এসেছে। বলে, 'কি কিপ্‌টে হয়ে যাচ্ছিস রে ছোড়দা দিন দিন! যুদ্ধের বাজারে খুব পয়সা জমাচ্ছিস! এতদিন পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে এলাম, একদিন সিনেমা দেখালি না।'

কপিল অবহেলাভরে উত্তর দিলো, 'আরে ধেৎতেরি সিনেমা, যে ছিঁচ্‌কাদুনে ছেলে হয়েছে তোর!'

'বারে, ছেলে কাঁদুনে বলে একদিন বুঝি বেড়াব না?'

ছেলের মাও প্রায় ছেলের মতন হয়ে দাঁড়ায়, 'এলাম দুদিন আমোদ করতে…'

'বেশ তো চল্ না, আজই চল্ না, কত দেখতে চাস? "চিত্রা", "রূপবাণী", "উত্তরা", "শ্রী", নটায় ছটায় তিনটায়, যা খুশী যখন খুশী, কিন্তু ছেলে সামলাবে কে? তিনি যে হঠাৎ মাঝখানে ভেঁপু বাঁশী বাজাতে শুরু করবেন, আর ঘরসুদ্ধ লোক চেঁচাবে, "ছেলে চুপ করান" সে সবের মধ্যে আমি নেই।"

'তাই না আরো কিছু', পুতুল রীতিমত চটে ওঠে, 'নিয়ে যাবে না হাতি করবে! একদিন বুঝি বৌদিরা সামলাতে পারে না?'

'নো, নট্, না। তোমার যা ধূম্রলোচন ছেলে, থাকলে তো কারুর কাছে?'

'মিশ্রী খাওয়ালেই থাকে!' মুখ ভারী করে উত্তর দেয় পুতুল।

'অলরাইট। তুই তৈরি হয়ে নে, আমি সেরখানেক মিশ্রী এনে দিচ্ছি।'

'সের খা-নে-ক?'

'তাতে কি? ঘণ্টা তিন-চারে সেরে ফেলবে অখন।'

মিশ্রী নিয়ে এসে দাঁড়াতেই পুতুল চুপি চুপি বললো, 'শোন্ ছোড়দা, একটা ফন্দী করেছি, তুই বল্‌গে, "পুতুলের মামাশ্বশুরের সঙ্গে পথে দেখা, ওর দিদিশাশুড়ী মর-মর, পুতুলকে শেষ দেখা দেখতে চান"। তারপর নিয়ে যাবি আমাকে শ্বশুরবাড়ী, অর্থাৎ

সিনেমা হাউসে।'

'সে কি রে, জলজ্যান্ত বুড়ীটাকে ফট করে মরিয়ে দিবি?'

'জলজ্যান্ত না কচু, মর-মর অবস্থায় বছর তিনেক কাটাচ্ছে। বিরেনব্বই বছর বয়স, ভীমরতি ধরা বুড়ী।'

'তা যাক্, কিন্তু হঠাৎ এ ফন্দীটা মাথায় এল যে?'

'আরে বুঝছিস না? "সিনেমা দেখতে যাচ্ছি" বললে ছেলেটাকে নিয়ে যেতে বলবে। এইমাত্তর ঠাকুর ছুটি নিয়ে গেল অসুখ করেছে বলে, বৌদিদের মুখ হাঁড়ি!'

'তবেই সেরেছে! চল্ তোর কি ফন্দী-ফিকির আছে দেখি।'

বড় বৌদি শুনেই হাঁড়ি মুখ চুন করে বললেন, 'আহা শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন, যাবে বৈকি, কিন্তু আমি যে এখুনি বাপের বাড়ী যাচ্ছি। ছোট বোনটাকে ক'নে দেখতে আসবে, সাজিয়ে দেবার লোক নেই।'

'তোমার সেই ছোট বোন তো? সে নিজেই খুব সাজতে পারে, এক টিন পাউডারই মেখে নেবে হয় তো!' কপিল মন্তব্য করে।

'তা বললে তো হয় না, দেখতে এলেই সাজিয়ে দিতে হয়। মেজ বৌর কাছে রেখে যাও না।'

গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন বড় বৌদি।

মেজ বৌদি দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ভবানীপুর যাচ্ছ? খোকাকে রেখে? দিদি চলে যাচ্ছেন? বল কি? সর্বনাশ! আমিও যে বেরোচ্ছি গো! এইমাত্র চিঠি এলো, বন্ধুর ছেলের জন্মতিথি, না গেলে ভীষণ দুঃখিত হবে, উনি গেছেন উপহারের জিনিস কিনতে।···তা যাক্, সেজবৌ দেখবে অখন, তুমি যাও।'

সেজ বৌদি গালে হাত দিয়ে চমকে উঠলো, 'বলিস কি? বেরিয়ে যাচ্ছিস? দিদিও? মেজদিও? আর এই ঠাকুরের অসুখ! আমার যে বিষ খেতে ইচ্ছে করছে গো!'

'এনে দেব নাকি বৌদি?' প্রশ্ন করে কপিল নিরীহ ভাবে। 'কোন্‌টা পছন্দ করো তুমি? আপিং? সেঁকো বিষ? নাইট্রিক এসিড? পটাসিয়াম সায়ানাইড?'

'যাও, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। জানি না বাবা, আমিও থাকছি না।

আমার পিস্‌তুতো ভাইয়ের শ্বশুর মোটর অ্যাকসিডেন্টে পা ভেঙ্গে বিছানা নিয়েছেন, দেখতে যাওয়া দরকার তো ?'

যাক্, বড় বৌদি, মেজ বৌদি, সেজ বৌদির ভরসা গেল। অটোমেটিক্যালি দাদাদেরও। দেবীপ্রতিমাদের বাহন চাইতো এক-একটি।

'এখন ভরসা জ্যেঠামশাইয়ের।' কপিল বললো।

'জ্যেঠামশাই ? সে কি রে ছোড়দা ?'

'দেখ্ না বলে, বসেই তো আছেন।···আমি যে টিকিট কিনে আনলাম ছাই।'

'কই ? কখন ?'

'এই যে মিশ্রী আনতে গিয়ে। এখানের দোকানে পেলাম না, গেলাম হাতি-বাগানে, ভাবলাম টিকিট দুটোও নিয়ে নিই।'

প্রস্তাব শুনে জ্যেঠামশাই শুধু অজ্ঞান হতে বাকী থাকলেন।

'তোমার ঐ ছেলে সামলাবো আমি ? ওই হিটলারী ছেলে ? তার চেয়ে আমায় বেঁধে মার না বাবা! নয় সোজাসুজি বধ করো!'

'কিন্তু জ্যেঠামশাই, বেচারা পুতুলের দিদিশ্বশুর যে মরো মরো।'

পুতুল অলক্ষ্যে চোখ টিপে চুপি চুপি বললো, 'দিদিশ্বশুর কি রে মুখ্যু ? দিদি-শাশুড়ী।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আহা বুড়ো মানুষ শেষদেখা দেখতে চাইছে, এ সময় দুরন্ত ছেলে নিয়ে যাওয়া কি উচিত ?' করুণ ভাবে প্রশ্ন করে কপিল।

'আরে ও ছেলেকে রেখে ভবানীপুরে গেলে এদিকে আমার সঙ্গে "শেষ দেখাটা"ও যে হবে না। আমার হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করে দেবে তোমার ছেলে।'

'মিশ্রী খেলে চুপ করে থাকবে জ্যেঠামশাই!' পুতুল আবেদন জানায়।

'মিশ্রী খেলে ? হিমালয়ের চূড়ো খেলেও চুপ করে থাকবে না। মিশ্রীটা বরং আমায় দিয়ো, ভিজিয়ে খাবো।···তা ছাড়া আমাদের হরিসভায় আজ গোবিন্দবল্লভ গোস্বামীর পাঠ, সে না শুনলে জীবনই মিথ্যে।'

আর বেশী কথা না বাড়িয়ে জ্যেঠামশাই এণ্ডির চাদরখানা গায়ে দিয়ে 'জীবন সত্য' করতে বেরিয়ে গেলেন।

'দূর ছাই, যেতে চাইনে।' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে পুতুল।

কপিল সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আরে আরে কাঁদিসনে, নিয়ে যাবোই, পয়সা দিয়ে টিকিট কিনলাম, ফেলে দেবো নাকি? আচ্ছা হীরেলালের কাছে রেখে গেলেই তো হয়।'

'হীরেলালের কত কাজ!'

'আহা একদিন না হয় পরেই করবে কাজ।'

ডাক শুনে হীরেলাল এলো। গোল-গাল গড়ন, নেড়া মাথায় প্রকাণ্ড টিকির গোছা। খোকার চেয়ে খুব বেশী বিজ্ঞ নয়, তাকেও সামলাতে হয় মাঝে মাঝে।

কপিল গম্ভীরভাবে বললো, 'আরে ছিঃ, এত ছেঁড়া গেঞ্জি পরেছিস হীরেলাল?'

যদিও উদয়াস্ত সেই গেঞ্জিটিই হীরেলালের অঙ্গের ভূষণ, এইমাত্র নজরে পড়লো কপিলের তা নয়, তবু হীরেলাল নিঃসন্দিগ্ধভাবে উত্তর দিলো, 'হাঁ ওতো ছিঁড়া আছে।'

'আমার থেকে একটা নিবি?'

হীরেলাল আকর্ণ বিস্তৃত হাঁ করে বললো, 'জী হাঁ।'

'আচ্ছা তুই খোকাবাবুকে একটু ঠাণ্ডা করে রাখ, আমি আসছি, দিচ্ছি গেঞ্জি। আর দেখ, এই মিশ্রী থাকলো, কান্নাকাটি লাগালে দিবি, বেশী থাকে তুই খেয়ে ফেলিস।'

'শেষেরটাই আগে করবে!' বলে পুতুল পালিয়ে গেল কাপড় বদলাতে।

... ...

ছবি শেষ হ'ল। 'দি এণ্ড' দেখে উঠে দাঁড়াতেই পুতুল বললো, 'আমাদের ঠাকুরের মতন একটা লোক বসে আছে সামনে, ওই যে—'

'আরে, ঠাকুরই তো! দেখেছ, অসুখ বলে ছুটি নিয়ে সিনেমা দেখছে! রোস্ ধরি বেটাকে।'

'বিফল প্রাচীরের' পাশে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো কপিল আর পুতুল। ভীষণ অন্ধকার, কেউ চিনতে পারবে না সহজে।

ঠাকুরের সঙ্গে আর একটি উড়িয়া কুলতিলক!

'হঃ, জড় হউচি না ঘোড়ার ডিম হউচি, মু বাইসকোপ দেখিবুনি? চব্বিশ ঘন্টা কাজ অ কাজ অ!'

কপিল কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলে উঠলো, 'আরে এ যে দাদা বৌদি! পুতুল দেখ্, বৌদির বোনকে ক'নে দেখতে এসেছে নাকি!'

বৌদি চলেছেন গল্প করতে করতে, 'যাই ভ্যাগ্যিস মাথায় এসে গেল কথাটা! সিনেমার কথা বললে আস্ত রাখত না আমায়। বড় হওয়ার কি কম জ্বালা?'

এরা বেরিয়ে পড়তেই পুতুল সজোরে একটা চিমটি কাটলো কপিলের হাতে, 'ছোড়দা দেখ্, মেজদা মেজ বৌদি! ব্যাপার কি?'

'আর ব্যাপার! চুপ করো। কি বলতে বলতে আসছে দেখি।'

মেজ বৌদি একগাল হাসতে হাসতে আসছেন, 'খুব দেখা হয়ে গেল ছবিটা, আরটু হলেই পুতুলের খোকা আগলে বাড়ী বসে থাকতে হ'ত···বন্ধুর ছেলের জন্মতিথি—হি হি হি! মাথা নেই তার মাথাব্যথা।'

কপিল উদাসভাবে বললো, 'কে জানে হয়তো বা ছোট বৌদির সেই কার মোটর অ্যাকসিডেন্টও মিথ্যে, জ্যেঠামশায়ের গোবিন্দবল্লভের পাঠও বাজে, সকলে এসেছে সিনেমা দেখতে!'

'কী কাণ্ড রে ছোড়দা, যা বলেছিস! ছোটদা ছোট বৌদিও এসেছে, কি বলছে শোন্! ও কী ফুর্ত্তি!'

'আর বল কেন? সে "সইয়ের বৌয়ের বকুল ফুলের বোনপো বৌয়ের ভাইজী জামাই" গোছের যা হয় একটা নাম বলে, তার ঠ্যাং ভেঙে তবে নিস্তার! দেখি গে এখন পুতুল এলো কিনা, দিদিশাশুড়ী বুড়ী ম'লো না রইল!' ছোট বৌদি এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

পুতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, 'জানি না বাবা, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে নাকি?···ও কি জ্যেঠামশাইও যে, ছোড়দা! ও ছোড়দা, একি স্বপ্ন দেখছি? না আমরা পাগল হয়ে গেছি? জ্যেঠামশাই সিনেমায়?'

আর একটি বুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন পুতুলদের থেকে হাত দুয়েক তফাতে, 'চমৎকার হয়েছে ছবিটা! নাঃ, বাঙলা ছবির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আজকাল।

আমাদের ছেলেবেলায় বাঙলা বায়স্কোপের রেওয়াজ এত হয় নি। কী বাতিকই ছিল থিয়েটার দেখার। সারারাত জেগে থিয়েটার দেখেছি। এখন বেটা-বেটিদের জ্বালায় কি দেখবার জো আছে? ভাবে বুড়ো হলেই বুঝি শুধু গোবিন্দ ভজতে হয়। এই তো—এখুনি ভাইঝি বললেন, "বেড়াতে যাবো, ছেলে সামলাও"। "গোবিন্দ"র দোহাই দিয়ে কেটে পড়লাম। আরে বাবু, তোরা এখন ছেলেপুলে মানুষ কর, সংসারধর্ম কর, যা বয়স! আমরা চিরকাল খেটে এলাম, এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ করব না? এই তো বয়স শখ-সাধের···কে ও কপিল নাকি? পুতুলও যে? ব্যাপার কি? তোরা কোথা থেকে?'

'আমিও তো আপনাকে সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছি জ্যেঠামশাই—'

'আর বলো কেন বাবা! গিয়ে দেখি গুরুদেব গোবিন্দ গোস্বামী আসেন নি। কি সংবাদ? না প্রভুর সাধ হয়েছে তোমাদের এই সিনেমা না কি ঘোড়ার ডিম, তাই দেখবেন। বলেছেন, "এত লোক কেন দেখতে আসে তাই দেখবো"। আমি এলাম তাঁকে খুঁজতে···তোরা?'

'আমাদেরও তথৈবচ।' সরল মুখে চোখ বড় বড় করে পুতুল বলে, 'গেলাম দিদিশাশুড়ীকে দেখতে, না তিনি বাড়ী নেই, গেছেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে—'

'ফুটবল ম্যাচ দেখতে! দিদিশাশুড়ী? কী বলছিস পাগলের মত?'

'বাঃ, পাগলের মতন কেন? বুড়ো হলে বুঝি দেখতে নেই? এই তো সাধ-আহ্লাদের বয়স! স্বর্গে গিয়ে তো আর দেখতে পাবেন না! তাই স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেছে ছেলেরা। তাই ছোড়দাকে বললাম, কেউ তো বাড়ী নেই, খালি বাড়ীতে এখুনি ফিরে গিয়ে কি করব, চল একটু সিনেমা দেখে যাই।···বেশ হয়েছে ছবিটা, না জ্যেঠামশাই?'

জ্যেঠামশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার পুতুলের মর্মস্থল বিদ্ধ ক'রে গট গট করে এগিয়ে যান।

চক্ষুলজ্জা

বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, হঠাৎ আমি লটারিতে হাজার পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলাম। শুনে তোমরা হয়তো মুচকি হেসে ভাববে, টাকা কিনা গাছের ফল? পেলেই হ'ল! লটারির টাকা, ক্রসওয়ার্ডের টাকা, এসব আবার সত্যি পাওয়া যায় নাকি কখনো? ওসব ছাপার অক্ষরেই দেখা যায়। এই তো আমাদের 'অমুক' আজন্ম লটারির টিকিট কিনে আসছে, তোমার গে, 'অমুক' তো ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়ে 'হাঁ' করে বসে আছে দৈবধন পাবে বলে। কই? পেয়েছে কেউ আজ পর্যন্ত?

তাও এক-আধটা নয়—প···ঞ্চা···শ হা···জা···র!

কিন্তু কি করবো, তোমাদের চোখ টাটাবে বলে তো আর সত্য গোপন করতে পারিনে! ভাগ্যক্রমে পেয়েই গেলাম। আর ওদের চেক্ ভাঙিয়ে টাকাটা একবার হস্তগত করে নিয়ে রেখে দিলাম আমার পাড়ার ব্যাঙ্কে।

পাড়ার বলে হেনস্তা মনে করবার কিছু নেই—ব্যাঙ্কটা ভালো।

তারপর টাকা আছে টাকার জায়গায়, আমি আছি আমার জায়গায়। পৃথিবী যেমন ঘুরছিল তেমনিই ঘুরছে, আমিও যেমন ঘুরছিলাম তেমনিই ঘুরছি, চাকরির চেষ্টায়।

পাড়াপড়শী বা বন্ধুবান্ধব, যাঁরা আমার এহেন ভাগ্য-পরিবর্তনে সনিশ্বাস আনন্দ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, 'তোমার আবার চাকরির দরকার কি বাপু? একলা মনিষ্যি, পুঞ্জির মধ্যে তো একটা চাকর, কত খাবে? পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো, সুদের টাকাতেই রাজার হালে চলে যাবে।'

কিন্তু 'কলসীর জলের' উদাহরণও তো ফেলবার নয়!

তা'ছাড়া হাত-পা থাকতে মানুষ বসে থাকতে পারে? অতএব এ দরজা থেকে ও দরজা, এ সাহেবের কাছ থেকে ও সাহেবের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা হৃষ্টপুষ্ট চাকরি যোগাড় করতে পারলেই, আধ লাখ টাকার একটি মোটা অঙ্ক খসিয়ে,

পৃথিবীর যে সব লোভনীয় বস্তুগুলোর দিকে এতদিন বেচারার মত শুধু তাকিয়ে এসেছি, সেই সব বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে গুছিয়ে বসবো, এই ইচ্ছে।

ইতিমধ্যেই কনের বাবার চর আনাগোনা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঘরের টাকা পরের মেয়েকে খাওয়াবার শখ আমার নেই জানিয়ে দিলাম। সুরেন আর আমি, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। সুরেন আমার 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড', জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব পারে ও। পারে না শুধু টাকা ফুরিয়ে গেলে যোগাড় করতে! মাঝে মাঝে ওই ঝামেলাটাই নিতে হ'ত আমাকে। আশা করছি ওটাও কমলো!

ভগবানের দয়ায় চট্ করে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না।

কথায় বলে 'বিধি যখন মাপান উপরো-উপরি চাপান' কথাটা সত্যি, নইলে এতদিন চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, জোটেনি, আর এখুনি ঝট্ করে জুটে গেল!

সবই ঠিকঠাক হয়ে গেল, তবে চেয়ারটা খালি হ'তে প্রায় মাস দেড়েক বাকী আছে। আপাততঃ যিনি চেয়ারের মালিক, অক্টোবরের আগে তাঁকে নামানো যাবে না এইরকম বন্দোবস্ত।

ভেবে দেখলে মন্দ কি? এই দু'মাস ফূর্ত্তি করে বেড়াই, আর গাড়ী, রেডিও, রেকর্ড, গ্রামোফোন, আলমারি, দেরাজ, টেবিল, আয়না, জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, বই, বুকসেলফ, ক্যামেরা, পোর্টেবল্ টাইপরাইটার ইত্যাদি যাবতীয় লোভনীয় জিনিস সংগ্রহ করি। আগের আমল হলে অবিশ্যি ওই টাকাতেই সব হ'তে পারতো নতুন আনকোরা। এখন কিছু কিছু 'দ্বিতীয় হস্তের' চেষ্টা দেখতে হবে, তাই দেখছি। দুপুর রোদে ট্রামে-বাসে টো টো করে বেড়াচ্ছি যেখানে সেখানে, হঠাৎ যা হ'ল, সেই কথাটাই বলি।

চলন্ত ট্রাম থেকে নামা আমার চিরকালের পেশা, রোজ নামি, সেদিনও নামছি, হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল জানি না। শুধু মনে পড়ে যেন, একটা প্রবল ভূমিকম্প···একটা প্রচণ্ড ঝড়···একটা প্রাণান্ত আর্তনাদ···একমুঠো পীতাভ সরষে ফুল···ব্যস্, তার পরেই সব অন্ধকার!···যেন মহাসমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকলাম।

কতক্ষণ জ্ঞানহারা হয়ে ছিলাম ভগবান বললেও বলতে পারেন, কে যে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়ীতে তুলেছে, ভগবানও বলতে পারেন কিনা জানি না। মোটের মাথায় জ্ঞান পেয়ে দেখলাম, শুয়ে আছি আমার নিজের বিছানায়। আর সেই বিছানা ঘিরে সামনে-পিছনে, এপাশে-ওপাশে, দরজার সামনে, জানলার মাথায়, বারান্দায় আর সিঁড়ির মুখে অগণিত নরমুণ্ডের সারি!

বিকারের ঝোঁকে দেখা কায়াহীন ছায়ামূর্তি নয়, দস্তুরমত রক্তমাংসের ব্যাপার। টাক আর টিকি, বাঁকা সিঁথি আর ব্যাক্‌ব্রাশ, ঘোমটা আর আধ-ঘোমটা, চেনা আর অচেনার বিরাট সমারোহ। সেই অনন্ত জোড়া চোখ আমার একখানি মাত্র মুখের পানে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

আন্দাজ করলাম, আমি মারা গেছি এটা তারই শোকবাসর। এত সকলে কষ্ট করে আমার শেষকৃত্য করতে এসেছে দেখে বড় কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম, কিন্তু মারা যাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি আছে কি নেই, ঠিক জানা ছিল না ব'লেই আবার চোখ বুজলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম, হয়তো পুরোপুরি মরি নি। এতগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত বাক্‌যুদ্ধের থেকে আবিষ্কার করলাম, সৃষ্টিছাড়া গোঁয়ার্তুমির ফলে নাকি মরতে বসেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, এত সব প্রায় অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত আত্মীয়বর্গের সঙ্গে, পাড়াপড়শীর সঙ্গে, যে খুব বেশী 'গলায় গলায় ভাব' ছিল এমন নয়, কিন্তু মহানুভব এঁরা, আমার বিপদ দেখে স্থির থাকতে পারেন নি, ছুটে এসেছেন।

হায়! ও বছরে যখন টাইফয়েড জ্বরে একচল্লিশ দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম, তখন যদি এঁরা খবর পেতেন! বোধ হয় পান নি বলেই আমার অত দুর্গতি গেছে, একলা সুরেন ক'দিক সামলায়?

কিন্তু এবারে? কে কা'কে খবর দিলে কে জানে!

জ্ঞানটা আর একটু পরিষ্কার হ'তেই (হায় তখন কে জানতো জ্ঞানের রাজ্য সীমাহীন) সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, 'এখন বেশ ভালো বোধ করছি, এইবার এক পেয়ালা চা পেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি।'

'হাঁ হাঁ' করে যোগীন মাস্টার ছুটে এলেন, 'বলেন কি মশাই, এ অবস্থায় চা? স্রেফ বিষ যে। বরং ঠাণ্ডা এক গ্লাস মিশ্রীর পানা কিংবা ডাবের জল—'

'আরে রেখে দিন্ আপনার ডাবের জল', আমার জ্ঞাতিভাগ্নে গোরাচাঁদ তেড়ে উঠলো, 'যদি বাঁচতে চাও অমিয়মামা, নির্জলা এক আউন্স ব্রাণ্ডি। দেখেছি তো খেলার মাঠে! আধখানা শরীর উড়ে গেল, বাকী আধখানা নিয়েই ঝেড়ে উঠে "রাণ" দিলো! কার জোরে? ওই ব্রাণ্ডির!'

'ওসব ব্যাণ্ডি-ম্যাণ্ডির কথা ছেড়ে দাও বাছা', আধময়লা থানপরা একটি বিধবা এগিয়ে এলেন, 'তার চেয়ে একটু হালুয়া করে দিই, গরম গরম খেয়ে গায়ে বল পাক। কথায় বলে হাঁটু ভাঙা! বাছার সেই হাঁটু গেছে ভেঙে।'

মুখ দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। ভাবছি কে হতে পারেন ইনি। তিনি নিজেই সন্দেহভঞ্জন করে দিলেন, 'আমায় চিনতে পাচ্ছো না বাবা অমিয়? আমি যে তোমার মাসী হই! তোমার মার আপন জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ মামাতো বোন। আহা বিপদ শুনে দুঃখে আর বাঁচিনে।···তা' একটু গরম হালুয়া করে দিই, কেমন?'

ব্যস্ত হয়ে বলি, 'আপনি কেন কষ্ট করবেন? আমার চাকরই করে দেবে··· সুরেন শোন।'

'সাক্ষাৎ মামাতো বোন' আরো ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'ওরে বাবা, এখন আর চাকরবাকরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি তোমায়? কত দুঃখে প্রাণটুকু যদি ফিরেছে!'

আধময়লা থানের ওপর টেক্কা দিয়ে একটি চওড়াপাড় ফরসা শাড়ী এগিয়ে এলেন, 'সে কথা আর বলতে? তোমার মামা তাই বলছিলেন, অমিয় কি আমার পর? আমাদের "খেঁদির" ছেলে ও, আজ "খেঁদি ঠাকুরঝি" নেই তাই···' বলে প্রায় বিশ বছর আগের শোক স্মরণ করে গলাটা কাঁপাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু শুধুই তো মামী-মাসী নয়? পিসিও আছেন। রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বেশী নিকট বলেই বোধ করি আমার রক্তপাতে কাতর হয়ে এতক্ষণ শুকনো চোখ দু'টি আঁচলে রগড়ে রগড়ে প্রায় পাকা করমচা করে তুলেছিলেন, এখন খেঁদির সূত্র ধরে মামীর এতদূর ঘনিষ্ঠতায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'যে যাই বলুক অমি, তুই যে

আমার হাবুলদার ছেলে সে তো কাউকে বলে বেড়াতে হবে না, প্রাণের টান দেখলেই বোঝা যাবে। কথায় বলে "বাপের বোন পিসি, ভাতকাপড় দিয়ে পুষি", তা' নইলে যেই মাত্তর শুনলাম, মুখের ভাত ফেলে ছুটে এলাম কেন?'

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলি, 'ছি ছি, কি অন্যায়! খাওয়া হয়নি আপনার? তা'হলে সুরেন কিছু মিষ্টিটিষ্টি এনে দিক্, একটু জল খান।'

'তার জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না বাবা, বিধবার আবার উপোস, পাঁচ দিন না খেলেও—'

পাড়ার সবজজ-গিন্নি একখানি বেতের চেয়ারের মধ্যে কোনোপ্রকারে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন, একটু মুচকি হেসে বললেন, 'না না, ব্যস্ত তোমায় হতে হবে না বাবা, ব্যবস্থা হয়েছে বৈকি। এই যে সুরেন ছানা, দই, ডাব আর মর্তমানের ছড়া নিয়ে বাড়ী ঢুকলো দেখলাম।'

পিসিমার কালিমাখা মুখের দিকে চাইতে পারি না।

পাশের বাড়ীর যে দন্তমাণিক ছোকরাটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, দেখি সেও এসে দাঁড়িয়ে আছে। মামী-মাসীদের একটু থামতে দেখে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে, 'এই যে দাদা, জ্ঞান ফিরেছে? মনে কিছু করবেন না, বলি তা'হলে, আপনি দাদা মহাকেপ্পন! অতগুলো টাকা মুফৎ পেলেন, একখানা গাড়ী কিনতে পারলেন না? সেই টো-টো কোম্পানীর ট্রামে চড়ে আনাগোনা! ভাঙবে না হাঁটু? ভগবানই দিলেন ভেঙে!'

ভগবান বেছে বেছে তাকেই খবরটা দিয়ে গেলেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও বললাম, 'গাড়ী আজকাল চট্ করে কেনা শক্ত, খুঁজছি তো একখানা!'

'একখানা? কত চান? কাটুন একখানি হাজার দশেকের চেক্, এখুনি গাড়ী এনে দোরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। শুধুই "ফ্যা-ফ্যা" করে বেড়াই না দাদা, অনেক তালে থাকি।'

'ভালো গাড়ী?'

'ভালো তো নিশ্চয়, তবে যদি "রোলস্ রয়েস" চান, আলাদা কথা। তার অবিশ্যি দাম যোগাতে আর একবার ফার্স্ট প্রাইজ পেতে হবে।'

বললাম, 'পাগল! ছোট্ট একখানা "বেবি" গাড়ী হলেই চলে যাবে, অনেকদিন থেকে শখ আছে!'

যদিও ছোকরাকে চু'চক্ষে দেখতে পারিনে, তবু মনে হ'ল ওর 'থ্রু' দিয়ে গাড়ীটা যদি সুবিধেয় পেয়ে যাই মন্দ কি? সত্যি, অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বটে, খবর রাখে অনেক কিছুর।

সকন্যা সবজজ-গিন্নি উঠে যাবার সময় তাঁর কন্যারত্নটি, যিনি লরেটোয় সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়েন, পরামর্শ দিয়ে গেলেন, এই সময় একটা রেডিও সেট্‌ না কেনার কোনো মানে হয় না, রোগীর মন প্রফুল্ল রাখতে ওর চেয়ে অপরিহার্য আর কি আছে?

আস্ত থাকতে এঁদের সঙ্গে খুব যে যোগাযোগ ছিল এমন নয়। কিন্তু এমন ভালো এঁরা যে, ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই তুলে ধরতে এসেছেন!

পাড়ার লোকেরা গেলেন এক এক ক'রে। কিন্তু আমার নিকট আত্মীয়বর্গের ওঠার আর নামটি নেই। এদিকে হাঁটুর যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠছে, প্রাণ খুলে 'উঃ আঃ' না করলেই নয়।

অবশেষে বাধ্য হয়ে বলি, 'সুরেন, এঁদের সব রাত হয়ে যাচ্ছে!'

সঙ্গে সঙ্গে বা একসঙ্গে অনেকগুলো 'হাঁ হাঁ' শব্দ শুনলাম।

তারপর?

'তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না'···'ওর জন্যে মাথা ঘামিও না'···'আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না'···ইত্যাদি। আমাকে এ অবস্থায় ফেলে গেলে বিবেকের কাছে জবাব দেবেন কি?

তারপর থেকে আমার সেই খুড়তুতো মাসীমা, মাসতুতো পিসিমা, পিসতুতো মামীমা, মামাতো মেসোমশাই, জ্যেঠতুতো দাদার শালা, আর জ্ঞাতি বৌদি রয়েই গেলেন।

পাড়ার লোকেরা? তাঁরা আমায় ছাড়লেন বটে, তবে এইসব উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা আত্মীয়বর্গের খুঁত ধরা ছাড়লেন না। মাঝে মাঝে এসে চিকিৎসার ত্রুটি ধরে ধরে খুঁতখুঁত করে যান।

মানে এই ভগ্ন-হাঁটু দুর্যোধনের জন্যে অনেকেরই খেয়ে শুয়ে সুখ রইল না।··· আর সেই দন্তমাণিক ছোকরা? সে তো বোধ হয় আধখানা রোগাই হয়ে গেল আমার

মাঝে মাঝে এসে চিকিৎসার ত্রুটি ধরে খুঁৎ খুঁৎ করে যান।

[পৃষ্ঠা—১০৪

জন্যে খেটে।

মোটর, রেডিও সেট্ আর গ্রামোফোন কেনার ঝকমারি তো সোজা নয় আজ-কালকার দিনে। তার উপর শ'খানেক রেকর্ড নির্বাচন, সেই কী চাট্টিখানি কথা?

আমি অবিশ্যি বলেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি কি? নিজে একটু না দেখেশুনে অত টাকার জিনিস কেনা, সত্যি প্রাণ করকর করে বৈকি!

কিন্তু ওঁরা আমাকে বোঝালেন, মানে বুঝিয়ে ছাড়লেন, শুয়ে শুয়ে তাকিয়ায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে গান শোনবার সুযোগ, এ জীবনে আর নাও পেতে পারি।

আর এই যে রাতদিন ডাক্তার-বাড়ী আর ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি, বাড়ীর গাড়ী থাকলে সুবিধে কত! হরদম ট্যাক্সিভাড়া দিতে হয় না। আমার ধারণা ছিল, চোটটা এমন কিছু মারাত্মক নয়, কয়েক ফোঁটা আর্ণিকা, আর খাবলা কতক চুনেহলুদেই সারিয়ে তুলতে পারবো, কিন্তু আমি পাগল হয়েছি ব'লে তো আর আমার হিতৈষীরা পাগল হন নি।

ষোল টাকা, বত্রিশ টাকা, আর চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তারগুলো তা'হলে আছেই বা কি করতে? প্রাণের চাইতে তো টাকা বড় নয়? আর কোনো হাঙ্গামাই আমার পোহাতে হচ্ছে না যখন, শুধু চেক্ সই করা ছাড়া!

কাজেই ডাক্তার সেনের ওষুধ খাচ্ছি, সরকারের ইনজেক্শন নিচ্ছি, আর তালুকদারের লোশন লাগাচ্ছি। কবরেজি মালিশও এনেছিল একটা—তবে মালিশ করবার সময় হয় না সুরেনের, তাই রেহাই পেয়েছি।

মালিশ করা ছেড়ে—আমার ঘরে ঢুকতেই সময় পায় না সুরেন।

বাড়ীতে মেম্বার বেড়েছে কত? তাদের সকলের ফাই-ফরমাস সেরে তবে তো আমার? আমিই বলে দিইছি—ওঁরা যা বলেন শুনতে। হাজার হোক নিজেদের সংসার ফেলে যখন আমার ভালোর জন্যেই এসে রয়েছেন। আমারও একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো?

বেলা আটটা বেজে গেছে। সকাল থেকে চা পাই নি। খবরের কাগজখানা নিয়ে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করছি, আর ভাবছি চা চাইবো কিনা। হঠাৎ আমার সেই জ্ঞাতি বৌদি এক পেয়ালা ধোঁয়াবিহীন চা এনে ঠক্ করে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বিরক্ত-

স্বরে বললেন, 'রুগীর বাড়ী একটা স্টোভ নেই, আশ্চর্যি! সারা বাড়ীতে একটা সস্‌প্যান খুঁজে পাই না, অদ্ভুত! এসব বাড়ীতে নার্সিং করা—অসম্ভব।'

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলি, 'কে বা গোছ করে, যা করে সুরেন—'

'তবে ডাকুন আপনার সুরেনকে—একখুনি একটা স্টোভ, এক বোতল স্পিরিট, একটা সস্‌প্যান, চারখানা এনামেলের প্লেট, আধ ডজন চামচে, আর খান দুই তোয়ালে আনিয়ে নিই।'

ভয়ে ভয়ে বলি, 'এখনকার বাজারে জিনিস কি চট ক'রে পাওয়া যাবে?'

'বেশ, তবে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন, অসুবিধে ক'রে কাজ করা আমার দ্বারা হবে না।'

'না না, সে কি কথা? ডাকুন সুরেনকে—'

'আপনার আদরের চাকরের টিকি দেখাই ভার।'

বৌদির অন্তর্ধানের পরই পিসিমার আবির্ভাব।

'আমাদের তো আর থাকা চলে না অমিয়!'

'সে কি পিসিমা, কেন?'

'একটা জিনিস কিনতে ব'লে তিন ঘণ্টা পিত্যেস্ করে বসে থাকা আমার পোষাবে না। আজ "তালনবুমীর বেরতো", তার সব উয্যুগ যোগাড় চাই—কি না? তোমার রোগে সেবা করতে এসে তো ধর্ম-কর্ম খোয়াতে পারি না? তা' তোমার সেই চাকর বাবু আজও গেছেন কালও গেছেন। ভট্‌চায্যি আসবার সময় হয়ে গেল—মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।'

ইচ্ছেটা কিন্তু পিসিমার একলারই করছিল না। করছিল আমারও।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে মরে ভূত হয়ে গেছি। তা' সে একরকম ভূতই, 'দশচক্রে ভগবানও ভূত' হন, তো মানুষ! কিন্তু কবে এ চক্র শেষ হবে চক্রধারীই জানেন!

এতদিন ধ'রে দুধ-সাবু আর ঝোল-রুটি খেয়ে খেয়ে অরুচি লাগছে, ভাবলাম সুরেনের কাছে দুখানা গরম লুচি আর আলুমরিচের বায়না নিই।

কিন্তু ডাকাডাকি ক'রে সুরেনের পাত্তা পাই না। অনেকক্ষণ পরে দয়াপরবশ

হয়ে কে যেন ডেকে দিলো। রাগ চড়ে উঠেছিল, বললাম, 'কোথায় ছিলি রে হতভাগা? ডেকে মরে গেলে গ্রাহ্য নেই, যা—বেরো আমার বাড়ী থেকে।'

'তাই দেন না বাবু দূর করে, হাড় কখানা জুড়োক আমার।'

'ওঃ, খুব যে কথা শিখেছিস? যা দুখানা লুচি ভেজে আর আলুমরিচ করে আন।'

হতাশার চরম ভঙ্গীতে দুখানি হাত উল্টালো সুরেন।

'কি রে?'

'মাপ করতে হবে বাবু, রান্নাঘরের ছায়া দিয়ে হাঁটলে আপনার মাসীঠাকরুণ গোবরজল ছড়া দেন।'

সুরেন নীচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাদার শালার উচ্চ চীৎকারে চমকে উঠি, 'ব্যাটা রাস্কেল, সাপের পাঁচ-পা দেখেছ তুমি? আধ ঘণ্টা আগে তোমায় সিগারেট আনতে দিয়েছি না? এখনো আড্ডা দিচ্ছ? স্টুপিড্ কাঁহাকা, চাবকে লাল করতে হয় তোমাকে, এ তোমার গোবরগণেশ মনিব পাও নি—আজই বিদেয় করছি তোমায়।'

এক মিনিট পরেই মামাতো মেসোমশাইয়ের গলা, 'আমাদের অমিয়র হয়েছে যেমন কিপ্‌টেমি, একটা মোটে চাকর! একটা চাকরে কখনো সংসার চলে? কোন্ কাজ ঠিক সময় হচ্ছে? কিছু না—কিছু না। আমি তো বাবা নিজের কাজ নিজেই করে নিচ্ছি। এখন মানে মানে যেতে পারলেই বাঁচি।'

কে যে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করছে ঈশ্বর জানেন।

শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো নন্দলাল, 'বেশ আছো অমিয়দা, বিনা পরিশ্রমে লাখ টাকার মালিক হয়ে তাকিয়ায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে পড়ে আছো···"নো ভাবনা নো চিন্তা"—আর আমার? উঃ!'

হেসে ফেলি, 'তোর কি এত ভাবনা?'

'কটা বলবো? বন্ধুরা ধরে বসলো, "তোর দাদা লটারীতে টাকা পেলো আর খাওয়ালি না একদিন"—যেন নিজের সহোদর দাদা আমার! যত বলি—"দাদার অ্যাকসিডেন্ট"—শোনে না, বলে, "ওসব বাজে কথা, কঞ্জুস তাই বল্।" ঝোঁকের মাথায় প্রমিস্ করে বসলাম, এখন কি যে করি? ছজনের সিনেমা আর রেস্টুরেন্টের খরচ—'

এত খোলাখুলি কথার পর টাকার বাক্স খুলব না, সত্যি তো এত কঞ্জুস নই!

'কলসীর জল' কোথায় গড়াচ্ছে কে জানে!

* * * *

সুরেন এসে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে পড়লো, 'বাবু, হয় এর বিহিত করুন, নয় আমায় বিদেয় করুন।'

'এই দুর্দিনে তুইও আমায় ছেড়ে যাবি সুরেন?'

'কি করবো বাবু, এই রাবণের সংসার পুষতে পারবো না আমি।'

'তুই পুষছিস নাকি?' হেসে ফেলি।

'না তো কি?' সুরেন খুব চটে ওঠে, 'রাজশয্যেয় শুয়ে আছেন, কাজের মধ্যে একবার করে টাকায় সই করা—কত ধানে কত চাল হিসেব রাখেন? বাড়ীতে এদিকে রাজসূয় যজ্ঞি, দৈনিক তিরিশ কাপ্ চা, বারো টাকার মাছ, দশ সের করে আলু, দু'টাকার পান-সুপুরি, আরো কত বলবো! এ ছাড়া, মেসোবাবুর দাঁতে ব্যথা—দু'বেলা খিচুড়ি হালুয়া, বৌদিদির "এনিমি" না কি—নিত্যদিন ফল মাখম, মাসীমা রাতে "পাকড্রব্যি" খান না—তেনার দই মিষ্টি ছানা, পিসিমার পিত্তির ধাত—ডাব নইলে চলে না, দাদাবাবুর পেটের দোষ—দই ভিন্ন খান না, বলতে গেলে মুখ ব্যথা। দিন পাঁচ সের দুধ নিচ্ছি, তবু সব রাগারাগি!'

সেদিন পড়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে চোখে সরষে ফুল দেখেছিলাম—আজ আবার দেখলাম। এত খবর জানতাম না।

বললাম, 'এখন উপায়?'

'উপায় তো হাতেই আছে, কিন্তু আপনার কি মন সরবে? যা চক্ষুলজ্জা!'

'কি বল্ তো?' কৌতূহল হ'ল।

সুরেন হঠাৎ বীরবিক্রমে উঠে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা জিনিস তুলে এনে উঁচিয়ে ধরে বিনা বাক্যব্যয়ে উপায় দেখিয়ে দিল।

জিনিসটি আর কিছুই নয়, বাবার আমলের একটি রূপোবাঁধানো মোটা বেতের লাঠি।

কিন্তু সুরেনের উপায় তো সত্যি চালানো চলে না! কাজেই ছানা-চিনিই চলছে।

আর সুরেন বাজার করছে তো করছেই। লাক্স সাবান, নিমের মাজন, দ্রাক্ষারিষ্ট, সেফ্‌টি রেজার, লাল গামছা, তোলা উনুন, বোনার সুতো, টিনের মগ, সিগারেট, মোটা চিরুনি, পেতলের হাঁড়ি, লক্ষ্মীবিলাস—কি নয়? আর কেনই বা নয়? অসুবিধে সয়ে কে কতদিন থাকতে পারে? আর আমার উপকার করতে এসে কি নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচা করবেন? বলতে গেলে—আমি যখন অর্ধেক রাজত্বের মালিক!

সুরেন আর রাগ করে না, বরং পাঁচ টাকার জায়গায় সাত টাকা খরচ করে আসে—খুব সম্ভব আমার ওপর আক্রোশে। নাঃ, আর সহ্য করা অসম্ভব! সুরেনের মর্মব্যথাই আমাকে জাগিয়ে তুললো। ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে পড়ে, লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কারুর সামনে দিয়ে এলে তো রক্ষে নেই, হিতৈষীর দল 'হাঁ হাঁ' করে আসবেন।

বেরিয়ে গাড়ীখানায় চড়বো বলে গেলাম গ্যারেজে, শুনলাম, গাড়ী চড়ে দাদাবাবু অর্থাৎ দাদার শালা অফিসে গেছেন। তাই যান রোজ।

বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা ট্যাক্সি নিলাম।

প্রথমে গেলাম ভাবী অফিসে, জানলাম 'জয়েনিং ডেটে'র আর পাঁচ দিন বাকী আছে। অতঃপর একে একে দশ-বারোটা খবরের কাগজের অফিসে—ইংরিজি বাংলা হিন্দি যতগুলো নামজাদা কাগজ আছে।

শেষ মাথায় ট্যাক্সিখানা করেই সোজা চলে গেলাম দক্ষিণেশ্বরে এক বন্ধুর বাড়ী।...তারপর? বন্ধুর বাড়ী পোলাও কালিয়া। তারপর? সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে বেড়ালাম—কালীবাড়ীর আরতি দেখলাম। এভাবে দু'দিন কাটল।

তারপর? নাঃ, সবটা না শুনে আর ছাড়বে না দেখছি।

তৃতীয় দিন সকালবেলা মা-কালীকে এক পেন্নাম ঠুকে ফিরে এলাম। দেখি সদর দরজা খোলা—সুরেন 'ফ্যালকা-মুখো' হয়ে বসে আছে রোয়াকে।

'বাবু এসেছেন?' একটি শব্দে সুরেন করলো তার সমস্ত ভাবের অভিব্যক্তি—সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, হর্ষ-বিষাদ! পরশু থেকে আমার অনুপস্থিতিতে ভেবেছিলো বোধ হয় এবার হাঁটুর ওপর দিয়ে যায়নি, মাথার খুলিটাই গেছে।

'বাবু, এঁরা সব পগার পার!'

'জানি।'

'কাল সারাদিন সে কী কাণ্ড বাবু!'

'জানি!'

'লোকের ওপর লোক আসছে, একটুকরো খবরের কাগজ হাতে। দলে দলে, কাতারে কাতারে, সে যে কী ব্যাপার—বললে বিশ্বেস করবেন না বাবু, আর বলবেই বা কে মুখ ফুটে? সে এক ভয়ঙ্করী দৃশ্য!'

'জানি।'

সুরেন কিছুক্ষণ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে গম্ভীরভাবে বললো, 'এতই যদি জানতেন বাবু, তবে আর টাকার খাতাটা শেষ করে আনলেন কেন? আগে জানলেই পারতেন!'

লোকগুলো সুরেনের ভাষায় যে খবরের কাগজের টুকরোগুলো এনেছিল, সে আর কিছুই নয়, একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং।

আমারই বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে, নীচে লেখা আছে—

বস্ত্র বিতরণ! বস্ত্র বিতরণ!!

কেবলমাত্র একদিনের জন্য!

১০০০খানি ধুতি সরকার-কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। যথার্থ বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত প্রমাণ সহ উপরোক্ত ঠিকানায় আবেদন করুন।

ব্যস! বেলা দশটা থেকে দলে দলে, পালে পালে, কাতারে কাতারে আবেদনকারী 'উপযুক্ত প্রমাণ সহ' 'কাপড়া কাপড়া' 'ধোতি ধোতি' শব্দে 'রে রে' করে ছুটে এসে বস্ত্র বিতরণের চিহ্নমাত্র না দেখে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে

দেয়। পরের কথা সংক্ষিপ্ত···সেই 'যথার্থ অভাবগ্রস্তদের' মূর্তি দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল সকলের—তার ওপর ইট-পাটকেল !!

সত্যি তো আর এতগুলো উন্মাদ সামলানো আমার সেই ভালোমানুষ গোবেচারাক্লাসের খুড়তুতো মাসীমা, মাসতুতো পিসিমা, পিসতুতো মামীমা, মামাতো মেসোমশাই, জেঠতুতো দাদার শালা, আর জ্ঞাতি বৌদিদির পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই খিড়কির দরজা দিয়ে একবস্ত্রে প্রস্থান।

সুরেন অনেক কষ্টে তিনতলার ছাদে উঠে আত্মরক্ষা করেছে।

শার্শীর কাঁচগুলো অবিশ্যি একখানাও আস্ত নেই, না থাক—ও তো বাড়ীওয়ালার।

বাদলের কীর্তি

'ডাক্তার কি বলে গেল ছোট্‌কা ?'

সশব্দ প্রবেশের সঙ্গে নিজেকে সজোরে একটা চেয়ারে নিক্ষেপ ক'রে বাদলবাবু উক্ত প্রশ্নটি করে হাঁফাতে থাকেন।

ত্রস্তব্যস্তে নিজেকে এবং টেবিলের জিনিসগুলোকে সামলে কতকটা নিরাপদ করে নিতে হয়। কারণ বাদল ঘরে ঢুকলেই একটা তচনচ্ কাণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ধীরে সুস্থে বলি 'ডাক্তার বলে গেল, রোগ যদি কোথাও হয়েই থাকে—সে তোমার ব্রেণে।'

'তার মানে, আমার মাথা খারাপ, কেমন ? এই তো বলছো ?'

'আমি তো কিছুই বলি নি বাপু, ডাক্তারের মত জানতে চাইছো তাই বলছি।'

'জানি জানি, সব বুঝেছি, বন্ধু ডাক্তার—সে তো তোমার দিকে ঝোল টানবেই। আর বিনি ভিজিটের ডাক্তার রুগীর মাথা খারাপ ছাড়া আর কি বলবে

বল? নিত্যি নিত্যি বেগার খাটতে আসতে কার শখ হয়? হ্যাঁ, হ'তো যদি ষোল টাকার ডাক্তার, কেমন না রোগ খুঁজে বার করতো দেখতাম। এই যে কথা কইলেই হাঁফাচ্ছি, এটা বুঝি খুব ভাল লক্ষণ?'

চেষ্টা করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে বাদল, যাতে দুর্লক্ষণটা বেশ জোরালো হয়।

কেন জানি না, কিছুদিন থেকে বাদল আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, তার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়, এইবেলা চেঞ্জে না গেলে নাকি বিপদ অনিবার্য। কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে!

ওর মনটাকে প্রবোধ দেবার জন্যে ডাক্তার-বন্ধু প্রতুলকে একবার ডেকেছিলাম। কিন্তু তার রায়টা দেখছি বাদলের মনঃপূত হ'ল না।

কলকাতার হাওয়ায় নাকি সর্বদা রোগের জার্ম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাদলের মত নিরীহ ছেলেদের আক্রমণ করতে। মাঝে মাঝে একবার বাইরে গিয়ে 'মুক্তবায়ু ভক্ষণ' করে আসা ছাড়া বেঁচে থাকবার আর কোনো উপায় নেই।

কি জানি, ছেলেটা তলে তলে কবিতা-ফবিতাই লিখছে নাকি, হয়তো কলকাতার নীরেট আবহাওয়ায় কলমটা ঠিক খুলছে না, কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দরকার হয়ে পড়েছে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বাদল টেবিল থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে, 'অবিশ্যি না নিয়ে যাও সে আলাদা কথা, আমি বাঁচলেই বা কি, মরলেই বা কি, তুচ্ছ একটা বাদল বৈ তো নয়! তবে পাড়ার লোকে তোমাদের দুষবে, এই আর কি! এই তো সেদিন ছোট পিসির শ্বশুর বলছিলেন—'

'ছোট পিসির শ্বশুর? স্বর্গ থেকে রেডিওযোগে কিছু বলছিলেন বুঝি?'

'আঃ, হ'ল না হয় শাশুড়ীই', বাদল নিতান্তই যেন আহত হয়, 'অত কি মনে থাকে? শরীর খারাপ থাকলে মেমারিও নষ্ট হয়।···সে যাক। আমার রোগটা তো সবই কাল্পনিক, তবে ছোট পিসির ইয়ে সেদিন বলছিলেন কিনা যে, "বাদল, দিন দিন কী রোগাই হয়ে যাচ্ছো তুমি, দেখলে চেনা যায় না", তাই বলছি আমার ভালো-মন্দ একটা কিছু হলে পাঁচজনে তো তোমাদেরই নিন্দে করবে! এই জন্যেই বলা।'

মুখের ভাবে যতদূর বৈরাগ্য আনা সম্ভব তা' এনে বাদল বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

নাঃ, ছেলেটা দেখছি রোগ না এনে ছাড়বে না।

বলি, 'আচ্ছা বাপু, খুব রোগ হয়েছে তোর স্বীকার করছি, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়া বললেই তো হয় না? কত ব্যবস্থা, কত হাঙ্গামা! ধর শিলং কি সিমলে, পুরী কি পুরন্দরপুর, সেইটা সিলেক্ট করাই তো এক প্রব্লেম। তারপর দিনক্ষণ, পাঁজিপুঁথি—হুট্ বলতেই তো ছেড়ে দেবেন না মা।'

বাদল বৈরাগ্য ভঙ্গ করে একটু নড়েচড়ে বসে, বোধ হয় একটু আশার বাণী শুনে। বলে, 'অত বাবুয়ানার দরকার কি ছোট্কা? শিলং সিমলে ওসব বড়লোকের জায়গা, হাতের কাছে নিজেদের দেশ রয়েছে সিউড়ি, পৈত্রিক ভিটে—'

পৈত্রিক ভিটের ওপর বাদলের ভক্তির বহর দেখে না হেসে পারি নে।

বললাম, 'কিন্তু সিউড়ি কি একটা হাওয়া বদলাবার দেশ রে?'

'ওই তো দোষ ছোট্কা, বাঙালী তো ওতেই উচ্ছন্ন গেল, নিজের দেশের ওপর অছেদ্দা ক'রে। এই তো—বঙ্কিমচন্দ্র না মাইকেল কে যেন "বিদেশের ঠাকুর আর স্বদেশের কুকুর" নিয়ে লিখে যান নি কি? না মানলে আর কি হবে—'

বাস্তবিক বাদলের স্মৃতিশক্তির তারিফ না ক'রে উপায় নেই।

যাক্, কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি নেহাৎ। মাও প্রায়ই দেশের বাড়ীর ভগ্নদশার কথা তুলে খেদ করেন, আমারও কিছু ছুটি পাওনা হয়েছে। বললাম, 'আচ্ছা তাতে যদি তোর সত্যিই কিছু উপকার হয়, চল্ দিনকতক। পাঁজিপুঁথির ব্যবস্থা নিগে ঠাকুমার কাছে।'

'ওর আর কি, ভট্চায্যি মশাইয়ের কাছে একবার···আরে আরে, ওই তো ভট্চায্ মশাই যাচ্ছেন না?'

বলেই হঠাৎ চেয়ারটা উল্টে, টেবিলটায় ধাক্কা মেরে, কপাটটা ঝনাৎ করে খুলে ঠিক্‌রে গিয়ে রাস্তায় পড়লো বাদল।

এতে অবশ্য বেশী আশ্চর্য হই না আমি। এইটাই বাদলের স্বাভাবিক গতি।

এক পেয়ালা চা গেল তাতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু দামী পোর্সিলেনের পেয়ালাটা

টেবিল থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল এই যা! প্রাক্-যুদ্ধকালের জিনিস তাই, তা নইলে এ বাজারে পাঁচ টাকা দিলেও মিলবে না এমন পেয়ালা।

মিনিট খানেক পরেই বাদল ফিরে এল, 'ওঃ, চোখটা ছোট্‌কা কী খারাপই হয়ে গেছে, আর তুমি বল কিনা চশমা নিতে হবে না? হেল্‌থ্ খারাপ হ'লেই "অপটিক্ নার্ভ" উইক হয়ে পড়ে, এ তো কচি ছেলেরাও জানে। চোখের মাথাটা একেবারে না খেলে আর তোমাদের···এই দেখ একটা মোছলমান বিড়িওলাকে ভট্‌চায্ মশাই বলে ভুল করে ছুটলাম!···কিন্তু একি—পেয়ালাটা ভাঙলে ছোট্‌কা? বড্ড কিন্তু অসাবধান হচ্ছ বাপু আজকাল, আহা-হা এমন জিনিসটা—'

ভাঙা কাঁচের টুকরো একটা তুলে নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বাদল।

নাঃ, রাগিয়ে না দিয়ে ছাড়লো না দেখছি, বলি, 'জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াসনে বাদল, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌লি, মনে নেই? কি পড়লো, কি ভাঙলো, খেয়াল থাকে কিছু? এমন জিনিসটা—'

'তাই বুঝি? আমারই ধাক্কায়?'

চট্ করে ভাঙা কাঁচটুকু ফেলে দিয়ে বাদল মুখে একটা উদার ভাব এনে ফেলে, 'ওঃ, ওর জন্যে মন খারাপ কোরো না ছোট্‌কা, কাঁচ ক্ষণভঙ্গুর জিনিস কে না জানে? আজ নয় কাল যেতই একদিন, বরং আর এক কাপ্ চা আমি তোমার—'

* * *

চায়ের সঙ্গে কোথা থেকে চারটি ডালমুটও এনে হাজির করে ফেলে।

মানে, তোয়াজ শুরু হ'ল, কাজ আদায় করতে বাদলের এ একটি বিশেষ 'চাল'।

শেষ পর্যন্ত বহুদিন পরিত্যক্ত পৈত্রিক ভিটেরই ভাগ্যি ফেরে। একদিন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে সিউড়ি রওনা হই। মা, আমি, বাদল আর হারাধন। বাদলের দক্ষিণ হস্ত হ'ল এই হারাধন।

মরচে-ধরা তালাচাবি খুলে যখন আধঝুলন্ত কড়ি-বরগা, উইধরা জানলা-দরজা, আর ফাটলে গজানো মহীরুহদের মনোহর মূর্তি দেখে আমি কাতর, আর মা ক্রুদ্ধ, তখন দেখি বাদল আর হারাধন মহোৎসাহে উঠোনের জঙ্গল ঠেঙাতে শুরু করেছে।

'অ বাদলা, অ মুখপোড়া, ও কি হচ্ছে আমার মাথা খেতে? হেরো হতচ্ছাড়া, দিচ্ছিস তো কুমন্ত্রণা? তখনই বলেছিলাম ও শয়তানকে এনে কাজ নেই। এখন দেখ্ নেপু, ছোঁড়া দু'টোর কাণ্ড!'

বলা বাহুল্য এটি আমার 'মাতৃভাষা'। সচরাচর বাদল সম্বন্ধে এই রকম ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন মা।

বাদল কিছু বলে না, হারাধন গম্ভীরভাবে বলে, 'সাপ তাড়াচ্ছি গো ঠাক্‌মা, বাস করতে হবেক তো? যা জঙ্গল এঃ, বাঘ লুকিয়ে থাকে তো সাপ!'

আমার আর বাদলের দু'টো ছাতাই প্রায় ফিনিশ্ করে আনে তারা আগাছা ঠেঙিয়ে।

... ...

ক'টা মিস্ত্রী, ক' হাজার টাকা, আর কতটা টাইম হ'লে বাড়ীখানা বসবাসের যোগ্য করা যায় মনে মনে তারই একটা এস্টিমেট্ কষছি, হঠাৎ শুনলাম বাদলের চাপা অথচ পুলকিত কণ্ঠস্বর, 'ঠিক এই রকমটিই দরকার বুঝলি হারু, চকচকে ঝকঝকে জায়গায় তাঁরা আসেন কখনো? কক্‌খনো না, তাহলে আর কলকাতা কি দোষ করেছে? গেলেই হয়? তা নয় রে, এই সব পুরনো পুরনো ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আর গাছপালার বুনো গন্ধ, এটাই ওঁদের পছন্দ। সত্যি, অ্যাটমোস্‌ফিয়ারটা চমৎকার! উঃ, কম কষ্টে কি রাজী করাতে হয়েছে!···কে ও ছোট্‌কা নাকি? চা-টা খেয়েছ তো? বাস্তবিক "জল-হাওয়া" বেশ ভাল এদিককার। কী দারুণ ক্ষিদেটাই পাচ্ছে—তোমার পাচ্ছে না ছোট্‌কা?'

'হ্যাঁ, নিদারুণ একেবারে, কিন্তু "ওঁরা" "তাঁরা" আবার কারা শুনি? আবার কাকে জোটানো হচ্ছে এই ইন্দ্রপুরীতে?'

বাদলকে বিশ্বাস নেই, একবার দেওঘর গিয়েছিলাম বাদলকে নিয়ে। স্টেশনে এসে দেখি ওনার তিনটি বন্ধু উপস্থিত। তাঁরাও যাবেন, বাদলের নেমন্তন্ন।

বাদল অভয় দেয়, 'সে সব কিছু নয় কাকা! ও নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি।

ও আমাদের গোপনীয় কথা। চল্ রে হেরো, ঠাকুমার খিচুড়ি নামলো বোধ হয়।··· ছোট্‌কা আসবে নাকি ?'

খিচুড়ি, পাঁপর ভাজা, আর আলুসিদ্ধ—এই মাত্র। বাড়ী হ'লে বাদল রসাতল করে ছাড়তো, কিন্তু আজ স্ফূর্তি দেখে কে! চেয়েই নিল দুবার। জল-হাওয়ার গুণ তা'হলে মিথ্যে নয় দেখছি।

হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা ঠাকুমা, কাছাকাছি শ্মশান আছে তো ?'

মা চমকে উঠে আরো দুখানা পাঁপরভাজাই দিয়ে ফেলেন।

'ও আবার কি কথার ঢং রে বাদলা ? শ্মশান কি হবে শুনি ?'

'না এমনি বলছি, নিজেদের দেশে কোথায় কি আছে খবর নেব না ?'

'তাই সর্বাগ্রে শ্মশানের খোঁজ ? বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরে যাই! কেন রাতারাতি বুড়ীকে শ্মশানে রেখে আসার মতলব হচ্ছে নাকি ? তা তোমরা পারো, হেরো আর তুমি, দুটিকে একত্র দেখলে আমার বুক কাঁপে। সব পারো তোমরা। নেপুর যেমন কাণ্ড, তাই তোদের এনেছে এই "বনোলা পুরীতে"।'

কার 'অনারে' কে এসেছে সেটা আর মনে নেই মার।

হারু পাতটি চেটেপুটে হৃষ্টচিত্তে বলে, 'দাদাবাবুর কথা শোনো কেন ঠাক্‌মা, ওনার কি "বুদ্ধি"র ঠিক আছে ? কেতাব পড়ে পড়ে মাথা গরম হয়ে গেছে।'

ভেবেছিলাম—ছুটির দিন ক'টা আরামে কাটাবো। কপালে নেই। ছুতোর, কামার আর রাজমজুরের ধান্ধায় ঘুরে মরছি। দশ-বিশ বছর ফেলে রেখে দেওয়া বাড়ী অবহেলার শোধ নিচ্ছে।

এদিকে বাদল যে কিসের ধান্ধায় আছে বাদলই জানে। আমি শুধু তার নিত্য নূতন অভাব-অভিযোগের অভাবেই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই। খাওয়া নিয়ে বায়না নেই বাদলের। ব্যাপার কি ?···দু-একদিন থেকেই শখ মিটে যাবে ভেবেছিলাম, তারও লক্ষণ দেখি না।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাদলার টিকিটাও দেখি না মা, কোথায়

ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টা? এই পাড়াগাঁয়ের হাওয়া আর রোদে চেহারা খুলে যাবে একেবারে। হারুটাই বা কই?'

মা দুই হাত উল্টে উদাস ভঙ্গীতে বলেন, 'আ আমার কপাল, বেড়ায় আবার কোথা? উদয়াস্ত তো সেই চিলে-কোঠার ঘরে। কি যে করে সেখানে ওই জানে, আর ওর পেয়ারের হারাধন জানে। আমাকে তো ছাতের ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না। ওই ছোঁড়াকে পাহারা রেখে দিয়েছে।'

শুনে তো অবাক। ঘরে খিল দিয়ে কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তো এত কাণ্ড করে কলকাতা ছাড়বার দরকার কি? সেখানে তো দুখানা ঘর খালি পড়ে ছিল তিনতলায়। বনজঙ্গল আঁদাড়-পাঁদাড় এত সব থাকতে চিলে-কোঠা?

বোমা-টোমা নয় তো? কি জানি, এখনকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই বাবা।

'বাদল বাদল!'

হাঁক পাড়তে নেমে এল। এসে বলল, 'কী ছোট্‌কা, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি? তোমাদের জ্বালায় সুস্থির হয়ে একটু—ইয়ে—লেখাপড়া করবার জো নেই।'

গ্রীষ্মের ছুটিতে লেখাপড়ার ওপর এত অনুরাগ, এ তো ঠিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে হচ্ছে না। উঁহু, সত্যিই কিছু হ'ল নাকি বাদলের? ডিস্‌পেপসিয়া? তা'ছাড়া লেখাপড়াতে লুকোচুরির কি আছে? সেই সন্দেহই ব্যক্ত করি, 'পড়িস্, বেশ তো ভালো কথাই। কিন্তু পাহারা বসিয়ে পড়া—সেটা কি রকম বাপু? মাকে ছাদে উঠতে দাও না—'

বাদল কথা কয় না, উত্তর করে ওঠে অনুচরটি, 'ও কথাটি বলবেন না ছোটবাবু, সাক্ষেৎ আপনার গর্ভধারিণী মা তাই বলতে ভয় লাগে, নইলে উটি একটি "টিকটিকি"। দাদাবাবু বলে নিজ্জন নইলে সাধনা হয় না, আর ঠাক্‌মা পঞ্চাশবার উঁকি দিচ্ছে।'

মা সামনে ছিলেন না, তাই হারাধনের এত সাহস। হঠাৎ ভাঁড়ার ঘর থেকে মা যখন এসে পড়লেন, হারাধনের মুখ আর অঙ্গভঙ্গী তখন থেমে গেল।

এতদিন লক্ষ্য ছিল না, একটু চোখ রাখতেই নজর পড়লো—বাদল আর হারাধন যেন কী এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সর্বদাই ফিস্‌ফাস্ কথা, চোখে চোখে ইশারা, কী যেন এক ব্যস্ত ভাব!

দুশোবার তিনতলা একতলা করতে করতে হারাধনের তো পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাবার কথা। নেহাৎ তার পরমারাধ্য দাদাবাবুর ফরমাস খাটা ব'লেই অটুট আছে।

ঘুম থেকে উঠেছি, আর মার বিরক্তস্বর কানে এল, 'কিছু খাবি না মানে? নির্জলা উপোস দিবি তুই? কেন ঘাড়ে কি চেপেছে? এই তো আজ তিনদিন ধরে নিরিমিষ্যি খাচ্ছিস তাতে হ'ল না? দরকার নেই আমার। নেপু আজই তোকে কলকাতার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসুক। মা-বাপের কাছে গিয়ে যা খুশী করগে যা।'

নাঃ, বাদল যে ক্রমশঃই রহস্যময় হয়ে উঠছে। উপবাস? নিরামিষ? গুরুটুরু জোটালো নাকি দেশে এসে? জিজ্ঞেস করলে তো বলেও না ভালো করে।

এদিকে মারও হয়েছে জ্বালা। একে তো বাদলের উপদ্রব, তার ওপর তেমনি হয়েছে ইঁদুরের উৎপাত। বড় বড় মেঠো ইঁদুর—ওদের অসাধ্য কর্ম কিছু নেই। এই তো সেদিন মার রুদ্রাক্ষর মালাগাছটা টেনে নিয়ে কোন্ গর্তে যে ঢোকাল, তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। একদিন চন্দন কাঠের টুকরো দুখানা নিয়েই ভেগেছে। মট্‌কার থানখানাও শুনছি দু'দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। এও নিশ্চয় ওদেরই কর্ম। চোর-ছ্যাঁচোড় আসবে কোথা থেকে?

আজ আবার শুনছি ঠাকুরঘরে ধুনো দেবার বড় পেতলের ধুনুচিটা, আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। কেটে-কুটেই ছোট করুক না হয়, কিন্তু আস্ত পঞ্জিকাখানা? তা' ছাড়া পিতলের ধুনুচি? সত্যি কি জাতের ইঁদুর সে? ইঁদুরের বামুন নয় তো? যেমন ধোবার বামুন, গয়লার বামুন—তেমনি?

মা রেগে-টেগে এসে বললেন, 'আর দরকার নেই নেপু, আজই চল্। খুব দেশের বাড়ী ভোগ হয়েছে, ভোগ নয় ভোগান্তি! বাবার কালে এমন ইঁদুর দেখি নি। ওমা কী কাণ্ড! আচ্ছা, পেতলের ধুনুচি যে নিলি—দাঁতে কাটতে পারবি? কাগজ খাবার শখ হয়েছে—কত কাগজ আছে খা না, তা নয়, "পাঁজি খাবো"। এখন—আমাবস্যে আজ না কাল, কি করে বুঝবো?'

বললাম, 'আমাবস্যে আজই, ক্যালেণ্ডারে রয়েছে, কিন্তু এও তো আশ্চর্য যে বেছে বেছে পূজো-আর্চার জিনিসগুলোই খাচ্ছে ইঁদুরে! সত্যি খুবই সাত্ত্বিক ইঁদুর

তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথম নম্বর, রুদ্রাক্ষর মালা, নম্বর টু, চন্দন কাঠ, নম্বর থ্রি, মট্‌কার থান, চার নম্বর, এই পঞ্জিকা আর ধুনুচি, কেন বল তো?'

'আমার সঙ্গে বিশ্বসুদ্ধ সকলের শত্তুরতাই, আর কেন?' ব'লে মা বিশ্বসুদ্ধ সকলের উপরই রাগে গন্‌গন্ করতে থাকেন।

আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে। বাদলের রহস্যময় গতিবিধির সঙ্গে এই সব অন্তর্ধানের কোন যোগসূত্র নেই তো? ওর চিলে-কোঠার ঘরটা একবার সার্চ্চ করলে হয় না?

মাও বোধ করি তলে তলে ঐ মতলব করছিলেন। রাত তখন এগারটা, শুয়েছি, কিন্তু গরমের জ্বালায় ঘুম হচ্ছে না। হঠাৎ মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, 'ও নেপু, দেখ্ বাদলার কীর্তি! ওমা আমি কোথায় যাবো—গলায় দড়ি দেবো না বিষ খাবো! কী সর্বনেশে ছেলে গো, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে যে গো—'

শুয়ে থাকা অসম্ভব হ'ল। দড়ি এবং বিষ দু'টো মোক্ষম জিনিসেও যখন মার মন উঠছে না, মরবার আরো পথ খুঁজছেন, তখন ব্যাপারটা একটু যেন বেশীই ঘোরালো।

উঠে পড়ে ব্যস্ত হয়ে বলি, 'কি গো মা, হ'ল কি?'

'হ'ল আমার মাথা আর মুণ্ডু! এই ঘোর আমাবস্যের রাত্তিরে পথের পানে চাইলে গায়ে কাঁটা দেয়, আর সেই লক্ষ্মীছাড়া ডাকাত ছেলে কিনা শ্মশানে গেছে "ভূতসেদ্ধ" করতে! আমি এই বলে রাখছি নেপু, তোমাদের ও ছেলে একদিন খুনে হবে।'

'খুনে হবে সে তো বুঝলাম, কিন্তু "ভূতসেদ্ধ" কি?'

'জানি না। জিজ্ঞেস কর ওই হেরো মুখপোড়াকে, কুমন্ত্রণার গুরু যেটি।'

অগত্যা হেরোর শরণ নিতেই হ'ল। হাঁক দিতেই সাদা বাংলায় যাকে 'কাঁচুমাচু' বলে, তদবস্থায় এসে দাঁড়ালো হারাধন। কিন্তু কথার উত্তর কি সহজে দিতে চায়!

জেরার ফলে যা গোচরীভূত হ'ল, সেটা লোমহর্ষক বটে। একপক্ষ কাল সজোর সাধনার পর, অমাবস্যার দিন স্রেফ নির্জলা উপবাস করে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্মশানে গিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে একাসনে বসে এক হাজার জপ করতে পারলেই নাকি ব্যস! ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ বা ডাকিনী-যোগিনীসিদ্ধ তো কোন্ ছার, একেবারে সুসিদ্ধ বাদল!

আরো এক ফ্যাসাদ, শনিবার সম্বলিত অমাবস্যা হওয়া চাই এবং আজই হয়েছে সেই মণিকাঞ্চন যোগ!

শুনে প্রায় রুদ্ধবাক্ হয়েছিলাম, অনেক কষ্টে বলি, 'সাধনাটা কি রকম?'

বিকশিত-দন্ত হারাধন সাহসে ভর ক'রে বলে, 'এজ্ঞে সেই কেতাবের ছবির মতন কায়দা করে ব'সে "মণিপদ্ম হুম্" জপ করতে হয়।'

ক্ষণে ক্ষণে যেন বিদ্যুতের শক্ খাচ্ছি। বলি, 'কেতাব আবার কি? কই দেখি?'

অনিচ্ছামন্থরগতিতে, হ্যারিকেনের শিখাটা চরম সীমায় টেনে নিয়ে হারু তিনতলার চিলেকোঠা থেকে একখানি ছেঁড়া ঝরঝরে বই এনে আমার হাতে সমর্পণ করে।

বটতলার ছাপা ও অগ্রপশ্চাৎবিহীনা একখানা 'প্রেতসিদ্ধি বা তন্ত্রমন্ত্র-শিক্ষা'। নামও শুনি নি কখনো এসব উনচুটে বইয়ের।

'আসন' 'প্রাণায়াম' ইত্যাদির শিক্ষাবাবদ কয়েকখানি ছবিও ছাপা আছে। যদিও ছবি দেখলে, বাঁদর কলা খাচ্ছে কি ধ্যানমগ্ন সিদ্ধপুরুষ এটা বোঝা শক্ত, তবু অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই।

মার অন্তর্হিত মটকাখানি ভাঁজ করে 'আসনের' কাজ চালানো হচ্ছে। অতএব ...রুদ্রাক্ষর মালা, চন্দনকাঠ, আর পঞ্জিকা প্রভৃতির হদিস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘর সার্চ করবার সময় হ'ল না। লাঠি, লণ্ঠন আর হারাধনকে ভরসা করে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শ্মশানের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। বাদল 'ভূতসিদ্ধ' করবে, কি ভূতেই তাকে সিদ্ধ করে খেলো, কে জানে?

সারাপথ হারুর আবেদন-নিবেদন, 'হেই ছোটবাবু, তোমার পায়ে ধরি, আমার

নামটি কোরো না। দাদাবাবু তা'হলে "এই জন্মে" আমার মুখ দেখবে না।...হেই ছোটবাবু, মরে গেলে কুমীরপাকের নরক হবে আমার। দা'বাবু বলে, "বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কুকুরের অধম"।'

হারুর প্রভুভক্তির প্রশংসা না করে পারি না। এ হিসেবে কুকুরাধম না বলে বরং কুকুরোত্তম বলা উচিত তাকে!

দিনের বেলা দেখেছি, শ্মশানটা আমাদের বাড়ী থেকে আধ মাইলটাক দূরে। কিন্তু এই গভীর অন্ধকারে প্রতিমুহূর্তে সাপ আর বাঘের মূর্তি কল্পনা করতে করতে সেই আধ মাইল পথই যেন আধ যোজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হচ্ছি।

'হেরো, কি হ'ল বাপ, কোথায় তোর দা'বাবু আর তার "ভৈরবী পীঠ"? রাস্তা হারালি না তো?'

'না ছোটবাবু, উই যে—হোথায়, উই পেরকাণ্ড গাছটার নীচে দিনমানে দেখে গেছি যে—এখন আঁধারে ঠাওর হচ্ছে না। রসুন, হাঁক ছাড়ি, দাদাবাবু—উ—উ—উ, —ও দাদাবাবু—উ—উ!'

হারুর চীৎকার থামবার সঙ্গে সঙ্গেই কাছাকাছি কোথাও থেকে বাদলের আবেগকম্পিত ভাঙাভাঙা স্বর ভেসে এল, 'হারু এসেছি—স্? আমি এখা—নে—এ—এ। এত দেরি কেনো—ও? আলো এনেছিস বুঝি?'

দূরবর্তী বাদলের সু-উচ্চ কণ্ঠস্বরে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হ'ল তাতে মনে করা যায়, যেন ঘোর দুঃসময়ে তার ত্রাণকর্তার দেখা পেয়েছে। যাই হোক সজ্ঞানে যে পাওয়া গেছে এই ভাগ্যি। ভেবেছিলাম, হয়তো বা স্থান-মাহাত্ম্যে মূর্ছাটুর্ছা হয়েই পড়ে আছে। আমারই তো ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করছে। কিন্তু একালের ছেলে ভাঙে তো মচকায় না।

'কী হে অবধূত বাবা?' ব'লে মুখের কাছে হ্যারিকেনটা তুলে ধরতেই বাদল চমকে উঠলো। তারপরই আমার আবির্ভাবের কারণ অনুমান করে চাপা গর্জন করে উঠলো, 'হেরো—শয়তান, বিশ্বাসঘাতক, স্পাই!'

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পরিধানে একখানি লালরঙের

বিলিতি কম্বল। সামনে নির্বাপিত-অগ্নি ধুনুচি, আর বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, একখানা মড়ার মাথার খুলি। যোগাসনাসীন বাদলকে দেখে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাইনে।

এই মশার কামড়, পেঁচার ডাক, শেয়ালের চীৎকার এবং অমাবস্যার রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে বাদলের মত অস্থির ছেলে বসে আছে কি করে এই আশ্চর্য!

খেয়ালের বাহাদুরি আছে। কিন্তু উঠে আসতে কি চায়? অনেক কষ্টে যখন গ্রেপ্তার করে আনলাম তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়-হয়।

পথে আসতে আসতে হারাধন একবার করুণ মিনতির সঙ্গে বলে, 'আর কতটা বাকী ছিল দাদাবাবু? আধসিদ্ধ হয়ে এসেছিল?'

'থাম্ স্টুপিড্। তোকে জানানোই ভুল হয়েছিল আমার। আর ওই হতচ্ছাড়া ধুনুচিটা—যতই জ্বালাতে যাই নিবে বসে থাকে। দু'শো জপ হয়ে গেল, আর আটশো বার হলেই হয়ে যেত। কিছুতে হ'ল না। "হুং হুং হৌং হৌং বষট্"—ব্যস এই তো!'

আমি অল্প হেসে বলে ফেলেছি, 'মাত্র আটশো বাকী? তবে তো সবই হয়ে গেছে। বাকীটুকু বাড়ী গিয়ে—'

আর যায় কোথা, ইংরিজিতে যাকে বলে 'বার্স্ট' করা!

'যাও যাও, আর সাউখুড়ি কোরো না ছোট্‌কা। বেশ কুম্ভীপাক নরকে পচে মরবে। আমার কি? সাধনায় বিঘ্ন করা মহাপাতক তা জানো? কত ষড়যন্ত্র, কত কাণ্ডকারখানা করে এত যোগাযোগ করলাম, সব পণ্ড হ'ল! একবার ভূতসিদ্ধ হ'তে পারলে 'শূন্যে ভ্রমণ' 'পাতাল পরিভ্রমণ' 'অদৃশ্য হওন' প্রভৃতি কী যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সব হ'তে পারতো! উঃ, আর কি সুযোগ হবে কখনো?'

আমি বলি, 'অদৃশ্য হওন'টা সম্বন্ধে সন্দেহ আমারও নেই, আর খানিক থাকলে মশাতেই অদৃশ্য করে ছাড়তো।'

'থামো ছোট্‌কা, তুমিই আমার জীবনের শনি চিরকাল জানি যে—'

আধসিদ্ধ বাদলের জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে ভরসা আর হয় না যে, আমার সম্বন্ধে কোনকালেও ওর মত বদলাবে।

চোর ধরা

'বেঁচে থাকার কোন মানে হয় ছোট্‌কা? মানে, আমাদের মতন লোকের?' আধখানা বিস্কুটে কামড় দিয়ে এই কূট-দার্শনিক প্রশ্নটি বাদল আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। হঠাৎ বাদলের জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারি না, ওকেই জিজ্ঞেস করি, 'কেন বল্ তো? পকেটে অর্থ থাকলে নেহাৎ অর্থহীন লাগে না তো কই?'

'ধেত্তারি তোমার পকেট। শুধু খাওয়া আর শোওয়া—কোন অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই।'

ওঃ তাই। মনে মনে হেসে ফেলে বলি, 'তাই বা নেই কেন, এই যে কাল ধুতি দু'জোড়া যোগাড় করা হ'ল, কম অ্যাডভেঞ্চার? খুড়ো-ভাইপোতে মিলে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো চুপি চুপি—'

'বাজে। আমার কিছু ভাল লাগে না।'

বাদলের কথাটা শুনে মায়া হ'ল। সত্যি, নেহাৎ সঙ্গীহীন বেচারা, অথচ আমার মস্ত দোষ আছে, বাইরের ছেলেদের সঙ্গে বেশি মিশতে দিই না, কারণ আমার দাদা-বৌদির ধারণা বন্ধুসংখ্যা বাড়লেই নাকি ছেলেরা সিগারেট খেতে শেখে। বোঝো ব্যাপার। তাঁরা তাঁদের আদরের মেয়েটিকে নিয়ে দিল্লী-সিমলে করে বেড়ান, পড়ার ছুতোয় ছেলেটি পড়েছে আমার ভাগে, কাজেই ওর সুখ-দুঃখ তো আমাকেই দেখতে হবে। ভেবে-চিন্তে পকেটের ওজনটা কিঞ্চিৎ হ্রাস করে একগাদা গল্পের বই কিনে এনেছিলাম। এবং এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, আমার পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

হঠাৎ একদিন বৌদির 'তার' এসে হাজির, 'স্টেশনে উপস্থিত থেকো, রওনা হচ্ছি।'

ছুটলাম। দেখি বৌদি আর বাব্‌লি, এবং ছোটয়-বড়য় এগারোটা সুটকেস।

ব্যাপার কি? না দিল্লীতে অসহ্য গরম পড়ে গেছে, অথচ এ বছর সিমলে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কাজেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি?

বললাম, 'কিন্তু দাদা? তাঁরও তো তা'হলে বেজায় কষ্ট এবার?'

বৌদি হি-হি করে হেসে উঠলেন, 'কি যে বল ঠাকুরপো, পুরুষমানুষের আবার কষ্ট!'

তা' হবে, পুরুষমানুষের বোধ করি কষ্ট হওয়া আইন নয়। যাক্, মোটের মাথায় বাব্‌লি আসায় আমি বাঁচলাম, বাদলের একটু সুরাহা হ'ল।

'কিন্তু সুটকেসগুলো সব এনেছ কেন বল তো? সমস্ত সংসারটাই এনেছ নাকি? পুরুষমানুষের কি জিনিসের অভাবেও কষ্ট হওয়া আইন নয়?'

'বাঃ, কি যে বল? আমার তো মোটে তিনটে সুটকেস, বাকি আটটাই বাব্‌লির। সবগুলোই নাকি ওর "ভীষণ দরকারী"—রাজ্যের বই কিনে বাড়ী বোঝাই করছে দিনরাত।'

নির্ভাবনায় আছি—ভাবছি এইবার নিজের লেখাপত্তরে ভালো করে মন দেব। তাই কাগজ-কলম নিয়ে গুছিয়ে বসেছি—সহসা বাব্‌লি আর বাদল এসে এমন একটা অদ্ভুত আবেদন করে বসলো যে আমার গল্পের পাত্রপাত্রী হোঁচট খেয়ে বসে পড়লো।

'একটা খরগোসের চামড়া যোগাড় করে দাও না ছোট্‌কা।'

'খরগোসের চামড়া? সে আবার কি জিনিস রে বাদলা?'

'খরগোসের ছাল গো, মানে যেমন বাঘের ছাল, হরিণের চামড়া—মানে আর কি, খরগোসের মাংসটা থাকবে না, শুধু ওপরের খোসাটা।'

মানে বুঝতে গিয়ে আরো অথই জলে পড়ে যাই। খরগোসের খোসা! কখনো শুনেছি বলে স্মরণ করতে পারি না।

বাব্‌লি অসহিষ্ণুভাবে বলে, 'তুমি বড্ডো দেরিতে বোঝ ছোট্‌কা। ধরো, কেউ যদি খরগোসের ছদ্মবেশ ধরতে চায়! কি করবে সে? একখানা ছাল না হ'লে চলে?'

হাতের কলম হাতে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, বুঝে উঠতে পারি না, বাংলা

ভাষা শুনছি না আর কিছু।

'ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দে দিকিনি আমায়, তোদের মাথার অবস্থা ভালো আছে তো? যে গরম পড়েছে—'

'গরমে আমাদের মাথা গরম হয়ে গেছে ভাবছো? মোটেই না। শোনো তাহ'লে বলি, তোমার ঘড়িচোরকে খুঁজে বার করবো আমরা।'

কয়েকদিন হ'তে কব্জি-ঘড়িটা পাচ্ছি না, কিন্তু চুরিই গেছে একেবারে, এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি, কোথায় রেখেছি হয়তো।

কিন্তু এরা বলে কি?

'শোন্ বাদল, আদ্যোপান্ত খুলে বল্ আগে, তারপর খরগোসের খোসা অথবা কাঠবেড়ালীর আঁটি যা চাস্—'

'তোমাকে আদ্যোপান্ত বোঝানো? হুঁঃ, আমার কর্ম নয়, তাছাড়া এসব হ'ল প্রাইভেট ব্যাপার।' বলে বাদল কলমটা তুলে চিবোতে শুরু করে।

অগত্যা বাব্‌লি। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো, কতক্ষণ পেটে কথা রাখবে? ও যা বললে, তার সারমর্ম এই যে, ঘড়ি সম্বন্ধে ওরা নতুন ঠাকুরটাকে সন্দেহ করেছে—সন্দেহ কেন নিশ্চিতই, শুধু হাতেনাতে ধরা একবার। কাজেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন! আর এমন ছদ্মবেশ, যাতে কারুর মনে কোনো সন্দেহ না আসতে পারে। ধরো, গভীর রাত্রে ঠাকুর যখন খিল-বন্ধ ঘরে নির্ভাবনায় চোরাই মালটি বার করে দেখবে, সেই সময়, হঠাৎ খরগোসরূপী বাদলের চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে তাকে ক্যাঁক্ করে চেপে ধরা, যাকে বলে বামাল সমেত গ্রেপ্তার।

সবই ঠিক। এখন শুধু দরকার ওই খরগোসের ছাল।

ক্রমশঃই সন্দেহ গভীর হ'তে থাকে।

কিন্তু দু'টো ভাই-বোনেরই একসঙ্গে?

অমন পরিষ্কার মাথা ওদের! উঁচু ক্লাসের অঙ্ক কষে দিতে পারে বাদল জলের মতন, ঝট্ করে মাথাটা বিগড়ে যাবে!

'মানুষে কখনো জানোয়ারের ছদ্মবেশ নিতে পারে? ভালো করে ভেবে দেখ।' বেশ সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি।

'মানুষে পারে না', বাব্‌লি বেশ আত্মস্থের সুরে বলে, 'কিন্তু ডিটেক্‌টিভ পারে তো? কী না পারে তারা? আর নাই যদি পারবে তা' হলে তো তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান হয়ে গেল। দরকার পড়লে অসাধ্য সাধনও করতে হয় যে ওদের।'

'তাই বলে আস্ত একটা মানুষ খরগোসের খোসার ভেতর ঢুকবে? পারবে ঢুকতে?'

করুণা আর অবজ্ঞার হাসি খেলে গেল বাব্‌লির মুখে। 'তুমি দেখছি কিছুই জান না ছোট্‌কা! জানবে কোথ্‌থেকে? ভালো ভালো বই তো কখনো পড়লে না? কী ছিরির বই কিনে দিয়েছ দাদাকে! আহা, শুধু পয়সা নষ্ট।'

লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাই।

'খুব বাজে বুঝি বইগুলো? কই বাদল তো—'

'দাদা আর কি বোঝে! তোমার হাতেই মানুষ তো।···সে বইটা কি রে দাদা?'

বাদলের রসনাকে ছুটি দিতে পারে একমাত্র বাব্‌লিই, কাজেই বাদল এতক্ষণ চুপ করেছিল, প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে বললো, 'কোনটা? ও? সেইটা? "আম আঁটির ভেঁপু"?'

'ভালো নয় বইটা?' আশ্চর্য হয়ে বলি, 'অথচ দোকানে ওই বইটার বেশি প্রশংসা শুনলাম।'

'শুনবে না কেন? বাজে জিনিস গছাতে পারলে কে ছাড়ে? যেমন নামের ছিরি, তেমনি বইয়ের ছিরি! অথচ কত ভালো ভালো বই রয়েছে···আচ্ছা ছোট্‌কা, "রহস্যের রক্তলীলা" পড় নি তুমি?'

'কই না তো!'

'"ভয়ঙ্করের তাণ্ডবনৃত্য?" "হত্যাস্রোতের মৃত্যুপাথার?" "যমরাজের ঝমঝমানি?"'

'কই কিছুই তো পড়েছি বলে মনে পড়ছে না!' লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারি না।

'"কুহেলিকা" সিরিজের কোনো বই পড় নি বুঝি?'

'উঁহু!'

বিস্ময়ে গোল চোখ আরো গোল হয়ে ওঠে বাব্‌লির।

'"গৌরীশঙ্কর সিরিজের"? তাও না? কোনো বই-ই পড় নি?'

'না তো! বড্‌ডো ভুল হয়ে গেছে দেখছি, দু'একটা যোগাড় করে দিস তো পড়ে দেখবো।'

'যোগাড় আবার কি! ফুল্‌সেট্‌ই তো রয়েছে আমার। সাতটা সুটকেসে তা'হলে আছে কি? একটায় তো শুধু কাপড়-জামা। কিন্তু তুমি কি অদ্ভুত ছেলে ছোট্‌কা? এদিকে তো সারাদিনই লিখছো, পড়ছো, ডিটেক্‌টিভদের বিষয়ে তা'হলে দেখছি কোন জ্ঞান নেই তোমার। মিস্টার ব্লেককেও চেন না নিশ্চয়!'

'মিস্টার ব্লেক? একটু যেন চিনি মনে হচ্ছে।'

'তবে? সেই "সাতফুট লম্বা দীর্ঘনাসা ভদ্রলোক" খর্বকায় চীনা বালকের ছদ্মবেশ ধরেন কি করে? বেঁটে মোটা কাফ্রি দস্যুদের দলপতির ছদ্মবেশ ধরে দেড় মাস তাদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন কি করে? দরকার পড়লে সবই করতে হয়—'

'আর আমাদের অতুল ভাদুড়ী'—বাদল এবার যেন সদ্য-খোলা সোডার বোতলের মতো ফুঠে ওঠে, 'ছাগলের ছদ্মবেশে হত্যাকারীকে ধরে ফেলল না? আস্ত একটা গোয়েন্দা—ছাগলের ছদ্মবেশ ধরলে দোষ হয় না—আর আমি এইটুকু ছেলে, তাও রোগা হয়ে গেছি আজকাল—খরগোস হ'তে চাইলেই দোষ? ঠাকুরের একটি পোষা খরগোস আছে বলেই না—'

'ওর পেটের মধ্যেই ঘড়িটা আছে কিনা কে জানে?'

বাব্‌লি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মৌলিক সন্দেহের কথা প্রকাশ করে।

'কিন্তু সেটা যে জ্যান্ত।' চেষ্টা করেও আমার অবিশ্বাসের সুরটা লুকোতে পারি না, ধরা পড়ে যাই।

'ওই তো ছোট্‌কা, সবেতেই তোমার অবিশ্বাস', বাদল বলে ওঠে, 'নিজের চোখের মধ্যে পুরানো দলিল লুকিয়ে রাখার কথাও হয়তো বিশ্বাস করবে না তুমি? শহরের সমস্ত বড় লোকের গুপ্ত কাহিনীর দলিল তিরিশ বছর ধরে ওইভাবে লুকিয়ে রেখে একটা দস্যু শেষকালে কী কাণ্ডটাই না করলো—'

'অন্ততঃ "মোহন সিরিজ"টাও যদি পড়ে রাখতে ছোট্‌কা!' বাব্‌লির স্বরে গভীর হতাশ্বাস।

আমার ওপর ক্রমশঃই ভরসা হারিয়ে ফেলছে ওরা।

'ছোট হয়েই হয়েছে আমাদের মুশকিল', বাদল সক্ষোভে মন্তব্য করে ওঠে, 'ডিটেকটিভ হ'তে হ'লে কত মাল-মশলা আর সাজ-সরঞ্জাম যে লাগে! ধরো তোমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর যদি অটোমেটিক ক্যামেরা ফিট করা থাকতো, ঘড়িটা নেবার সময়ই চোরের ফটো উঠে যেতো!'

'কিংবা পাপোশের নিচে একটা ইলেকট্রিক বেল্—'

'তুই থাম্ বাব্‌লি, আমাদের বাঙালী-বাড়িতে ওসব কোনো সুবিধেই নেই। একটা সায়েন্স ল্যাবরেটরি থাকলেও তো হোতো! এমন কি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের পর্যন্ত অভাব।'

আমার আদরের ভাইপো-ভাইঝির ম্লান মুখচ্ছবি দেখে—ভবিষ্যতে ক্যামেরা, পিস্তল, ল্যাবরেটরি, প্রাইভেট প্লেন, দুরবীন, গ্যাস মুখোস, প্রভৃতি ছোট-বড় অসংখ্য জিনিসের এবং বর্তমানে ওই খরগোসের চামড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি।

ডিটেক্‌টিভের খুড়ো হয়ে এটুকু অসাধ্য সাধন করতে পারব না?

কিন্তু অদৃষ্ট এমনি মন্দ—মানে আমার নয়, বাদল আর বাব্‌লির—ঘড়িটা বেমালুম পাওয়া গেল। সেলফে বইয়ের থাকের পেছনে নিজেই রেখেছিলাম কোনো সময়।

বাব্‌লি সক্ষোভে বলে, 'সত্যি যা বলেছিস দাদা, নেহাৎই বাজে বাড়িটা আমাদের, একেবারে রহস্যহীন। মেজে থেকে দেওয়াল পর্যন্ত আগাগোড়া ছোট্‌কার মগজের মতোই নীরেট। "সুড়ঙ্গ পথ" "পাতাল কক্ষ" বা "গুপ্তগহ্বর" এমন কিছুই নেই যেখানে রহস্যের নামগন্ধও আছে। তবু ঘড়িটা চুরি হয়ে অবধি একটু আহ্লাদ হচ্ছিল—'

'আহ্লাদ?' চমকে উঠি আমি।

'আঃ, ঘড়িটা তো আমরা উদ্ধার করতামই, মাঝে থেকে একটু এক্সপিরিয়েন্স হ'ত দাদার। বড় হয়ে তো গোয়েন্দাই হ'তে হবে ওকে।'

'আর এক্সপিরিয়েন্স, সাতজন্মে একটা চুরিও হয় না বাড়িতে!' বাদল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

কাটলো কয়েকদিন। ভাবছি সম্পাদকের তাড়াটা একটু কমলেই ওদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবো। অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্ কোনো ছবি আসুক কোনোখানে। ঘড়িটা খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত ভারী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছে বেচারারা! দুটি ভাই-বোনে খালি 'ফুস্‌ফুস্ গুজগুজ' কথা, বড়দের দেখলেই চুপ করে যায়।

হয়তো বা আমাদের নিন্দেই করে।

খুচরো কাগজগুলো পাতার নম্বর মিলিয়ে গুছিয়ে রাখছি—হঠাৎ বৌদি এসে কাতরভাবে বললেন, 'ছোট্ ঠাকুরপো শুনেছ? ঠাকুর পালিয়েছে।'

'তাই নাকি? কিছু নিয়েটিয়ে যায় নি তো?'

'নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে না, এখন রান্না চড়াবে কে? এই গরমে তো আর রান্না করতে পারে না মানুষ!'

বললাম, 'পাগল হয়েছ, তাই কখনো হয়? এবেলা পাঁউরুটি দিয়ে কাজ চালিয়ে দাও, ওবেলা বামুন ধরে আনবো অখন। কিন্তু ঠাকুরটা হঠাৎ গেল যে?'

'কি জানি? কাল রাত্রেও তো বেশ কাজকর্ম সেরে শুয়েছিলো, ভোরবেলা উঠে উনুনে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'উনুনে আগুন দিয়ে পালিয়েছে? রহস্যময় অন্তর্ধান বটে! দেখ দিকিনি, তোমার ছেলেমেয়েরা যদি এর থেকে কিছু সূত্রটুত্র আবিষ্কার করতে পারে।'

বলতে না বলতে ছেলেমেয়ে এসে হাজির। যাকে সাধু ভাষায় বলা চলে—রুদ্ধকণ্ঠ, আরক্তমুখ, উৎসাহে মাথার চুল প্রায় খাড়া হয়ে উঠেছে।

'দেখলে ছোট্‌কা, বলিনি আমি?'

'তুই থাম্ দাদা, আমি-ই আগে বলেছিলাম।'

'ফন্দিটা কে বার করেছিল?'

'আর লক্ষণ দেখে সাব্যস্ত করেছিল কে?'

ওদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ব্যাপারটা কি ?'

'বলিনি ঠাকুরটা চোর ? ওই যে "চাপা নাক, দৃঢ় চোয়াল, আর ঢালু মাথা"—সম্পূর্ণ অপরাধীর লক্ষণ ওটা।'

'কিন্তু চুরিটা কি করলো ?'

'কেন, বাব্‌লির হার।'

'বাব্‌লির হার ?' বৌদি শিউরে ওঠেন, চীৎকার করে ওঠেন, 'বাব্‌লির হার কোথায় পেলো সে ?'

'রান্নাঘরের তাকে রেখে দিয়েছিলাম আমি।'

'রান্নাঘরের তাকে হার রেখেছিলি বদমাইশ মেয়ে! রাখবার আর জায়গা পাস্ নি! খুলেছিলি কেন ? কখন খুলেছিলি ?'

. প্রহারোদ্যত মাতৃদেবীর কবল থেকে অনেক কষ্টে রক্ষা করি ওকে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই—"চাপা নাক আর দৃঢ় চোয়ালের" হাতাহাতি প্রমাণ না পেয়ে ওদের কিছুতেই শান্তি হচ্ছিল না, অথচ ঠাকুরটা এমনি চালাক যে দিনের পর দিন দিব্যি রান্নাবান্না চালাচ্ছে—একটা আলু-পটল পর্যন্ত চুরি করে না। এদিকে বাব্‌লিদের দিল্লী যাবার দিন এগিয়ে আসছে।

কাজেই ওদের উর্বর মস্তিষ্ক-যুগল কাজে লেগে যায়। রাত্রে চাকর রান্নাঘর ধোওয়া-মোছা করে শুয়ে পড়বার পর বাদল কৌশলে চাবিটা হস্তগত করে এবং মাঝ-রাত্রে দুই ভাইবোন চুপি চুপি উঠে চোর শিকারের আশায় টোপ ফেলে রেখে যায়।

হিসেবের ভুল ওদের হয় নি।

দরজার কড়ায় লাগানো ভেস্‌লিনের ওপর ডিটেক্‌টিভ-লোভন আঙুলের ছাপ এবং ঘরের মেঝেয় ছড়ানো পাউডারের ওপর বড় বড় পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে —নেই শুধু চোর আর চোরাই মাল।

ভাগ্যি যুদ্ধু বেধেছিল

"মানুষ মরণশীল" এ কথা কে না জানে? আমাদের দিগম্বর চাটুয্যেও জানতেন, কাজেই তিনি একদিন মনুষ্য-ধর্ম পালন ক'রে বসলেন। হায় রে, ভদ্রলোক যদি জানতেন, তাঁর মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াবে, তা'হলে একটু ভেবে চিন্তে মরতেন হয়তো।

কিন্তু কি ক'রেই বা জানবেন তিনি?

দিগম্বর চাটুয্যের শেষকৃত্য সেরে বাড়ী ফেরবার পথে বড় ছেলে পীতাম্বর ছোট নীলাম্বরকে হেঁকে বললো, 'এই নীলে! আস্তে চল্, পা চালাবি না, খবরদার!'

পীতাম্বর হোঁচট্ খেয়েছে খানিক আগে, কাজেই নীলাম্বর তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, দাদার ধমক খেয়ে থমকে বললো, 'কেন? আস্তে হাঁটবো কেন?'

'কেন জান না? আগে গিয়ে যে তাড়াতাড়ি বাবার সিন্দুকটি খুলবে সেটি হচ্ছে না।'

নীলাম্বর খিঁচিয়ে বললো, 'সিন্দুক খুলবো? চাবি কার কাছে শুনি?'

পীতাম্বর পৈতেয় আটকানো নিটোল চক্‌চকে লোহার চাবিটি উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে বললো, 'একটা তো আমার কাছে, বলি আর একটা?'

আর একটা অবশ্য নীলাম্বরই সময় বুঝে সরিয়েছিল, (দিগম্বর পাকা লোক, ডবল তালা দিতেন সিন্দুকে) কিন্তু স্বীকার করলো না। গোঁজ-গোঁজ ক'রে বললো, 'আমি কি জানি?'

'জানিস না তো হাওয়ায় উড়ে গেল নাকি?'

'আশ্চর্য কি? সামান্য জিনিস গোলমালে—'

'বটে? বাড়ী গিয়ে দেখাচ্ছি মজা। গোলমালে সব থাকলো—শুধু চাবিকাটিই উধাও?'

বাকা পথ আর কথা নেই।

বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম। পিতৃশোকে কাতর দু'টি ভাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন এসেছেন অনেকেই। এদের দু'জনকে বাড়ী ঢুকতে দেখেই সকলে 'আহা উহু' ক'রে উঠলেন।

কিন্তু 'অম্বর' ভ্রাতৃযুগলের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'নীলে!' রেগে বললো পীতাম্বর, 'ভালো চাস্ তো চাবি দে।'

নীলাম্বর দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে ব'সে পড়েছিল গুছিয়ে। গম্ভীর গলায় বললো, 'চাবি চাবি ক'রে মেলা দিক্ কোরো না দাদা!'

বরাবরই পীতাম্বর ছটফটে, নীলাম্বর সুস্থির।

ভাইয়ের এই নির্বিকার গোছের ভাব দেখে পীতাম্বর উঠলো জ্বলে। হাত-পা নেড়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, 'দিক্ করবো না? তার মানে? চাবি বার কর! এইসব পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে একটা ভাগ-বখরা হ'য়ে যাক!'

'ভাল কথা।' নীলাম্বর হাই তুলে তুড়ি দিলো।—'খুঁজে দেখ না চাবি।'

'নীলে, রেগে গেলে আমি কুরুক্ষেত্তর করবো বলে দিচ্ছি। এখনো রাগিনি তাই—'

'রাগো নি এখনো? আহা!'

নীলাম্বর হাত আড়াল ক'রে একটা বক দেখালো।

হাজার হোক পীতাম্বর দাদা! এতদূর সহ্য হয়? মানসম্ভ্রম নেই তার? পাঁচজন বাইরের লোকের সামনে ছোট ভাই বক দেখাবে?

'গোবিন্দ, শাবল আন্।' ব'লে হাঁক দিলো পীতাম্বর। সিন্দুক ভেঙ্গেই ফেলবে সে। এতক্ষণ ভদ্রলোকেরা 'হাঁ' ক'রে তাকিয়েছিলেন, এইবার 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠলেন।

'ছি ছি ছি, স্থির হও। এখুনি সিন্দুক ভাঙ্গাভাঙ্গি করে মানুষ? দিগম্বর দাদার কত যত্নের সামগ্রী! সিন্দুকটি ছিল তাঁর প্রাণতুল্য!'

'প্রাণই' গেল তার 'তুল্য'! মনে মনে ভাবলো পীতাম্বর। কিন্তু সিন্দুক খুলতে বিলম্ব করার ইচ্ছে তার মোটেই নেই। কে জানে কখন নীলে হতভাগা সিন্দুকের মাল সরিয়ে ফেলে।

গোবিন্দকে চাকর মনে করলে ভুল হবে, পীতাম্বরের বড় ছেলে সে। বছর দশ বয়স, চালাকের ধাড়ি। অর্ডার পাওয়ামাত্র চক্ষের নিমেষে একটা শাবল এনে হাজির করেছে। সত্যিকারের সিরিয়াস ব্যাপার দেখে আত্মীয় ভদ্রলোকেরা মান বাঁচিয়ে সরে পড়লেন, মজা দেখতে থাকলেন প্রতিবেশীরা।

পীতাম্বরকে শাবল নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে নীলাম্বর আর থাকতে পারলো না। যে গোঁয়ার পীতাম্বর, ঠিক ভাঙ্গবে সিন্দুকটা। কাজেই ট্যাঁক থেকে ছুঁড়ে দিলো চাবিটা। পীতাম্বর অগ্নিদৃষ্টি হেনে কুড়িয়ে নিলো।

হরি মধুসূদন! খোলা তো হ'ল এত সাধের সিন্দুক, আছে কি তাতে? চারটি তেলাপোকা, আর একগাদা পোকায় খাওয়া হিসাবের খাতার জন্যে এমন মারামারি কাণ্ড করছিল তারা? টাকার থলিগুলো কি উবে গেল নাকি? না তাদের বাবা দিগম্বর এতদিন ধ'রে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'রে এসেছেন? ছেলেদের যে সিন্ধুকের ত্রিসীমানায় আসতে দিতেন না, সে কেন? শুধু হিসেবের খাতার জন্যে?

উঁহু! টাকার বাজনাগুলোও কি বেবাক্ মিথ্যে? প্রায়ই কি শুনতে পেত না তারা গাদা গাদা টাকার ঝুনঝুন্ ঠুন্ঠুন্ মিঠে বুলি? ছেলেরা ঘুমিয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে দিগম্বর যখন দুপুর রাতে ঘরে খিল দিয়ে গুনে গুনে মিলিয়ে দেখতেন ঠিক আছে কিনা?

কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে 'হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠলো' গোছ চীৎকার ক'রে বললো পীতাম্বর—'নীলে, ভালো হবে না। টাকা দে।'

'দাদা, ভালো হবে না বলছি, টাকা বার করো।' নীলাম্বরও রুখে ওঠে।

'নীলে, খবরদার!'

'দাদা, সাবধান!'

'নীলে, ছোট ভাই ব'লে রেহাই দেবো না—'

শাবলটা তুলে নিলো পীতাম্বর।

'দাদা, বড় ভাই ব'লে কেয়ার করবো না।'

পাকা বাঁশের লাঠিটা বাগিয়ে ধরলো নীলাম্বর।

এরপর আর পড়শী ভদ্রলোকেরাও দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। যে যার সরে পড়লেন।

দু'জনেই যখন বীরদর্পে তাল ঠুকছে, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো দুই জা—নীলাম্বর আর পীতাম্বরের বৌ। বাইরের লোক দেখে এতক্ষণ বেরোতে পারছিল না তা'রা।

কিন্তু তাদের সৎ পরামর্শ কে নেয় তখন? মাথা বিগড়ে গেছে দুই ভাইয়েরই।

উঃ! সিন্দুক ভর্তি টাকার থলির বদলে চারটি তেলাপোকা দেখলে কারই বা মন না বিগড়োয়? দু'জনেরই ধারণা ফাঁক পেয়ে সরিয়েছে আর একজন।

পীতাম্বরের আস্ফালন আর নীলাম্বরের দাঁত কিড়মিড় দেখে ছোট ছেলে-মেয়েগুলো কান্না জুড়ে দিল ভয়ে। আর বৌরা কোমরে আঁচল জড়াতে শুরু করলো।

সত্যি তো আর খুন হতে দিতে পারে না লোক দু'টোকে? বিধবা হবারও তো ভয় আছে তাদের? নীলাম্বর যখন রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে তেড়ে এলো দাদাকে আর পীতাম্বর শাবল নিয়ে ভাইকে—তখন তো আর লজ্জা-সরম রাখা চলে না?

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বড়-বৌ শাবলটা কেড়ে নিয়ে ঘুঁটের মাচায় রেখে এলো আর ছোট-বৌ বাঁশের লাঠিগাছটা রান্নাঘরের কোণে। অগত্যা হাতের কাছে তেলোপোকাগুলোই সদ্ব্যবহার করতে বসলো পীতাম্বর। নীলাম্বর হাঁফাতে হাঁফাতে একটা বিড়ি ধরালো।

ঘরের মেজে ভর্তি করে মরা আরশোলা ছড়িয়ে, হাঁফিয়ে এসে ব'সে প'ড়ে পীতাম্বর বললো, 'নীলে, বিড়ি বার কর।

'নীলাম্বর দেশলাইটা পায়ের তলায় চেপে রেখে বললো, 'না, আজ থেকে সব আলাদা। দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত।'

গুম্ হয়ে ব'সে থাকলো পীতাম্বর কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'বেশ তবে মিস্ত্রী ডাকি।'

'মিস্ত্রী কি হবে?'

'কেন, পাঁচিল তুলবে বাড়ীতে!'

'এখুনি?' অবাক্ হয়ে যায় নীলাম্বর।

'নয় কেন? শুভস্য শীঘ্রম্।' মিস্ত্রীর সন্ধানে বেরোল পীতাম্বর।

বড়-বৌ বললো, 'ও মা, সে কি? কাল থেকে পেটে অন্ন নেই, একটু জল

মুখে দাও—'

পীতাম্বর ব'লে গেল, 'উঁহু, পাঁচিল তুলে তবে জলগ্রহণ।'

তা পীতাম্বরের যে কথা সেই কাজ। সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ীর উঠোনের মাঝখানে খাড়া এক পাঁচিল গাঁথিয়ে ফেলে সুস্থ হয়ে বসে জল খেলো পীতাম্বর।

নীলাম্বর শুধু শাসিয়ে রাখলো, সকালে উঠে গজকাঠি দিয়ে মেপে দেখবে। যদি এক ইঞ্চি কম-বেশী দেখে, পাঁচিল ভাঙিয়ে তবে জলগ্রহণ।

এরপর যা শুরু হ'ল—মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলা চলে—নন্-কো-অপারেশন। পীতাম্বর যদি পূবমুখো চলে তো নীলু পশ্চিমমুখো। পথ চলতে দেখা হলে একজন অপরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ও-ফুটপাথে উঠে যায়, বাসে ট্রামে দেখা হলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব'সে থাকে। নীলাম্বর যদি শার্ট গায়ে দেয়—পীতাম্বর পাঞ্জাবি, পীতাম্বর চিংড়ি মাছ কিনলে—নীলু ইলিশ। বাজারে চোখোচোখি হবার ভয়ে দু'জনে দু' বাজারে যায়। এক আত্মীয়ের বাড়ী নেমন্তন্নে যায় না দু'জন। সহযোগিতা বর্জ্জনের জ্বলন্ত নমুনা একেবারে!

পীতাম্বর ছেলেদের শাসিয়ে রেখেছে, 'এই, ও-বাড়ী যাবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করবো।'

নীলাম্বর মেয়েদের ধমকে রেখেছে, 'ও-বাড়ী গেলে মাথা গুঁড়ো করবো।'

ব্যাস্! কেউ কারুর মুখ দেখে না, নামই ভুলে গেছে হয়তো।

হঠাৎ এলো যুদ্ধের হুড়ো। রেঙ্গুনের দুর্দশায় কলকাতার লোক দিশেহারা, তালকানা। এমন ছুটোছুটি কাণ্ড লাগিয়ে দিল, যেন বোমা তাদের মাথার বালিশে, কি ভাতের থালাতেই পড়েছে!

কারুরই মাথার ঠিক নেই—এদের দু'ভাইয়েরই বা থাকবে কেন? তাদের দরজাতেও ঠ্যালা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর ভিড়। কারুর সঙ্গে তো বাক্যালাপ নেই, ছোট ছেলেমেয়েরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে যা তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনতে পারে।

পীতাম্বর বড় গিন্নীকে ডেকে বলে, 'ওরাও তা' হলে আজকেই চললো? কোথায় যাচ্ছে মনে হয়?'

বড় গিন্নী মুখ নেড়ে জবাব দেয়, 'ওদের আবার যাবার ভাবনা? ছোট-বৌয়ের

সাত-সাতটা বড়লোক মামা। আমার মতন পানা-পুকুর, দিনে শেয়াল, সাপখোপ, মশা-ম্যালেরিয়ার আড্ডায় কে যাচ্ছে বলো? আমার যেমন কপাল!'

নীলাম্বর ছোট গিন্নীকে শুধোয়, 'ওঁরাও শুনছি আজকেই পিটটান দিচ্ছেন। যাচ্ছেন কোথায়?'

ছোট গিন্নী হাত নেড়ে উত্তর করে, 'কি ক'রে জানবো? গণৎকার তো নই? দিদির তো বাপের বাড়ীই রয়েছে—যেতে পারেন। আমার মতন দুর্গতি কারুর হবে না। সাতজন্মে অজ পাড়াগাঁর মুখ দেখিনি—এখন সেখানে গিয়ে বাস করা! আমার যেমন বরাত!'

দিগম্বর চাটুয্যে বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে দেশে যেতেন—একলাই যেতেন। বেশ একটু টান ছিল তাঁর দেশের বাড়ীর ওপর। কিন্তু ছেলেরা জন্মেও ওদিক মাড়ায় নি। সেই সাপখোপ মশা-ম্যালেরিয়া পচা-রাস্তা পানা-পুকুরের ওপর তাদের দারুণ ভয়!

সকাল আটটার গাড়ীতে নীলাম্বর, আর বেলা এগারটার গাড়ীতে পীতাম্বর বাক্স-বিছানা মোটঘাট যত কিছু নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলেন। সেকেলে আমলের সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটা শুধু এক পেট তেলাপোকা নিয়ে গম্ভীরমুখে ব'সে রইল কলকাতার বাড়ীতে।

সাত মাইল রাস্তা গরুর গাড়ী চড়া—সহজ তো নয়! একেই বড় গিন্নী কাহিল মানুষ, চিঁ চিঁ ক'রে জানিয়ে রাখলেন বাড়ী পৌঁছে তিনি আগেই শুয়ে পড়বেন।

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, 'হুঁঃ, তা' আর নয়! কতদিনের মরচে পড়া কুলুপ ঝুলছে দরজায়, ভাঙতেই এক ঘণ্টা যাবে। এই তো সন্ধ্যে হয়ে এলো—সেই ঘাস-জঙ্গল সাপখোপের আড্ডায় ছেলেপুলে নিয়ে—'

গোবিন্দ দুঃখিত ভাবে বললো, 'আনন্দরা বেশ মজা ক'রে ভালো ভালো জায়গায় গেল—না মা?'

'দেশের চাইতে ভালো জায়গা কি আছে রে বাবা?' পীতাম্বর সান্ত্বনা দেয় ছেলেকে।

কিন্তু আগে থাকতে পীতাম্বরের দুঃখ লাঘব করতে, দরজা খুলে সামনের আগাছা সাফ ক'রে রাখলো কে? কে এমন হিতৈষী আছে পীতাম্বরের? ও বাবা!

উঠানের মাঝখানে হ্যারিকেনও জ্বলছে একটা! বড় গিন্নীর বিছানাটাও পেতে রাখে নি তো? কিন্তু কে জানে বাবা চোরটোর কিনা!

সাহসে ভর ক'রে পীতাম্বর আস্তে আস্তে ঢুকেই পড়লো—পিছতে পিছনে গিন্নী, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, সাধন, ভজন, রমা, শ্যামা, মুটে ইত্যাদি।

ঢোকার পর আর সন্দেহের কিছু থাকলো না—চোর নয়, ভূত নয়, স্বয়ং নীলাম্বর। ঘণ্টাতিনেক আগে এসে পৌঁছেছে। হায়! হায়! সাত-সাতটা বড়লোক মামাশ্বশুর থাকতে নীলেটাও এখানে এসে জুটেছে—বোমার ভয়ে? এখন উপায়?

অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বোধ হয় একটা গাছকেই উদ্দেশ ক'রে পীতাম্বর প্রশ্ন করে, 'এখন কে যাবে, কে থাকবে?'

নীলাম্বর পিছন ফিরে ব'সে বোধ হয় দেয়ালটাকেই উত্তর দেয়, 'কাল সকালের আগে তো ট্রেন নেই। অতএব উপায়ও নেই।'

অন্ধকারে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকে দু'জনে। শুধু ছেলেপুলে ক'টাই এতদিনের নিষেধ ভেঙে ফেলল। নীলুর ছেলেরা আগে এসেছে, কাজেই পীতাম্বরের ছেলেদের বাড়ীটা চিনিয়ে দেওয়া তাদের কর্তব্য নয় কি?

হঠাৎ গোবিন্দ ছুটে এসে পীতাম্বরকে ঠ্যালা দিয়ে ডাকলো, 'বাবা-বাবা—'

পীতাম্বরের ঘুম আসছিল ব'সে ব'সে, চমকে বললো, 'কি?'

'চল না ওখানে সিঁড়ির তলায়—'

পীতাম্বর উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে নীলাম্বরও।

এরপরে যা ঘটলো, বললে নেহাৎ বানানো গল্পের মত লাগবে, কিন্তু তা' ব'লে সত্যি কথা তো চাপা যায় না?

ছেলেরা সিঁড়ির তলার ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে টেনে বার করেছে প্রকাণ্ড এক পিতলের ঘড়া। সাবধানী দিগম্বর, নিজেই কোন ফাঁকে সিন্দুকের মাল সরিয়ে এখানে পুঁতে রেখে গেছেন। পাছে ছেলেরা খরচ ক'রে ফেলে।

ঘড়া-ভর্তি শুধু যে টাকা তা' নয়, আধাআধি গিনি। মেঝেয় ঢালা হ'ল সবগুলো।

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কোমরে হাত দিয়ে একপাক নেচে নিয়ে পীতাম্বর ব'লে উঠলো, 'নীলু রে—'

নীলু সুস্থির মানুষ, নাচলো না, শুধু বললো, 'দাদা গো—'

'ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল!'

'ভাগ্যি বোমা পড়েছিল!'

'তবে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলা হোক?' পীতাম্বর প্রশ্ন করে।

'আমারও তাই মত।' নীলাম্বর উত্তর দেয়।

পীতাম্বর ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে গিরীশ ঘোষের ভঙ্গিতে বললো, 'নীলু ভাই রে!'

নীলাম্বর দাদার কোমর জড়িয়ে ধ'রে শিশির ভাদুড়ীর ধরনে বললো, 'মাইডিয়ার দাদা রে!'

'নীলু রে, আমার বড্ড নাচ পাচ্ছে।' পীতাম্বর ব্যক্ত করে মনের কথা।

'দোহাই তোমার, নেচো না দাদা, বৌরা হাসবে।' নীলাম্বর সাবধান করে।

বৌদের নামে পীতাম্বর সামলে ওঠে, ভেবেচিন্তে বলে, 'সে দুটো গেল কোথায়? কোঁদল করছে না তো?'

'আশ্চর্য কি! মেয়েমানুষ বই তো নয়!'

যেন কোঁদল করাটা মেয়েমানুষেরই একচেটে।

ঠিক সেই সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় পাশাপাশি পা ছড়িয়ে ব'সে দুই গিন্নীতে মিলে ডজনখানেক গাছভাঙ্গা ডাঁসা পেয়ারার সদ্ব্যবহার করছিলো। ভাসুরকে দেখে ছোট-বৌ আধহাত জিভ কেটে একহাত ঘোমটা টেনে ঘুরে বসলো। বসলো অবশ্য বাকী পেয়ারাগুলো উদ্ধার করতে।

হাওড়া টু রিষড়া

'আবার বোমা বর্ষণ ! শত শত পল্লী বিধ্বস্ত, লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাতর আর্তনাদে বাতাস কম্পিত'—পড়ছেন সকালবেলা আপনার চায়ের টেবিলেই হোক, আর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসেই হোক (যে পোজিশনের লোক আপনি) গরম পেয়ালাটি হাতে।

টাট্‌কা কাগজের ভাঁজটি খুলে, খেলার আর সিনেমার পাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই মন দিয়েছেন যুদ্ধের খবরে। চক্ষু বিস্ফারিত, নিশ্বাস রুদ্ধ, চৈতন্য লুপ্তপ্রায়, কাজেই আপনার চা গেল জুড়িয়ে। অতএব পড়ার শেষে আর এক পেয়ালার আবেদন জানাতে হ'ল আপনাকে। ব্যস্।

কিন্তু অনুভব করেছেন কখনো, হাজার হাজার বোমা বর্ষণের শব্দ কী মারাত্মক ? লক্ষ লক্ষ নরনারীর আর্ত চীৎকার ধ্বনি কী মর্মান্তিক ? বোমাবিধ্বস্ত পল্লীর শোচনীয় দৃশ্য কী লোমহর্ষক ! করেন নি ? করবেন কোথা থেকে চোখে না দেখলে ? তবে হ্যাঁ, মোটামুটি আন্দাজ একটা আপনার আসতে পারে, যদি ছুটির আগের, মানে যে কোন ছুটির আগের, হাওড়া স্টেশন দেখবার পরম সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আপনার ঘটে।

ভেবে দেখুন—সেই ক্রুদ্ধ রুদ্ধ, তপ্ত দৃপ্ত, আর্ত উদাত্ত, রুক্ষ সূক্ষ্ম, ভয়াল করাল, বিশাল (বর্ণপরিচয়ের সব কটা বানান বসিয়ে দিন, খেটে যাবে) এবং "বঙ্গ বিহার উৎকল পাঞ্জাব মারাঠা রাজপুতানা" ইত্যাদির বিশাল যে প্রচণ্ড কণ্ঠ-কল্লোল উঠছে তাতে কি বাতাস কম্পিত হয়ে উঠছে না ? সেই জনসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে বিধ্বস্ত মানুষ, প্রাণটা না হোক—হারিয়ে ফেলছে না নিজের কাছা কোঁচা পাগড়ী দাড়ি, হাত পা নাক কান ? নিয়তির হাতে খেলার পুতুলের মত, অসহায় ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে না আপনাকে ভিড়ের হাতে ?

তবে ?

আর টিকিট কেনার সময়ের অবস্থা ? থাক্ সে কথা না তোলাই ভাল, মানে তুলে লাভ কি ? কতটুকুই বা বলতে পারবো আমি ? শুধু ট্রেনে চড়ার পর যখন বুকে হাত দিয়ে অনুভব করলাম হার্টটা সম্পূর্ণ ফেল করে ফেলি নি, তখন আশ্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে অন্য অবয়বগুলো মিলোতে বসলাম।

নাঃ, ঈশ্বরেচ্ছায় যেখানকার যা ঠিক ঠিকই আছে। মানে দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরোনোর দরুনই বোধ হয় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয় নি!

শুধু সিল্কের শার্টটা—আনকোরা নতুন ছিল, তা' থাক্, বাঁদিকের হাতাখানা আর পিঠের খানিকটা বাদে সবটাই তো রয়েছে, নতুনই রয়েছে। পিঠের চামড়া খানিকটা পিঠ থেকে হারিয়ে গেছে আন্দাজ করে কাতর হচ্ছিলাম। কিন্তু তা' হারায় নি, গেঞ্জির ভেতরই খুঁজে পাচ্ছি।

কবি ঠিকই বলেছেন, 'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু—'! হারাবার মধ্যে কোঁচার আগাটুকু, কিন্তু কী এমন দামী জিনিস ওটা ? আর কিই বা কাজে লাগে ঘামের সময় মুখ মোছা ছাড়া ? তার জন্যে তো রুমালই রয়েছে।

তেমনি পায়ের দিকে কিছু লাভই হ'ল বরং। এই তো দু'পায়ে দুটো চটি পরে এসেছিলাম—এখন দেখছি ডানপায়ে দিব্যি একপাটি গ্রাসিয়ান শ্লীপার! জিনিসটা দামী।

যাক্, গাড়ী তো 'ন স্থানং তিল ধারণং'। বাঙ্কে উঠে পড়াই শ্রেয়। উঠতে যাচ্ছিও—হঠাৎ দারুণ হোঁচট খেলাম। শারীরিক হোঁচট নয়, মানসিক। ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে 'মেণ্টাল শক্' বলে আর কি।

টিকিট সীতারামপুরের!

অবস্থাটা কল্পনা করুন—আপনি শ্রীরামপুর যাত্রী, যাচ্ছেন বোনকে আনতে। দুশ্চিন্তার মধ্যে—চেহারাখানা ঠিক নতুন কুটুম্ববাড়ীর উপযুক্ত কিনা এই। হঠাৎ দেখলেন হাতের টিকিটখানা নাম বদলে ফেলেছে! সীতারামপুর কোথায়, সে হতচ্ছাড়া দেশ পূবে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে তাই বা কে জেনে রেখেছে ?

মাথায় হাত দিয়ে পড়তাম—যদি পড়বার জায়গা থাকতো। কিন্তু জায়গার

অভাবে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলাম। কেউই লক্ষ্য করে নি আমার মৌখিক চেহারাটা, শুধু পাশের সেই ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ স্রেফ বুদ্ধির জোরে 'ন স্থানং তিল ধারণং' গাড়ীতে নিজের ডজনখানেক ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বেডিং, হোল্ডঅল্, খাবারের চাঙারী, জলের কুঁজো ইত্যাদির স্থান সঙ্কুলান করে নিয়ে সুস্থির চিত্তে সবে একটিপ নস্য নিচ্ছিলেন, প্রশ্ন করলেন, 'কি মশাই, কি হ'ল ?'

'হ'ল আমার মাথা, ভুল টিকিট দিয়েছে ব্যাটা! আর আশ্চর্যই বা কি, যা ভিড়, প্রাণটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট।'

'ফোঃ, ভিড় কোথা ? একে আবার ভিড় বলে নাকি ? ভিড় দেখতে চান তো লণ্ডনের এক-একটা টিউব স্টেশনের মুখে যান, বোমার হুজুগে—যাক্ সে কথা, কোথায় যাচ্ছিলেন ?'

'আজ্ঞে শ্রীরামপুর।'

'আরে ছ্যা, ছীরামপুরের টিকিট কিনতেই একেবারে "ইয়ে" করে ফেলেছেন ? হুঁঃ।' ভদ্রলোকের চোখমুখ আর গোঁফের ডগা দিয়ে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়লো যেন।

যেন হুগলী, শ্রীরামপুর, চুঁচড়ো, চন্দননগরের টিকিট কিনতে মোটেই ভিড় ঠেলতে হয় না, রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করেই বেড়াচ্ছে বুঝিবা! তবু লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম।—'আপনি ?'

'আমি ? বম্বে।' কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো বিশ্বের সমস্ত সম্ভ্রম আর গৌরব। মুখ আর তুলতে পারিনে।

'কোথাকার টিকিট দিয়েছে ?'

'আজ্ঞে, সীতারামপুরের। দশ টাকার নোট দিলাম একটা—তাড়াতাড়িতে চেঞ্জ নেওয়া হ'ল না, টিকিটটাও দেখে নেওয়া হ'ল না—কি যে করি!'

'কিচ্ছু ভাববেন না, দিয়ে দেবেন আমায়, পরের অসুবিধা দেখতে পারি না মশাই! গোছা গোছা টিকিট সঙ্গে রাখি। এই নিন রিষড়ের টিকিট একখানা—নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে নেবেন। সেবারে অমনি—যাক্ সে কথা।'

অভিভূত হয়ে গেলাম—বম্বে যাত্রী হয়ে, বালি আর উত্তরপাড়া, এখান আর

সেখানের গোছা গোছা টিকিট পকেটে মজুত রাখা—নিছক্ পরোপকারের খাতিরে—শুনি নি তো আজ পর্যন্ত।

'রিস্টওয়াচ আছে সঙ্গে? ঠিক সময় দেয়? দিন তো, আমারটার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।' দিতে হ'ল না, নিজেই খুলে নিলেন তিনি।

'আচ্ছা সাহস তো আপনার? এই ভিড়ে রিস্টওয়াচ—চাপ পড়লে বাপ্ বলিয়ে ছাড়বে! "ট্রেঞ্চে" থাকতে এসব জিনিস সঙ্গে রাখার আইন একেবারেই ছিল না, আমি আবার মশাই—'

কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো, না বলে থাকতে পারলাম না, 'যুদ্ধে গিয়েছিলেন নাকি?'

'কি বললেন? যুদ্ধে গিয়েছিলাম কিনা?' ভদ্রলোকের মুখে একটি রোমান্টিক্ হাসি ফুটে উঠলো।—'বলি এ যুদ্ধের গোড়াপত্তন করলে কে? পশু "ল্যাণ্ড" করেই আবার আজ বম্বে দৌড়ুচ্ছি কেন? যাক্ গে সে অনেক কথা। দেশের কি জানেন আপনারা? সুভাষ বোসের খবর রাখেন?'

'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো!'

'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! হুঁ, কেন যাচ্ছে না? সকলের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর এ-ই হাঁড়িটিতে!'

(চক্ষুলজ্জায় হাঁড়ি বললেন বটে, আসলে সেটি জালা ছাড়া কিছু নয়) 'হুঁ, কি বলছিলাম? খবরের কথা? কোন্ খবরটা চান? কাগজে সত্যি খবর কিছু বেরোয়? রাম কহো, ও তো "এলে বেলে" খেলা! এই যে হিট্‌লার হিট্‌লার করে মরছে লোকে, আছে সে এখনো? ফোঃ, মরে ভূত হয়ে জন্মালো এতদিনে! কফিন্ তৈরি হ'ল কার হাত দিয়ে? এ-ই শর্মা, রাতারাতি কাঠ চিরিয়ে তক্তা বানিয়ে···যাক্ গে, বলতে গেলে সে মহাভারত!

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, উঃ, কী লোককেই সহযাত্রী পেয়েছি! দু'হাতে তাঁর হাতখানি চেপে ধরে বললাম, 'ছাড়ব না মশাই, বলতেই হবে।'

'বলি তা'হলে—নেহাৎ যখন ছাড়ছেন না। দুটো পান খেয়ে "যুৎ" করে বসি তা'হলে—আছে নাকি?···নেই? তা থাকবে কেন? ইয়ংম্যান, রাণী উইল-

হেল্‌মিনা দিনে ক'টা করে পান খান তা' জানেন? পান সাজবার জন্যে বাঙালী ঝি রয়েছে আলাদা। সে যাক্ গে—সোনার বোতাম পরে ভিড়ের মধ্যে আসবেন না কখনো। যাচ্ছেন তো বোনের শ্বশুরবাড়ী, নিজের তো নয়, তার আবার সিল্কের শার্ট, সোনার বোতাম! ছ্যাঃ ছ্যাঃ রাবিশ! হ্যাঁ, কি বলছিলাম?'

'সেই যে হিট্‌লারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—'

'ও হ্যাঁ, হঠাৎ সেই রাইন নদীর ওপর তুষারপাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে কেমন অন্যমনা হয়ে গেছলাম—তারপর তো মশাই, সেই রাত্রে···'

ঠিক এই সময় ট্রেন রিষড়া স্টেশনে থামলো। ভদ্রলোক চকিতের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নেমে পড়ুন মশাই, নেমে পড়ুন, মোটে আধ মিনিট স্টপেজ, রদ্দি জায়গা!'

দরজা খোলবার আগে একরকম পাঁজা-কোলা করে জানলা দিয়েই ঠেলে দিলেন আমায়। ভালই করলেন। ট্রেন চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

পরক্ষণেই ভদ্রলোকের কী কাতর চীৎকার!—'ও মশাই! আপনার রিস্টওয়াচ যে আমার পকেটে রয়ে গেল, ছুঁড়ে দেব? ভেঙে যাবে যে! ঠিকানাটা কি আপনার? ···কি বললেন? তেরোর তিন দর্মাহাটা? গড়িয়াহাটা? গরাণহাটা? মুর্গিহাটা?··· আচ্ছা লোক তো, ঘড়িটা ফেলে রেখেই—'

শেষ বগীখানাও ঘস্‌ঘস্ শব্দে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল।

কি সর্বনাশ! আমার ঘড়ি? আমার অমন দামী ওমেগা ঘড়িটা? কিন্তু শুধুই কি ঘড়ি? সোনার বোতাম? যাক্ গে, পার্শেল করবার সময় ভদ্রলোক কি আর ওটার কথা ভুলে যাবেন? গল্পের শেষটা শুনতে পেলাম না এই আফসোস। বড্ড ভুল হ'ল। ঠিকানাটা জেনে নিলেই হ'ত!

বোড়ের চাল

উনিশ-শো তেতাল্লিশের পর থেকে কলকাতা শহরে, মানে টালার ওদিক থেকে টালিগঞ্জের এদিকের মধ্যে খালি বাড়ী দেখেছেন একখানাও? অর্থাৎ বাড়ীর মালিক যার দরজায় 'টু-লেট্' ঝুলিয়ে রেখে গেছে?

চারতলা? তিনতলা? দোতলা? একতলা? টিনের চাল? খোলার চাল? দেখেছেন? উঁহু, কোথা থেকে দেখবেন? 'টু-লেট্' কথাটা উঠেই গেছে যে একেবারে!

কোন গতিকে একটিবার যে যেখানে মাথা গুঁজতে পেয়েছে, সে আর নাকের ডগাটুকুও সরাচ্ছে না। সরাবেই বা কি করে? বাইশ লক্ষ মাথা গোঁজবার মত জায়গাটুকুতে যদি মাত্র বেয়াল্লিশ লক্ষ মাথা ঠেসে ঠেসে গুঁজে দেওয়া হয়, কারই বা সাহস হবে ঘাড়টা তুলে এদিক-ওদিক ফেরাতে? হয় না। আমারও হয় নি।

বাড়ীর অশেষবিধ অসুবিধা আর বাড়ীওয়ালার অপরিসীম অভদ্রতা হজম করেও টিঁকে ছিলাম, কিন্তু থাকা হ'ল না, মানে থাকতে দিলো না। নোটিশ দিয়েছে উঠে যেতে হবে।

তার মানে বাড়ীওয়ালার পূজনীয় বড়কুটুম্ব নাকি বাগেরহাট না বেগুসরাই কোথা থেকে যেন বদলী হয়ে আসছেন কলকাতায়, আর ভগ্নীপতিকে ঢালা হুকুম পাঠিয়েছেন বাড়ী খুঁজে রাখবার।

বুদ্ধিমান ভগ্নীপতিটি আবার খোঁজার দুর্ভোগটা নিজে না ভুগে আমার উপর নোটিশ জারি করলেন বাড়ী খুঁজে নেবার। সত্যিই তাঁর নিজের আস্ত একখানা বাড়ী থাকতে পরমপূজ্য শ্যালকপ্রবরকে তো আর কষ্ট পেতে দেওয়া যায় না? তা ছাড়া অসময়ে নিজের দরকারেই যদি না লাগলো, তা'হলে বাড়ী তৈরি লোকে করবেই বা কেন?

আমি কোথায় যাবো ? সে ভাবনা তো আর তাঁর নয় ?

এক মাসের নোটিশ পেয়েছিলাম, আগামী কাল নোটিশের শেষ দিন। গত চার সপ্তাহ ধরে আর কিছু করি নি, শুধু 'টু-লেট' দেখে ঘুরেছি, মানে বাড়ী খুঁজেছি। দিন রাত সকাল সন্ধ্যা উজবুকের মত ঊর্ধ্বমুখে রাস্তার দু'দিক পানে তাকাতে তাকাতে যাওয়া। সাইকেলের ধাক্কা, রিক্‌শা গাড়ীর খোঁচা, কলার খোসায় আছাড়, কিছুই গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু সবই বাজে হ'ল। বাড়ী নেই, খালি বাড়ী।

আজ শেষ দিন হতাশ হয়ে এসে শুয়ে পড়েছি, বৌদি এসে জিগ্‌গেস করলেন, 'ঘোল খাবে, না চা খাবে ঠাকুরপো ?'

বললাম, 'ঘোল আর খেতে চাই নে বৌদি, অনেক খাচ্ছি, বরং একটু চা-ই দাও।'

'ভালই হ'ল, ভোম্বোলও চা খেতে চাইছিল।'

'ভোম্বোল ? এসেছে নাকি ? কই সে ?'

'ওমা, সে তো কখন এসেছে ! এতক্ষণ মার সঙ্গে গল্প করে ছোট্ ঠাকুরপোর ঘরে গিয়ে বসেছে।'

ভোম্বোল শুধু আমার ভাগ্নেই নয়, একাধারে আমার বন্ধু, মন্ত্রী। বরাবর তার পরামর্শেই চলে এসেছি, কিন্তু ইদানীং মিলিটারীতে চাকরি নিয়ে যেন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। মাসখানেকর মধ্যে তার টিকিই দেখি নি।

বললাম তাকে আমার বিপদের কথা।

ধীরে সুস্থে এক পেয়ালা চা উদরস্থ করে, দ্বিতীয় পেয়ালা হাতে নিয়ে ভোম্বোল বললো, 'এই কথা ? এর জন্যে তোমার এত ভাবনা মামা ? হাসালে !'

'ভাববো না ? বলিস্ কি ? তোদের আর কি, পৈত্রিক বাড়ীটি আছে, গ্যাঁট্ হয়ে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিস, কত ধানে কত চাল খোঁজ রাখতে হয় না তো ? এই আঠারো জন মেম্বার আমরা—কোথায় যে যাবো—'

'যাবে আবার কোথায় ? যেমন আছো, তেমনি থাকো।'

'তারপর ?'

'তারপর আমি আছি'—বলে বুক ঠুকে উঠে দাঁড়ায় ভোম্বোল, 'সামান্য একটা

শালাকে আর ঠেকাতে পারবো না? তাও নিজের শালা নয়, পরের।'

'শালা কি সামান্য জিনিস হ'ল রে ভোম্বোল? সব চেয়ে মারাত্মক আর ভয়ঙ্কর যে—'

'তুমি বড় নার্ভাস মামা, নিজের শালা হলে যে তুমি কি করবে তাই ভাবছি! হয়তো ভয়ে ভয়ে রোজই নেমন্তন্ন করবে আর সিনেমা দেখাবে।···হ্যাঁ, তোমার বাড়ীওলার নাম-ঠিকানাটা?'

'ওই তো গলির মোড়ে এগারো নম্বর বাঁ-হাতি হল্‌দে বাড়ী। নাম? মনোতোষ মাইতি।'

'নাম বটে একখানা!'

... ...

বাড়ীতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ মানুষ যদি উপস্থিত না থাকে, আর আপনি থাকেন স্নানের ঘরে, সে রকম সঙ্গীন মুহূর্তে হঠাৎ যদি সদর দরজার কড়াটা দুর্দান্তভাবে নড়ে ওঠে—কড়্‌কড়্, কড়্‌কড়, ঝন্‌ঝন্, দুম্‌দাম্, কী রকম অবস্থা হয় আপনার? খুব সুখের নয় নিশ্চয়ই?

সে রকম একটি বীরত্বব্যঞ্জক কড়ানাড়ার দাপটে মনোতোষ মাইতি যদি আধভিজে গামছাখানিতে কোনো প্রকারে লজ্জা নিবারণ করে ছুটে এসে কপাট খুলে দিয়ে হাঁপাতে থাকেন, দোষ দেওয়া যায় কি? যায় না।

'এ বাড়ীতে মনোতোষবাবু থাকেন? মনোতোষ মাইতি?'

'আঁ—আঁগ্যে থাকেন বৈকি, মানে থাকি বৈকি, মানে—আমিই মনোতোষ—'

'মাই গড্, আপনি? মানে আপনিই বাড়ীর ওনার? মাপ করবেন, দেখে তো—যাক্ গে, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'আ—আমার সঙ্গে?'

খাকি-সুট-পরা লম্বা-চৌড়া জাঁদরেল চেহারার ভদ্রলোককে দেখে মনোতোষ যে মনে মনে খুব তুষিত হলেন তা বলা যায় না, খাকি দেখলেই ওঁর কেমন ভয় করে। তার ওপর যদি কেউ বলে বসে—'ক্যালকাটা পুলিস অফিস থেকে আসছি আমি'—তা হলে? মনোতোষের মুণ্ডু ঘুরে গেল···তবে কি পুলিস টের পেয়ে গেছে তাঁর ঘরের

তিরিশ মণ চালের খবর ? নাকি সেই বস্তাবন্দী কোরা কাপড়ের ? 'কালো বাজারে' বেচে 'লাল' হয়ে যাবার জন্যে কত কৌশলে যেগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে !

তাই তোতলা সুরে প্রশ্ন করে, 'পু—পু—পুলিস কেন মশাই ?'

'বাগেরহাটে আপনার কোনো আত্মীয় থাকেন ? মানে আপনার ভাই, কিংবা আপনার স্ত্রীর ভাই, অথবা—'

'আর "অথবা"র দরকার কি মশাই ? আমার আপন পরিবারের সাক্ষাৎ সহোদরই রয়েছেন যে—'

'আপনার বাড়ী থেকে চিঠিপত্র যাওয়া-আসা করে ?'

'তা করবে না ? বলেন কি ? বললাম যে সাক্ষাৎ সহোদর ?'

'বেশ, ভালো কথা, কিন্তু আপনার সেই সাক্ষাৎ সহোদরের অসাক্ষাতে একটি কথা জানিয়ে যাই—মাথামাখিটা তাঁর সঙ্গে একটু কমই করবেন।'

'কম করবো ? বরং আরো বেশী করবো বলুন !' হতবুদ্ধি মাইতি মহাশয় বলেন, 'ছিল বিদেশে, আসছে কলকাতায়—'

'কি করবো বলুন, এনার্কিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ যোগাযোগের খবর আমাদের কাছে এসেছে—'

'কি পার্টি বললেন ?'

'এনার্কিস্ট পার্টি।'

'সে আবার কি জিনিস মশাই ? "ডিনার পার্টি", "টি পার্টি", "সার্কেস পার্টি" এসবই তো জানি, শেতল পাটিও বুঝি, কিন্তু—উঁহু এরকম বিদঘুটে নাম তো কই শুনি নি কখনও ?' মনোতোষ হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

ক্যালকাটা পুলিস অফিসের কর্মচারী চড়াগলায় প্রায় ধমকের সুরে বলেন, 'শুনবেন কোথা থেকে মশাই ? জানেন তো খালি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব কষতে, আর ভাড়াটের গলায় ছুরি দিয়ে দেড়গুণ বাড়ীভাড়া আদায় করতে ! কিন্তু সাবধান করে গেলাম, মনে রাখবেন।'

পুলিস সাহেব গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে পিছনে পায়ের শব্দ। আর কেউ নয়, স্বয়ং মাইতি মশাই,

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছেন।

'ও সাহেব, বড্ড যে ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি!'

'কেন?'

'সে যে আসছে!'

'কে আসছে?'

'আমার সম্বন্ধী। মানে, ওই যেন কী পার্টির মেম্বার না কি?'

'হ্যাঁ, এনার্কিস্ট পার্টির। সরকারী চাকরি করে লুকিয়ে এইসব দলে যোগ দেওয়া যে কি ব্যাপার, বাছাধন টের পাবেন পরে। আসছেন তো কলকাতায়?'

'তাই তো বলছি মশাই, ও যে আমার বাড়ীতেই উঠবে!'

মাইতি মশাই যেন আর্তনাদ করে ওঠেন।

'বটে, তাই নাকি? ভালো ভালো! অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই এতে। আপনার সাক্ষাৎ শালা—যার নাম "বড়কুটুম্ব", আদর-আপ্যায়ন করে বাড়ীতে তুলবেন বৈকি! তবে কিনা, একসঙ্গে শ্রীঘর বাস করতে রাজী আছেন তো?'

মাইতি মশাই যেন ভয়ে ভাবনায় ভেঙ্গে পড়েন।

'সাহেব, আমাকে বাঁচান, ওসব শালা-ফালা বুঝি না, কি করতে হবে বলে দিন।'

'বলাবলির আছে কি? নিজেকে বাঁচাতে চান তো স্রেফ লিখে দিন, "বাড়ী খালি করিতে অপারগ। ভাড়াটিয়া ছাড়িতে রাজী নহে।"—ব্যস্। নিজে তো খালাস থাকলেন? তারপর তিনি বুঝবেন আর পুলিস বুঝবে।'

মাইতি মশাই ব্যগ্রভাবে বলেন, 'এখুনি লিখে দিচ্ছি মশাই, চিঠি কেন, টেলিগ্‌গেরাপ করে দিচ্ছি। কিন্তু—'

'আর কিন্তু-টিন্তু নয়, যান।'

'মানে আর কি, কথা হচ্ছে, পরিবার কি বলবে তাই ভাবছি। তার আবার সাক্ষাৎ সহোদর কিনা!'

পুলিস সাহেব রীতিমত চটে যান।

'বেশ তো মশাই, কে বলছে আপনাকে পরিবারকে চটাতে? শালাকে

বাড়ীতে রেখে মাছের মুড়ো খাওয়ান গে! মোটকথা, আমার যা বলবার বলে গেলাম, এর পর দোষ দেবেন না।'

মাইতি মশাই আর স্থির থাকতে পারেন না, পুলিস সাহেবের খাকি সার্টের হাতার কোণ চেপে ধরেন, 'দোহাই সাহেব, এই চললাম টেলিগ্‌গেরাপ করতে। কি বলবো মশাই, আমার ওই ভাড়াটেটি একের নম্বর শয়তান, তাড়াতে পারলে বাঁচি! কিন্তু কি করবো, "পার্টির" চেয়ে তো ভালো? সে-ই থাক্ চেপেচুপে।'

... ...

অতঃপর চেপেচুপেই থেকে গেছি। ভোম্বোল মাঝে মাঝে এসে বলে, 'দেখলে তো মামা, বোড়ের চাল? এক চালে বাজিমাত!'

বেঁচে থাক্ আমার ভোম্বোল, আর তার মিলিটারী স্যুট!

পায়স না পাদুকা?

জেঠামশাইয়ের দাবার আড্ডার প্রধান সদস্য বিরিঞ্চি হালদার হুঁকোটি হাতে নিয়ে চৌকাঠে পা দিয়েই তারস্বরে বলে উঠলেন, 'ওহে মুকুন্দ, খবর শুনেছ?'

ব্যস্, আমার পড়ার দফাটি গয়া! জেঠামশাই, আমি, আর বই—এই তিন রত্নের সংযোগ ঘটলেই কোথা থেকে যে ধুমকেতুর মত ইনি হাজির হন তাই ভাবি। অমনি জেঠামশাই তাকের উপর থেকে দাবার ছক পাড়তে পাড়তে বলেন, 'কি? চাল তিরিশ টাকায় উঠলো?'

'আরে রেখে দাও তোমার চাল আর কয়লা। পাড়ার খবর-টবর কিছু তো রাখবে না? খালি উদরের চিন্তা!'

কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায্য। চিন্তা যদি জেঠামশাইয়ের কিছু থাকে তো সে 'রাজা' 'মন্ত্রী' 'হাতী' 'ঘোড়ার', চাল-কয়লার মত তুচ্ছ জিনিস তাঁর চিন্তারাজ্যে

স্থান পায় না। হ্যাঁ, চৌকোশ লোক বটে এই হালদার মশাই। সারা পৃথিবীর বড় বড় খবর থেকে পাড়ার লোকের পোষা বিড়ালটার পর্যন্ত খবর তাঁর নখদর্পণে। আর সোনা থেকে নটে শাক পর্যন্ত কোন্ জিনিসের দর কখন কতটা উঠলো নামলো, তার হিসাব একমাত্র তিনিই দিতে পারেন মুখে মুখে।

প্রত্যহ চৌকাঠে পা দিতে দিতেই দরাজ গলায় শুরু করেন, 'আর শুনেছ কাণ্ড? চাল ছাব্বিশ টাকা ছ'আনা উঠেছে আজ, আতপ চাল একতিরিশ—বলি খাবে কি এরপর? খাবে কি?'

জেঠামশাইয়ের এ বিষয়ে বরাবরই ইন্টারেস্ট কম, তিনি ছকের উপর ঘুঁটিগুলো সাজাতে সাজাতে নিশ্চিন্তভাবে বলেন, 'খেয়েও তো যাচ্ছি ভায়া—দু' বেলাই তো খাচ্ছি। ও তুমিও যেমন—"জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি"—নাও এসো দু' হাত খেলা যাক্।'

হালদার মশাই হুঁকোয় আর দুটি 'সুখ-টান' দিয়ে বলেন, 'ও "তিনি"র আশা এ বাজারে ছেড়ে দাও, বুঝলে মুকুন্দচরণ, "তিনি" এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন? কেন দাবাটা শেখেন নি বুঝি?' অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করেন জেঠামশাই।

'কে শেখে নি দাবা? কি বলছো কি?' হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হালদার জেঠা।

জেঠামশাই অপ্রতিভ ভাবে বলেন, 'এই ভগবানের কথাই বলছি। এতটা সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করা—দাবা খেলতে জানলে—'

'তোমার মুণ্ডু আর মাথা! বলি পাড়ার খবর কিছু রাখো?'

'কই না তো?'

'তা রাখবে কেন? শিরিষ বসাকের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটা ফিরে এসেছে যে—'

'সত্যি নাকি? আহা বেঁচে থাক্—বাপ-মা মরছিল কেঁদে। যাক্, ভাল আছে তো?'

'ভালো? হুঁঃ!' বলেই হালদার মশাই আপন মনে হুঁকোয় টান দিতে থাকেন।

জেঠামশাইয়ের কৌতূহল থাক্ না থাক্, আমি একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

কারণ শিরিষ বসাকের ছেলে গৌর আমাদের খেলুড়ে। দু' এক বছরের বড় হয়তো হবে—সে ধর্তব্য নয়। হঠাৎ একদিন বাপের চটি জুতোর স্বাদ আস্বাদ করে সেই যে রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, এই দেড় বছরের মধ্যে তার আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। আমি খুব উত্তেজিত হয়ে বলি, 'কোথায় গেছলো? কবে এলো? কে খবর দিলো?'

'নিজেই এসেছে কাল রাত্তিরে। কি ছেলে কি হয়েছে হে, দেখলে অবাক হয়ে যাবে। এই বুকের ছাতি, খাকির পেন্টুলেন, খাকির শার্ট, লোহার টুপি, সে একেবারে দেখবার মতন!'

'যুদ্ধে গিয়েছিল?' জেঠামশাই প্রশ্ন করেন।

'তবে আর বলছি কি? ও তোমার ইরাক, ইরাণ, তোব্রুক্, 'ফোব্রুক্,' কিছু আর বাদ রাখে নি। হিট্‌লারের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করেছে, রোমেলের সঙ্গে চা খেয়েছে, আবার ইরাকের রাজবাড়ীতে ডিনার পার্টি পর্যন্ত করে এসেছে—উঃ, ছেলে বটে একখানা! রত্ন রত্ন! মা-বাপ সার্থক!'

আমিও অবাক হয়ে যাই, বলি, 'তবে ও কোন্ দলে ছিলো?'

'ওই বোঝ, বুদ্ধির জোরে সব হয়। তোমাদের মতন তো গোবরপোরা মাথা নয়? যাও দেখে এসো গে—ধন্য হয়ে যাবে।'

আমি জেঠামশাইকে টিপতে শুরু করি, 'আজ আর দাবা থাক্ জেঠামশাই, চলুন না যাই। দেখে আসি গৌরেকে।'

হালদার জেঠা ফোঁস্ করে ওঠেন, 'এই খবরদার, "গৌরে গৌরে" করিস নে। সে এখন কেওকেটা লোক, চিনতে পারলে হয় তোদের! মিলিটারীর কাজ সোজা তো নয়? তোমরা যেমন এক-একটি গাধা—'

হালদার জেঠা খবরের কাগজ পড়ে পড়ে যুদ্ধবিশারদ হয়ে উঠলেও আজ পর্যন্ত 'প্রত্যক্ষদর্শীর' দর্শন কখনও পান নি, কাজেই এত পুলকিত হয়ে উঠেছেন যে, কথার আর বাঁধন নেই। মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে হাসি নিয়ে গৌর-দর্শনে যাত্রা করি। দাবার আসর সত্যিই ভাঙে।

শিরিষ বসাকের বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য। দেখলাম আমরাই খালি

শুনি নি, পাড়ার সকলেই শুনেছে।···চারদিকে যত লোকের ভিড়, তার মাঝখানে গৌর চোখমুখ পাকিয়ে ওর সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার গল্প করছে।

'আরে ব্যস! সে কী শব্দ! কানের শির ফেটে যায়-যায়—আমি যাই মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে, তাই প্রাণ নিয়ে আবার ঘরে ফিরেছি—'

শিরিষ বসাক সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ওদিকে গৌরের পিসিমা আঁচলে চোখ মুছতে শুরু করেন।

হালদার মশাই বলেন, 'তোমার সেই ইরাকের রাজবাড়ীতে ডিনার পার্টির গল্পটা একবার এদের শুনিয়ে দাও তো বাপু—'

গৌর একবার আমাদের দিকে চেয়ে অমায়িক ভাবে হেসে বলে, 'সে আর এমন কি ব্যাপার হালদার জ্যাঠা? স্বয়ং মুসোলিনীই তো আমাকে—যাক্ গে সে কথা, আপনারা হয়তো ভাববেন বাজে চাল মারছি। হ্যাঁ, তবে ইণ্ডিয়ানদের খাতির আছে ওদিকে। যাক্ গে, বিপদের গল্প শুনুন দু-একটা। রোমেলের তাঁবু থেকে পালিয়ে এসে তো সারাদিন লুকিয়ে থাকলাম একটা ভাঙা কামানের খোলের ভেতর। তখনও গরম রয়েছে সেটা। কী তাত, গা ঝলসে যায়! যাক্, রাত হলে তো বেরোলাম। নদীতে একখানি খেয়া-বোট পর্যন্ত নেই। কি করি, "জয় মা কালী" বলে পড়লাম জলে ঝাঁপিয়ে। পাক্কা উনিশ মাইল সাঁতরে উঠলাম একটা জায়গায়—অজ পাড়াগাঁ—রং ফরসা হলে কি হবে, লোকগুলো একেবারে বুনো! আমাকে দেখে কাটতে যায় আর কি! দেখলাম ভালো মুশকিল, যুদ্ধ করে মরি সে একরকম, তা বলে ফর-নাথিং কতকগুলো বুনো লোকের বল্লমের খোঁচা খেয়ে মরবো কেন? মাথায় বুদ্ধি এলো, ঊর্ধ্ববাহুর মতন দু' হাত তুলে বলতে শুরু করলাম, "আই অ্যাম্ এ গান্ধী ম্যান!" ব্যস্, সব যে যার অস্তর-শস্তর গুটিয়ে নিলো। তারপর সে কী খাতির! এর বাড়ী নেমন্তন্ন, ওর বাড়ী নেমন্তন্ন! তবে ওদের খাওয়া-দাওয়াগুলো বিট্‌কেল কিনা—কাঁচা শূয়োরের মাংস একটু আগুনে ঝলসে নিলো, তাতেই একটু নুন-মরিচ, হয়ে গেল মস্ত ঘটার খাওয়া। পিসির হাতের থোড়ের ঘণ্ট আর ভাজা মসলার সুক্তো মনে করে চোখে জল আসতো।'

এই সময় পিসি একবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন।

আমি অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলাম, এই সুযোগে বলে নিলাম, 'দেশটা কি রে?'

'কি জানি ছাই, ওদের ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি নামগুলো মনেও থাকে না। গোটা পঞ্চাশ অক্ষর জুড়ে প্রকাণ্ড একটা কি শুনেছিলাম যেন। তারপর একখানা জাহাজের কাপ্তেনের খোশামোদ করে এদিকে তো এসে পড়লাম, সিলোনের ওদিকে পড়ে গেলাম নাক-খ্যাঁদাদের হাতে। "নাক-খ্যাঁদা" অর্থে জাপানী বুঝতেই পারছেন! সেখান থেকে সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা—সে এক মস্ত ইতিহাস, আর একদিন হবে। একটু টায়ার্ড আছি—'

অমনি পাড়ার সব কর্তারা—বিনোদ খুড়ো, সতীশ কাকা, নিবারণ মুখুয্যে, দত্ত ঠাকুর্দা, হরি পাল, ছিরু আচায্যি হৈ-হৈ করে উঠলেন, 'আহা আহা, তাই তো তাই তো, মরে যাই, আর একদিন হবে, আর একদিন হবে—কিন্তু বাবা, এবেলা আমার ওখানে দু'টি ভাত খেতে হবে—'

'সে কি কথা সতীশ, আমি যে সমানে ভাবছি আমার বাড়ীতে—'

'তাও কি হয় ছিরু, আমি পুকুরে জাল ফেলবার অর্ডার দিয়ে আসছি·····গৌর, তুমি রুইমাছের কি কি ব্যঞ্জন ভালবাসো বল তো—'

'বল কি মুখয্যে? তোমার বাড়ী সে তখন কাল খাবে—আজ ওর "দত্ত ঠাকুরমার" কাছে দু'বেলাই নেমন্তন্ন, তিনি এতক্ষণ রেঁধেবেড়ে আশা করে বসে আছেন। বলেন, "গৌর আমার কুমড়ো ফুলের বড়া বড্ড ভালবাসে, দুটো সংগ্রহ করে এনো—মচমচে করে গরম গরম ভেজে দেব"—'

তাঁতীর ছেলে গৌরমোহনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি একেবারে! হিংসেও হ'ল একটু। অথচ এই সেদিনই যেন দত্ত ঠাকুর্দা বিনোদ খুড়োকে বলছিলেন, 'ছোঁড়াটা বিদেয় হয়েছে, না আপদ চুকেছে! অমন ছেলের জন্যে আবার মা-বাপের কান্না! পাড়ার লোকের হাড় জুড়িয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু শিরিষ বসাক এই অপূর্ব কলহের নিষ্পত্তি করলেন জোড়হাত করে, 'কিছু মনে করবেন না আপনারা, এতদিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে, দুদিন বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া না করলে বাড়ীর মেয়েরা ক্ষুণ্ণ হবেন—'

'তা বটে, অতি সত্য কথা, অতি ন্যায্য কথা—কিন্তু কবে তোমার সুবিধে হবে বাবা গৌর ?'

গৌর বিনয়ে গলে গিয়ে বলে, 'ও কথা বলে অপরাধ বাড়াবেন না। যেদিন ডাকবেন যাবো—এখনো তো আছি দিন পনের।'

'মোটে পনের দিনের ছুটি ?' আমি প্রশ্ন করি।

'হ্যাঁ। ওই দেবে না—নেহাৎ বলে কয়ে·····মিলিটারীর আইনকানুন ভারী কড়া কিনা—'

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম গৌরকে। আশ্চর্য! সেই মুখ-চোখ, সেই নাক-কান, অথচ যেন আর কে! আমাদের 'গৌরে' বলে ডাকবারই সাহস হয় না।

ধন্য যুদ্ধ! ধন্য মিলিটারী! ধন্য খাকির পোশাক! ধন্য লোহার হেলমেট!

সবাই চলে গেলে চুপি চুপি বলি, 'এবার আমায় নিয়ে যাবি গৌরে ?'

'কোথায় ?' বলে গৌর হাসে।

'কেন, যুদ্ধে ?'

'পাগল না খ্যাপা! তুইও ওই সব ভাঁওতা বিশ্বাস করছিস নাকি ?'

'বিশ্বাস করবো না মানে ? তুই যাস নি যুদ্ধে ?'

'কস্মিনকালেও না। দিব্বি চাল্ মেরে আদর কুড়িয়ে নিচ্ছি। বাবা বলেছিল, বাড়ী ঢুকলে জুতোপেটা করবে, সেই বাবা এখন—'

'তা হলে এসব মিথ্যে ? কী সাংঘাতিক! এত চাল্ দিতে শিখলি কি করে ?

'চিরকালই জানি। আগে কেউ বিশ্বাস করতো না, এখন বেদবাক্য! "গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না", তাই দুদিন ঘুরে এলাম কলকাতায়।'

'তাহলে এইসব খাকি সুটটুট্ ?'

'সিভিক গার্ড হয়েছিলাম যে! পোষাল না, কেটে পড়লাম। তা বলে যেন হাটে হাঁড়ি ভাঙিস নি। তুই বন্ধু মানুষ, তাই বললাম।'

এখনো তো পনের দিন হয় নি। গৌরে জামাই-আদরে আজ এর বাড়ী, কাল

ওর বাড়ী, নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছে। জানি না, কাল পূর্ণ হলে ওর কপালে কি আছে!

পায়স, না পাদুকা?

ঝক্‌মারি

বেশ ছিলাম বাবা! খামকা এক অনাসৃষ্টি যুদ্ধ বেধে যেন সৃষ্টিটা তোলপাড় ক'রে তুলছে। সারা পৃথিবীতেই একটা 'সাজ সাজ' রব প'ড়ে গেছে। যুদ্ধে যাচ্ছে যারা তারা তো সাজবেই—বাকী লোকেরও কি দুর্ভোগ কম? সাজের ধুম প'ড়ে গেছে একেবারে।

বোমার ভয়ে লোকে ছুটোছুটি ক'রে মরছে হরদম। পূবের লোক দৌড় দিচ্ছে পশ্চিমে, পশ্চিমের লোক ছুটছে দক্ষিণ লক্ষ্য ক'রে, দক্ষিণের লোক আবার পূবটাকেই নিরাপদ জ্ঞানে সেইদিকে ধাওয়া করছে—এমনি সব জগাখিচুড়ি কাণ্ড!

ব্রহ্মদেশ থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে আসা যায়, আসা সম্ভব—কে কবে কল্পনা করেছে? লোকের নাজেহাল কাণ্ড দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম, একটি পা-ও নড়ছি না কোনখানে। নির্দয় বোমা যতক্ষণ না নেমে এসে মাথায় 'গোঁত্তা' মারছে, ততক্ষণ বেঁচে থাকা আটকায় কে?

সোজাসুজি ব'সে থাকি কলকাতায়, জমানো টাকাগুলো খরচ ক'রে আয়েস করি, ধার ক'রে খাই, ব্যস্—মরে গেলেই তো মিটে গেল ঝঞ্ঝাট। সেই সব বাক্স-বিছানা, মোট-ঘাট, লট-বহর ইত্যাদি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার মনে করলেই যেন হৃৎকম্প শুরু হয়।

শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, দেশভ্রমণ তো দূরের কথা, হাওড়া স্টেশনে কাউকে 'সি অফ্' করতেও যাই নি কখনও। ইস্টিশন মনে করলেই গায়ে জ্বর আসে আমার। কি ক'রে যে লোকে একটা দেশ থেকে ঘর-সংসার উঠিয়ে নিয়ে

আর একটা দেশে সংসার পাতছে বুঝে উঠতেই পারি না।

কাজেই 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' গোছের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বসেই ছিলাম কলকাতায়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই 'দেশে' যাবার আগে সুপরামর্শ দিয়ে গেছে, কানেই তুলি নি। 'কাল' করলো রেঙ্গুন থেকে গিন্নীর এক ভাইপো এসে।

বোমা-বর্ষণের লোমহর্ষণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে, কি রকম ক'রে যে হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ের তলার চামড়া উড়ে গিয়ে শুধু হাড় আছে, খাদ্যাভাবে নাড়ি-ভুঁড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে শুধু পেট আছে, আর ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে একটি হ্যাফ্‌প্যাণ্ট মাত্র অবশিষ্ট আছে, তারই বিশদ বর্ণনায় বাড়ীসুদ্ধ লোকের নাড়ি ছাড়িয়ে দিয়ে গেল এবং কলকাতায় থাকলে যে একদিন আমাদেরও সেই অবস্থা হ'তে পারে, সে-কথা বোঝাতেও চেষ্টার ত্রুটি করলো না।

শেষ পর্যন্ত বাড়ীর লোকেই আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে বাড়ীছাড়া ক'রে ছাড়ল। মানে (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে), এগারোটি সন্তান-সন্ততি, দুটি অপোগণ্ড ভাইপো, তিনটি অনাথা ভাগ্নী, অথর্ব দিদিমা, বদ্ধকালা পিসী, বিধবা দিদি, আর সধবা গিন্নী। একযোগে সকলে এমন ভাব দেখাতে শুরু করল—যেন ওদের প্রাণবধ করবারই একান্ত ইচ্ছা আমার।

সহ্য হ'ল না। সব ভয়-ভাবনা ছেড়ে যাবার জন্যই প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যাই কোথা? 'সাতপুরুষের ভিটে' বলতে যা বোঝায়, সাতজন্মেও সেখানে যাওয়ার পাট নেই। গভীর গণ্ডগ্রাম—দিনেরবেলায় শেয়াল বেড়ায়, রাস্তাঘাটে যখন-তখন সাপেরা হাওয়া খেতে বেরোয়।

কাজেই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একটি নির্ঝঞ্ঝাট দেশ আবিষ্কার করলাম। নামটিও ভাল—বিষ্ণুপুর। আপিসের এক ভদ্রলোকের শ্বশুরবাড়ী সেখানে, তিনিই চিঠিপত্র লিখে একখানি বাড়ী ঠিক করিয়ে দিলেন। মস্ত বাড়ী—বারোখানা ঘর, দালান, উঠান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য সময় টাকা পনের ভাড়া হ'ত বাড়ীটার, যুদ্ধের বাজারে 'কিছু' বাড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকায় তুলেছেন বাড়ীর মালিক। যাক কি আর করা যাবে? তিন মাসের ভাড়া হিসাব ক'রে একশো পঁয়ষট্টি টাকা মনি-অর্ডার ক'রে রসিদটি যত্নে তুলে রেখে

দিয়ে শুরু হ'ল সেই 'সাজ সাজ' কাণ্ড—যা দেখে এতদিন হৃৎকম্প হ'ত আমার।

সংসার করতে হ'লে যে এত জিনিসের দরকার হয় বা সংসারে যে এত জিনিস থাকে, এতদিন জানাই ছিল না। ছিলই বা কোথায় এই এক জাহাজ মাল!

ষোলটা ট্রাঙ্ক, ছটা সুটকেস, আটটা বেডিং, পাঁচটা বেতের ঝাঁপি, দুটো হোল্ড-অল্, আর চারহাত লম্বা-চওড়া একটা প্যাকিংবাক্স নির্দয়ভাবে ঠেসেও দেখা গেল প্রায় অর্ধেক জিনিসই বাইরে পড়ে।

এইসব বালতি, হ্যারিকেন, ঘড়া, পিলসুজ, শিল-নোড়া আর কুলো-ডালা জাতীয় জিনিসগুলো যে কিসের ভেতর ঢুকিয়ে কিভাবে নেওয়া যায়—ঈশ্বর জানেন সে-কথা! অথচ প্রত্যেকটি দ্রব্যই নাকি ভয়ানক দরকারী—ভাঙা কড়া থেকে ফুটো এনামেলের কাঁসি পর্যন্ত। হবেও বা।

ছেলেমেয়েদের তো জীবনেও যেসব বইতে হাত পড়ত না, সেই সব বই-পত্তরগুলো হঠাৎ এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল যে, প্রত্যেকেরই আলাদা একটি ক'রে পুঁটুলি! বই, খাতা, পেন্সিল, ফাউন্টেন পেন, পেপারওয়েট, ব্লটিং প্যাড—কিছুটি বাদ দেওয়ার জো নেই।

এর ওপর আবার লুচির ঝোড়া আর মিষ্টির হাঁড়ি। রাত্রে গিয়ে খেতে হবে তো? কে আর ভাত বেড়ে বসে আছে সেখানে?

দুটো ঠেলাগাড়ীতে মাল আর তিনটে ঘোড়ারগাড়ীতে মানুষ বোঝাই দিয়ে যখন হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন এক বিরাট সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি, চলেছি রণক্ষেত্রে শত্রুর উদ্দেশে!

কি উপায়ে যে সেই বাহিনীকে সামলে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম, সে আর বলতে চাই না, দুঃখের স্মৃতি চাপা দেওয়াই ভাল। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ী উদ্ধার ক'রে ডাকাডাকি করতেই বাড়ীওলা বেরিয়ে এলেন, একটু দেঁতো হাসি হেসে বললেন, 'ও আপনি, আপনারই আসার কথা ছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন দেখিয়ে দিন বাড়ীর কোথায় কি ব্যবস্থা। ভাল কথা, হোয়াইট ওয়াশ করিয়েছিলেন তো?'

'হোয়াইট ওয়াশ?' বলে ভদ্রলোক এমন ক'রে চোখ কপালে তুলে তাকালেন,

মনে হ'ল বুঝিবা চীনে ভাষা শুনলেন।

বিরক্তভাবে বলি, 'হ্যাঁ হোয়াইট, ওয়াশ, সাদা বাংলায় যাকে বলে—চুনকাম করা।'

'সে তো বুঝলাম, বলি "হোইটোশ" করার কথা ওঠে কেন মশাই? "হোইটোশ" আমি কস্মিনকালেও করি না। বাপ-পিতেমো যেমন রেখে গেছেন ঠিক তেমনটি আছে।'

'বাঃ চমৎকার, পূর্বপুরুষের ওপর ভক্তি অচলা দেখছি! তা যাক, ধোয়ানো আছে তো বাড়ীটা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, ধোয়ানো, উনুন পাতানো সব ঠিক। আমি মশাই সেরকম লোক নই—' বলে ভদ্রলোক সদর-দরজাটা আর একটু চেপে দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা তা' হ'লে সরুন, মেয়েরা ঢুকবেন,'

মেয়েরা ইতিমধ্যেই গাড়ী ছেড়ে রাস্তায় নেমেছেন।

ভদ্রলোক কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, 'বিলক্ষণ, আসবেন বই কি, তা ভাড়ার রসিদটা?'

'ভাড়ার রসিদ!'

এইবার চোখ কপালে তোলার পালা আমার।

'ভাড়ার রসিদ আবার আনতে হয় নাকি? আমাকে কি "আমি" নয় বলে সন্দেহ হচ্ছে আপনার? আমি দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে, নগদ করকরে একশো পঁয়ষট্টি টাকা পাঠালাম—এখন এসব কি গোলমেলে কথা?'

'কথা অতি সরল—দুর্গা বাঁড়ুয্যের টাকা, রসিদ দিয়েছি আমি, সবই সত্যি। কিন্তু আপনিই যে দুর্গা বাঁড়ুয্যে, সেইটির প্রমাণ পেলেই মিটে গেল গোলমাল।'

আমি যে "আমি" তার প্রমাণ এখন কি ক'রে দিই তা বল তোমরা। সেজ ছেলেকে ডেকে তেড়েমেড়ে বলি, 'হ্যাঁ রে কেষ্ট, আমার নাম কি?'

'তোমার নাম?'

এবার কেষ্টর পালা চোখ কপালে তোলার।

'হ্যাঁ খোকা, বল তো তোমার বাবার নামটি?' অমায়িক হাসি হাসেন ভদ্রলোক।

'বাবার নাম? বাবার নাম তো তিনু।'

দিদিমা আর পিসিমা আমাকে যে হতচ্ছাড়া নামে ডাকেন চিরকাল, হতভাগা ছেলে সেই নামটাই বলে বসে।

'বেশ বেশ। "তিনু"? তিনকড়িই হবেন বোধ করি?' বলে ভদ্রলোক আবার সেই দেঁতো হাসি হেসে, দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে শিকল তুলে দেন।

ভয়ানক চটে যাই। ঠাস্ ক'রে কেষ্টর গালে একটা চড় বসিয়ে বলে উঠি, 'মশাই, দোর খুলুন শিগ্‌গির, ভাল হবে না বলছি, এটা ইয়ার্কির সময় নয়।'

'নয়ই তো। আমিও তো তাই বলছি—মানে মানে সরে পড়ুন এখন।'

'কক্ষনো যাব না—দেখি কি ক'রে আটকান? তিন মাসের ভাড়া গুনে দিয়েছি—এ বাড়ী এখন আমার।' বীরবিক্রমে এগোতে যাই।

ভদ্রলোক চট ক'রে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চাবি-কুলুপ বার ক'রে দরজার কড়ায় লাগিয়ে চাবিটি ফতুয়ার পকেটে ফেলে বলেন, 'আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ তালাটা ভাঙুন, আমি পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে আনি।'

বলে কি লোকটা? মারবে নাকি? এবার বীরত্ব ছেড়ে কাতরভাবে বলি, 'এই মোট-ঘাট নিয়ে মেয়েছেলেদের নিয়ে আমাকে এখন কি করতে বলেন?'

ওদিকে গাড়োয়ানরা 'সোয়ারি' নামিয়ে ভাড়ার জন্যে তারস্বরে চীৎকার করছে, আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা মালপত্র রাস্তায় ফেলতে শুরু করেছে।

বাড়ীওলা ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলেন, 'সে কি কথা, মা-লক্ষ্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? আমার বাড়ীতে চলুন না। ঘণ্টাখানেক বসে জিরিয়ে নেবেন, সাড়ে পাঁচটায় একটা ফিরতি ট্রেন আছে।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। যাক্ আমার দু'শো টাকা জলে, এ ছোটলোকের বাড়ী থাকা নয়। তড়বড় ক'রে ফিরে গিয়ে বললাম, 'এই গাড়োয়ান, সোয়ারি তোল।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগে গেল।

গিন্নী ঘোমটা খুলে ভীষণ রাগারাগি শুরু করলেন। দিদি তেড়ে এলেন। পিসিমা বকবক করছেন, দিদিমা ভাঙা কোমর নিয়ে দাঁড়াতে রাজী নন বলে মাটিতে

বসে পড়েছেন, আর ছেলেরা একসঙ্গে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে এবং সর্বশেষ গাড়োয়ানের দল মরীয়া হয়ে প্রায় মারতে ওঠে আর কি। যুদ্ধের বাজারে দিনরাত লোক আসছে, দাঁড়ানো চলে না তাদের।

রেগেটেগে নিজেই আবার মোট-ঘাট ঠেলে তুলি, ফিরতি ট্রেনে ফিরেই যাব।

গদাই বলে উঠল, 'বাবা, আমার যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কানাই, হাবলা, অনিলা, অমলা, লক্ষ্মী, ফুটি, শান্তি একযোগে আক্রমণ ক'রে বসল—ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম এবং আরও অনেক কিছু পেয়েছে তাদের। গরমে গাড়ীর মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে তাদের আদৌ নেই।

একরকম মারতে মারতেই তাদের গাড়ীতে তুললাম। এক ঘণ্টা বিষ্ণুপুর স্টেশনে বসে থেকে আবার ট্রেন ধরলাম।

দিদি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই যাই হাঁদা, তাই এই রাম-ঠকানোটা ঠকালে!'

পিসিমা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হাবা-কালা মানুষ কিছুই বুঝি না, হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে আনাই বা কেন—নিয়ে যাওয়াই বা কেন?'

গিন্নী নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'হায় ভগবান, সকল দেশই মগের মুল্লুক হয়ে দাঁড়াল!'

দিদিমা কাতর নিঃশ্বাসে বলেন, 'বসে বসে কোমরটা ভেঙে গেল, একটু শুতে দিলে না মুখপোড়া!'

কেষ্ট, গদাই, কানাই ইত্যাদি একযোগে এগারটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, 'খাবারের হাঁড়িটা আর লুচির ঝুড়িটা বিষ্ণুপুরেই পড়ে রইল বাবা!'

কারুর মুখে আর কোন কথা নেই, শুধু নাবালক দু-তিনটি খিদেয় কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। বাকী সকলে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন আমি ইচ্ছে ক'রেই তাঁদের বিপদে ফেলবার জন্যে সাধের কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি।

দিদি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলেন, 'তখনই জানি এরকম হবে, "তিনে" যেখানে আছে সেখানে একটা বিভ্রাট না হয়ে যায়?'

যেন বিভ্রাট বাধানোই আমার পেশা, আজীবন ধরে বিভ্রাটই বাধাচ্ছি! আর ওঁরা ওই 'তিনু' নামটি রেখে যে কী বিভ্রাট বাধিয়ে রেখেছেন সে খেয়াল আছে?··· কেন, আমার দুর্গাপদ নামটা কি দোষ করেছে? দুগ্‌গা বলে ডাকা যায় না? ইচ্ছে হ'ল আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই, কিন্তু এই উনপঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ নামকরণের ভুল ধরতে যাওয়াটাও তো বিভ্রাট বাধানো! থাক্।

দিদিমা বললেন, 'পাঁজিপুঁথি না দেখে পথে বেরোনো—যেমন সব ফ্যাসান হয়েছে আজকাল! এ নিঘ্‌ঘাত তেরোস্পর্শর কাজ!'

পিসিমা উদাসীনের মতন একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এত "খোয়ার"ও কপালে লিখেছিলে ভগবান! হরি হে!'

গিন্নী কিছু না বলে থেকে থেকে শুধু নিঃশ্বাসই ফেলতে লাগলেন।

আমি এ পর্যন্ত একটিও কথা বলি নি, একটিও নিঃশ্বাস ফেলি নি, ফেললাম কখন জান?

যখন হাওড়া স্টেশনে এসে ভিড়ের চাপে চিঁড়ের মত চেপ্টে কোনরকমে নাক-মুখ ছেঁচে সব কটাকে বাইরে এনে কুলিকে পয়সা দিতে গেলাম, দেখি কোটের ইন্‌সাইড পকেটে সেই একশো পঁয়ষট্টি টাকার রসিদখানা বসে আছে আরামে!

নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কি করবার আছে বল?

বড্ড বেশী গোলমাল

জাপানী! জাপানী!

সকলের মুখে এক শব্দ···ফিসফিস···গুজগুজ···আচমকা চেঁচিয়ে উঠে সামলে নেওয়া···এই চলছে সকাল নটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত। চৌকিদার এসেছে, দারোগা এসেছে, গ্রামের জমিদার বাড়ী থেকে লাঠি সড়কি নিয়ে পুঁয়ে পাওয়া দুটো দরোয়ান এসেছে। স্বয়ং জমিদার মশাই যোগেন্দ্র দত্ত কেরোসিন আর নারকেল

তেল মিশিয়ে মরচে ধরা বন্দুকটার নল সাফ করতে লেগেছেন—এলেন বলে।

ছোট হাকিমকে খবর দিতে লোক গেছে, আর বড় হাকিমকে খবর দেওয়া হবে কিনা বিবেচনা চলছে। দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের 'গণেশ দেউল' গ্রামে এরকম উত্তেজনাকর ব্যাপার ঘটে নি।

আমাদের গ্রামের নামটা ঐতিহাসিক 'রাজা গণেশে'র নামে কি পৌরাণিক 'বাবা গণেশে'র নামে তা ঠিক জানি না, তবে একদা যে এটা রীতিমত নগর ছিল তা' মালুম হয় যেখানে সেখানে প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ, 'দেউল' 'জাঙাল' 'চক্' 'গড়খাই' ইত্যাদি দেখে।

মানে আর কি, নামগুলো দেখে, জিনিসগুলো তো কবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

পুরনো আমলের স্মৃতি হিসেবে যেটি এখনো জীর্ণ দেহ নিয়েও বিরাট গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি হচ্ছে দুশো ফুট উঁচু 'পুরনো কালীবাড়ী'। সেই দুশো ফুট উঁচু মন্দিরের খিলেনওয়ালা গম্বুজের একটি ফাঁকা খিলেনের মধ্যে দিব্যি ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছেন দুই অবতার।

জাপানী না হলে এত সাহস কার হবে যে কালীমন্দিরের চূড়োয় উঠে ঠ্যাং দোলাবে?

যদিও যুদ্ধ খতম্ আর জাপান ঠাণ্ডা মেরে গেছে, জাপানীর নামে হাঁপানি ধরবার আর কিছু নেই, তবু এইসব অজ পাড়াগাঁ থেকে পীতাতঙ্ক রোগটা নির্মূল হয় নি। পুলিসেরই কি হয়েছে?

এই তো থানায় রীতিমত 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেছে।

গ্রামসুদ্ধু লোক ঝেঁটিয়ে এসে এই প্রচণ্ড রোদে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে আছে আর জল্পনা-কল্পনা করছে। কিন্তু কী যে কল্পনারও বাইরে। আকাশ থেকে খসে পড়লো, না এরোপ্লেন থেকে ধ্বসে পড়লো, তা সে জাপানীরাই জানে, জাপান সম্রাট হিরোহিতোও জানতে পারেন, কিন্তু আমরা?

কি করে জানবো?

কল্পনা-শক্তি যার যত প্রখর সে তত সবজান্তা সাজছে।

প্রথমটা দেখতে পায় শশী নাপিত।

পাবার কথা নয়, তবু দৈবযোগে পেয়ে যায়। কদিন ধরে শশী কাঁচা সর্দিতে ভুগ্‌ছে, ঘুম থেকে উঠে প্রাভাতিক কর্তব্য সারতে মাঠের দিকে এলেই ওর হাঁচি পায়। পায়, কিন্তু সব সময় হয় কি? সামান্য হাঁচিও 'আসি আসি, আসি না' করে দস্তুরমত ভোগা দেয়।

মনের মতো একটি হাঁচি হাঁচবার জন্যে শশী রোদ উঠতেই আকাশপানে তাকিয়ে হাঁচির সাধনা করছিল। রোদের আওতায় সবে নাকের মধ্যে সুড়সুড় করে এসেছে, সেই চরম মুহূর্তে দেখতে পেলো মন্দিরের সুবর্ণচূড়োয় জীবন্ত প্রাণীর মতো কি নড়ছে!

মনে করলো চোখের ভ্রম।

প্রাণ কাঁপানো পাঁজর নাচানো এক রাম হাঁচি হেঁচে নিয়ে শশী আবার দেখলো, দুই চোখ কোঁচার খুঁটে মুছে আবার দেখলো, ঠিক আছে। কাক নয়, চিল নয়, শকুনি-গৃধিনী কিছুই নয়—মানুষ!

জলজ্যান্ত দুটো মানুষ!

শশীই ভেবে ঠিক করলো, আর কিছু নয়, জাপানী! হয়তো বা জাপানী টিকটিকি, সারা দেশটা দেখে নেবার জন্যে বেছে বেছে উঁচু জায়গা দেখে বসেছে।

কাঁপতে কাঁপতে শশী ছুটলো যোগীন দত্তর বৈঠকখানায়।

ইতিমধ্যে দেখলেন আমাদের গদাই ঠাকুমা।

গদাই ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া করে ঠাকুমা সকালবেলাই একগাছা দড়ি আর একটা ঘড়া নিয়ে এসেছিলেন দীঘির ঘাটে, ডুবে মরবেন এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কিন্তু এক ডুব দিতেই মাথাটা কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হ'ল, আর একটা ডুব দিতেই প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে এলো, তৃতীয় ডুবের শেষে দড়িগাছটা গুছিয়ে-গাছিয়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে ঘড়া ভরে নিয়ে ঠাকুমা উঠলেন।

স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করে মন্দিরের চৌকাঠ ধুয়ে দিয়ে যাওয়া ঠাকুমার নিত্য কাজ। আজও যেই সূর্যপ্রণাম করতে আকাশপানে তাকিয়েছেন, দেখলেন চূড়োর

ওপর কারা বসে!

দুর্গা! দুর্গা! সক্কাল বেলা আজ এ কী ভাগ্যি?

মহাকালীর ডাকিনী যোগিনী ছাড়া মায়ের মাথার ওপর আর কে চড়ে বসবে?

কাঁখে ঘড়া, হাতে গামছা দড়া, গদাই ঠাকুমা অনেক কায়দা-কসরৎ করে প্রণাম করতে গিয়ে একেবারে পপাত ধরণীতলে। ঘড়ার জল পড়ে কাদায় গড়াগড়ি। ঠাকুমা যতই উঠতে যান, ততই কাদামাখা হন।

এমন সময় দেখলেন শশী নাপিতকে গাইড্ করে একদল ছেলেছোকরা এই দিকেই আসছে। ঠাকুমা কাতরস্বরে ডাকেন, 'ও শশী, ইদিকে শোন, অ বাবা হারাধন, অ জিতেন! জিতেন! ইদিকে একবার আয় দাদা, কোমরটা বোধ হয় ভেঙে গেল, হাতখানা একটু ধর দাদা!'

সকালবেলা পতি পরম গুরুর সঙ্গে ঝগড়া করার পাপে, না মা-কালীর ডাকিনী যোগিনীকে দেখে ফেলার অপরাধে এই শাস্তি, বুঝে উঠতে পারেন না গদাই ঠাকুমা।

ঝগড়া তো নিত্যকাজের মধ্যে। সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুন্দার সঙ্গে লাঠালাঠি না করলে হজম ভালো হয় না ঠাকুমার, কই আজ পর্যন্ত কিছু হয়েছে? সে সব কিছু না, ওই—ওই ডাকিনী-যোগিনী!

ঠাকুমা অবশ্য স্থির করেছেন, আর কেউ তাদের পোড়া পাপচক্ষে 'ওনাদের' দেখতে পাবে না। নেহাৎ নাকি ঠাকুমা, মা-কালীর খাঁড়া ধোওয়া জল না খেয়ে যিনি চাটুকু পর্যন্ত মুখে দেন না—তিনি বলেই।

'এ কি, ঠানদি পড়লেন কি করে?' বলে বাঁড়ুয্যেদের জিতেন এসে হাত ধরে তুলে দিতেই, ঠাকুমা বার দুই কোমরটা ডলে নিয়ে বলেন, মানে চুপি চুপি বলেন, 'আর কি করে? ব্যাপার জানিস, "পুরনো কালীর" মন্দিরের চূড়োয়—'

জিতেন আরো ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'জানি জাপানী! একটা নয়—দুটো! চূড়োর মাথায় বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে!'

তা হলে, ঠাকুমার দিব্যদৃষ্টিতেই শুধু নয়? পোড়া পাপচক্ষেও দেখেছে সবাই? একটু থতমত খেয়ে যান গদাই ঠাকুমা, সন্দেহের সুরে বলেন, 'জাপানী? কে বললো?'

'বললো শশে। আমাদের শশী নাপ্‌তে। বলাবলিরই বা কি আছে', জিতেন অবহেলার ভঙ্গীতে বলে, 'উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ে দুটো জাপানী গম্বুজে আটকে আছে, ও তো সবাই জানে। কেন, শেষ রাত্তিরে উড়ো জাহাজ ভাঙার ঘ্যানঘ্যান ঘসঘস আওয়াজ পান নি?'

গদাই ঠাকুমা কোমর ডলতে ডলতে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, 'আর ভাই বুড়ো হয়েছি, শেষ রাত্তিরে ঘুমোই যেন মড়া। তা ভাঙলো—তোরা শুনলি বুঝি?'

'তা শুনলাম না? আমি তো আবার "ইয়ে"কে ডেকে শোনালাম।'

ঠাকুমার কবল থেকে কেটে পড়ে জিতেন।

কি জানি আবার জেরায় পড়ে 'ইয়ে' রহস্য প্রকাশ করতে হয় যদি!

ওদিকে তখন মুকুন্দ চক্কোত্তি হাতমুখ নেড়ে শশীকে বোঝাচ্ছেন, 'জাপানী কি রে বেটা, জাপানী কি? ক্ষ্যাপা না পাগল? তারা তো কবে রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর থেকে চাটিবাটি তুলে পিটটান দিয়েছে, উড়ো জাহাজে চড়ে এলেই হ'ল?'

'কিন্তু জ্যাঠামশাই', হারাধন এগিয়ে আসে, 'স্পাই হ'তে পারে তো?'

'তোমার মুণ্ডু হতে পারে।'

মুকুন্দ যেভাবে খিঁচিয়ে ওঠেন ভাইপোকে, সে কেবল হারাধন বলেই সহ্য করলো। আবার ঝেঁকরে ওঠেন মুকুন্দ, 'হতে কি না পারে? সগ্‌গো থেকে দেবদূত এসে বসে আছে—তোর জেঠাকে নিয়ে যেতে, তাই বা হ'তে বাধা কি? হুঁঃ! বললেই হ'ল "জাপানী"! আমি বলছি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা, মর্তলোকে পড়তে পড়তে কি রকম আটকে পড়েছেন।'

মুকুন্দর কাঁখে তো আর ঘড়া নেই? সহজেই দুই হাত জোড় করে পেন্নাম করেন শাপভ্রষ্ট দেবতাদের উদ্দেশে।

এদিকে আমড়াতলায় তারক গাঙ্গুলী আর ঘনশ্যাম দাসের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটির যোগাড়। তারক গাঙ্গুলী ফতুয়ার আস্তিন গোটাবার চেষ্টা করতে করতে বলছেন, 'জাপানীও নয়, মহাপুরুষও নয়, সাদা বাংলায় বলি শোন,

প্রতিবাদ করো না—তর্ক করো না—'

ঘনশ্যাম তাঁর শ্যামঘন মুখখানি নিয়ে তেড়ে উঠে বলেন, 'না, তক্ক করবে কেন? উনি যা বলবেন তাই মানতে হবে। "প্রতিবাদ করো না" কেন শুনি? বেশ করবো তক্ক করবো, আমি এই খাঁটি কথা বলে দিচ্ছি, দু'ব্যাটা জাপানী কিভাবে ছিটকে এসে পড়েছে রেঙ্গুন থেকে, এখন টোকিও রেডিওর সঙ্গে কথা চালাচালি করবার জন্যে বেছে বেছে ওই জায়গাটি বার করে নিয়েছে।'

মল্লিকদের মেজ ছেলে শ্রীনাথ মুচকে হেসে বলে, 'ঘনশ্যামদার এক কথা, রেডিও থেকে কথা চালাচালি কি গো! টেলিফোন নাকি? আমি এই বলে রাখছি —যদি মরে যাই তখন বলো যে "বলেছিল বটে শ্রীনাথ"; কিচ্ছু নয়, দু'ব্যাটা ফেরারী আসামী, সারারাত চুরি করে ভোররাত্তিরে থানা পুলিসের ভয়ে চূড়োয় উঠে বসে আছে।'

এদিকে মন্দিরের চাতালে যে জটলাটি হচ্ছিল, তাতে সাব্যস্ত হয়ে গেছে—চোর ডাকাত মহাপুরুষ সাধুপুরুষ দেবদানব কিছুই নয়···এক ব্যক্তি স্বয়ং হিটলার, দ্বিতীয় ব্যক্তি সুভাষ বোস।···নির্জনে পরামর্শ করতে মনের মতো ঠাঁই নিজের দেশের মধ্যে না পেয়ে হাতবোমায় চড়ে দুজনে এখানে এসে বসে জটিল পরামর্শ করছেন।

গণেশ বলে, 'সে কি সতীশ কাকা, হটলার তো নিজেই বলেছে যে সে অক্কা পেয়েছে। আর সুভাষ বোসের তো ফটোই বেরিয়ে গেল সেদিন মরার পর!'

'মরা? হুঁঃ, ওদের কি মৃত্যু আছে রে গণশা? অমর! অমর! কতবার মরলো। কতবার বাঁচলো। হিটলারকে তো দেশছাড়া করে দিয়েছে! তাই এখন সুভাষ বোসের সঙ্গে যুক্তি করে—'

ঠিক এই সময় দারোগা বাবু এসে হাজির।

দেখে শুনে গম্ভীর ভাবে বলেন, 'গুলি করে নামানো ছাড়া তো উপায় দেখছি না। গুলি আমি করতে পারি, এখনই পারি, কিন্তু—থাক্, ছোট সাহেব এসে আবার কি হুকুম করেন!'

যদিও বিনা বন্দুকেই এসেছেন দারোগা বাবু, তবু গুলি করবার জন্যে আস্ফালন করে বেড়ান।

চৌধুরীদের ছোটবৌ হলুদ বাটতে বাটতে বলে, 'বাবা, বাবা, একদিনের জন্যে সংসারের ছুটি নেই, রোজ সেই রাঁধাবাড়া কুটনো-বাটনা। এত লোক দেখতে গেল, আমাদের আর হ'ল না।'

ছোটবৌয়ের ননদ যোগমায়া সেইমাত্র দেখে ফিরেছে। কোলের ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে উৎসাহিত স্বরে বলে, 'তোর মসলা পেষা রাখ না ছোটবৌ—এসে হবে'খন। চল ঝাঁ করে দেখিয়ে আনি। আহা, পৃথিবীর লোকে যাকে দেখতে পায় না—তাকে চর্মচক্ষে দেখে আসা কি কম কথা? হলুদ রাখ, আমি বরং এসে বেটে দেব।'

ছোটবৌ হৃষ্টচিত্তে উঠে হাত ধুয়ে বলে, 'হ্যাঁ ঠাকুরঝি, কি রকম দেখলে?'

'ওরে বাবা! ইয়া সা-জোয়ান মিনসে, পেল্লায় পেল্লায় গোঁফ—'

'তবে যে কুসুম ঠাকুরঝি বলছিল, 'গদাই ঠাকুমা নাকি দেখেছে, বিকটাকার দুটো ডাকিনী, পরনে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষ, মায়ের মাথার ওপর ধেই ধেই করে নেত্য করছে!'

যোগমায়া ঠোঁট উল্টে অগ্রাহ্য-সুরে বলে, 'গদাই ঠাকুমার কথা তো? বাদ দে। বুড়ী দিনের মধ্যে দশবার ভূত দেখে, ও আর ডাকিনী-যোগিনী দেখবে না? সবাই চিনছে—হিটলার আর সুহাস বোস···'

'সুহাস নয়, সুভাষ', ছোটবৌ সংশোধন করে দেয়, 'কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন?'

যোগমায়া ফিসফিস করে বলে, 'মারা তো দুজনেই গেছেন লোকে রটাচ্ছে, কিন্তু আসল মিত্যু ওঁদের নেই। ওঁরাই তো অশ্বত্থামা আর পরশুরাম, চার যুগে অমর। যে বারে যে মূর্তি ধারণ করেন!'

ছোটবৌ হলুদের হাত আঁচলে মুছতে মুছতে যোগমায়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

রঙ্গস্থলে তখন ছোট হাকিম বা সাব-ডেপুটি সাহেবের আবির্ভাব হয়েছে। সদর থেকে এসে পড়েছেন। গুলি করে নামানোয় তাঁরও কোনো আপত্তি নেই, এনেওছেন বন্দুক, কিন্তু বাবার ওপর বাবা আছেন তো? তাঁরও ভয় বড় হাকিমকে। গুলি কর কথাটা বলতে যত সোজা কাজটা ঠিক তা নয় তো!

হিটলারী গুজব অবশ্য বিশ্বাস করেন নি তিনি, তাঁর ধারণা কোনো বদমাইস লোক। কে জানে হয়তো ওই গম্বুজের ভিতর ডাকাতদের গুপ্ত আড্ডা আছে। মা-কালীর সঙ্গে তো ডাকাতদের নিকট-আত্মীয়তা!

রাজমজুরদের ডেকে 'ভারা' বাঁধিয়ে উঠতে হলেও তিন-চারদিন লেগে যাবে··· তা ছাড়া কি জানি ওদের কাছ বরাবর গেলে যদি ওরাও গুলি-ফুলি করে বসে!

যতই হোক হাকিম, সাধারণের চেয়ে মাথা পরিষ্কার, ভেবেচিন্তে বললেন,—'উচিত হচ্ছে ওদের কাছ থেকে কিছু জানবার চেষ্টা করা।···আচ্ছা, কারুর বাড়ীতে ওল্ড মডেল গ্রামোফোন আছে? চোঙওয়ালা?'

গ্রামোফোন?

'আছে আছে দত্তবাবুদেরই তো আছে, চোঙও আছে।'

শশী খবর জানে, শশীই ছুটলো।

চোঙ এলো। রঙ-চটা পৌরাণিক আমলের সেই চোঙটিই আজ মস্ত আদরের। শশীর হাত থেকে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, হাত বদল হতে হতে সেটি হাকিম সাহেবের হাতে পৌঁছতে সময় লাগলো ডবল।

'হু আর ইউ? হু আর ইউ? তোম কোন হ্যায়? কে তুমি?'

বাংলা ইংরিজি হিন্দি তিন ভাষাতেই প্রশ্ন করেন, কিন্তু উত্তর কোথা? তাদের কাছে তো আর চোঙ নেই।

তবে কিছু কাজ হ'ল।

এতক্ষণে আসামী যুগল নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো।

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ঢিলবৃষ্টি।

অর্থাৎ তাদের উপস্থিতিটা জানাচ্ছে।

যাত্রার আসরে হঠাৎ চেপে বৃষ্টি আসার মত ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল—"মারলে" "কাটলে" "খুন করলে" "খেয়ে ফেললে" "বাপরে মারে" শব্দে যে যেদিকে পারলো ছুট দিলে।

শুধু থাকলেন চাঁইরা।

গ্রামোফোনের চোঙ আর কি কাজ দেবে?

ফিরিয়ে দিতে গিয়ে শশী আবার ছুটতে ছুটতে আসে, দত্তমশাইকে উদ্দেশ করে বলে, 'কর্তাবাবু! কর্তাবাবু! বড় মা বললো এই "দূরপীণ"টা দিয়ে দেখুন।'

'দূরপীণ' বা দূরবীণ, সেও একটা পাওয়া গেছে দত্তবাবুদেরই বাড়ী থেকে। সাধে কী আর লোকে 'রাজবাড়ী' বলে?

'ভ্যালা রে মোর নরসুন্দর!'

শশীকে আপ্যায়িত করে বড়বাবু দূরবীণটা নিজে না দেখে সম্ভ্রম করে ডেপুটি সাহেবের দিকে এগিয়ে দেন।

'আই সি! এটা এতক্ষণ খেয়াল করা উচিত ছিল আমাদের।'

ডেপুটি সাহেব একটু পিছু হটে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে কায়দা করে বেশ কিছুক্ষণ দেখতে থাকেন। ওদিকে দারোগা আর দত্তবাবুর, শশী নাপিত আর সুরেন কামারের হাত নিসপিস করছে। কেড়ে নেয় আর কি!

অবশেষে ডেপুটি সাহেব দারোগাবাবুর দিকে এগিয়ে দেন জিনিসটা, 'ঠিক বুঝলাম না। লো ক্লাসের দুটো লোক মনে হ'ল, কিন্তু ডাকাত-ফাকাত বলে মনে হচ্ছে না তো? নেহাৎ যেন—'

'অত দূর থেকে কি আর বোঝা যায়?'

দারোগাবাবু চোখে দিয়েই একটু থতমত খেয়ে যান, 'আরে অত দূর কোথা, এ যে একেবারে হাতের গোড়ায় নেমে এসেছে, লোক দুটো যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে রে সুরেন! দেখ্ তো—'

সুরেন কামারের প্রাধান্য তা বলে শশী নাপিত সইবে না—যতই হোক ওই হ'ল বলতে গেলে—এই দহরম-মহরম কাণ্ডের আবিষ্কর্তা, তা'ছাড়া হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে যন্তরটা আনলো কে? সুরেন?

দারোগার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে শশী বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'যে এলো চষে সে রইল বসে, আর যে এলো মূলো খুঁড়ে তাকে দাও ভাত বেড়ে—আমায় আগে দেখতে দিন দেখি!'

কাঁচ দুটো ভালো করে মুছে নিয়ে, শশীও ডেপুটি সাহেবের ভঙ্গীতে একবার বামে একবার ডাইনে করে ঘুরে ঘুরে দেখে হঠাৎ আকস্মিক চীৎকার করে ওঠে, 'আরে আরে, এ যে বিপিন আর ফণী! অনন্ত যুগীর বেটা আর জামাই!'

'বলিস কি এ্যাঁ? ঠিক দেখেছিস?'

'ঠিক দেখবো না? যন্তরের এমন গুণ, মায়ের মন্দিরের চূড়ো একেবারে নাকের ডগায় যে! ফণে আর বিপনে দাবা-বোড়ে খেলছে!'

শশীর চীৎকারে আকৃষ্ট পাড়ার সকলে আবার এসে হাজির হয়। সকলের হাতে হাতে ঘুরতে-ঘুরতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির শেষ দশা হয়ে এলো।

এবং নিঃসংশয়ে জানা গেল, এতগুলি লোকের অনুমান-শক্তির মাথায় মুগুর মেরে ফণী ও বিপিন মায়ের মন্দিরের চূড়োয় বসে দাবা খেলছে!

নাও ঠ্যালা! এখন উপায়?

নামিয়ে আনা যাবে কি করে? কেন উঠেছে সে কথা থাক, নামবে কি করে তাই চিন্তা।

আবার চোঙ এলো!

এবার আর ছোট হাকিম নয়। শশী নাপিত চোঙ মুখে দিয়ে পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে, 'ফণে, নেমে আয় বলছি, ভালো চাস তো নেমে আয়। বিপিন, এ কি ব্যাপার! তোমাদের জন্যে থানা-পুলিস কাণ্ড হচ্ছে, ম্যাজিস্টার সায়েব পর্যন্ত এসেছেন দেখতে পাচ্ছো? ফণে, তোরা উঠলি কি করে? যে রকম করে উঠেছিস্ তেমনি করে নেমে আয়।···আচ্ছা ভয় খাস নে, কথা দিচ্ছি তোদের কেউ কিছু বলবে না।'

আর বলবে না!

ফণী আর বিপিনের তখন নীচের দিকে চেয়ে মাথা ঘুরে গেছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ছোট হাকিম বিরক্ত হয়ে তাঁর ঘোড়ায় চাপতে যাচ্ছিলেন, দারোগাবাবুর করজোড় প্রার্থনায় তাঁর বাড়ীতে অতিথি হতে সম্মত হন।

যোগীন দত্ত বন্দুকটা বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে তিনখানা জলচৌকি আনিয়েছেন, তাতেই বসেছেন তিন অবতার।

তিনি নিজে, দারোগা আর সাব-ডেপুটি।

কথায় কথায় একটু অন্যমনা হয়ে গেছে সকলে, হঠাৎ দেখা গেল গুটি গুটি দুটি মানুষ মাথা চুলকোতে চুলকোতে আসছে।

বিপিন আর ফণী!

কি করে নামলো বলছো?

যেমন করে উঠেছিল, ভাঙা দেয়ালের খাঁজে-খোপরে পা দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে। ফণীর খালি গায়ের খানিক খানিক চামড়া আর বিপিনের ফতুয়ার কিছু কিছু অংশ অবশ্য মা-কালীর মন্দিরে উৎসর্গ করে আসা হয়েছে।

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, 'ব্যাপার কি ফণী?'

'আঁগ্যে, আপনার গিয়ে—ব্যাপারটা আঁগ্যে দেখছি গুরুচরণ হয়ে উঠেছে।'

'এর জন্যে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে তোমাদের তা জানো?'

বিপিন এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বলে, 'ওই জন্যেই তো আঁগ্যে নাবছিলাম না। আপনারা অভয় দিলেন বলেই—তা আপনারা যদি কথার খেলাপি করেন তবে গরীব নাচার।'

ডেপুটি সাহেব মুচকি হেসে বলেন, 'থাক্ থাক্, আর শাস্তিতে কাজ নেই, যথেষ্ট শাস্তি নিজেরাই পেয়েছে!···যা যা গরম জলে ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে ফেল্ গে যা, সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে।···কিন্তু উঠেছিলি কেন বল দেখি?'

বিপিন জামাই মানুষ, সে লজ্জা পেয়ে আড়ালে গিয়ে মুচকি হাসে।

ফণী মাথাটা চুলকে চুলকে প্রায় জখম করে ফেলতে ফেলতে বলে, 'আঁগ্যে হুজুর, নীচে বড় গোলমাল। দু'দণ্ড নিচ্চিন্দি হয়ে খেলবার জো নেই, "বাজার যাও, দোকান যাও" করে পরিবারের ঘ্যানঘ্যানানি, তাই শালা-ভগিনপোতে যুক্তি করে একটু নির্জনে

গিয়ে ছকটা পেতে বসেছিলাম।···তা হুজুর আঁগ্যে কপালে সুখ না থাকলে যা হয়, এখানেও গোলমাল।···এই জন্যেই শাস্তরে লিখেছে—"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়"।'

শশী আর থাকতে পারে না, ওর সামনে ফণে দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে বক্তিমে দেবে? চটে উঠে বলে, 'যা যা, আর শাস্তর দেখাতে আসিস নি, ঢের হয়েছে! পৃথিবীতে আর নিজ্জন ঠাঁই খুঁজে পান নি, তাই মা-কালীর মাথার ওপর চড়ে হাতী ঘোড়া ঠুকতে বসেছেন! বুকের পাটাকে বলিহারী যাই! বলি ক'ছিলিম টেনেছিলি?'

ফণী হাকিম-দারোগার কান বাঁচিয়ে জিভ কেটে বলে, 'চুপ, চুপ, রাগলে শশীদার জ্ঞানগম্যি থাকে না দেখছি। বলি এখনও কি আর ছিলিম গুনে খাবার বয়স আছে?'

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

'হয় চাকর খুঁজে আনো—নয় বাজার করে আনো!' বলে সরোষে একখানা লাল ছাপমারা ছোট নোট টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা চলে যান। আর কিছু বলবেন না তিনি, কি চাই আর না চাই সব দায়িত্ব বিশুর। ভুল হলে আরো চারবার বাজারে যেতেও সেই বিশু। কিন্তু কেন? না হয় একটু বেলা হয়ে গেছে, না হয় পিসিমার রান্নাঘর মাছ-তরকারির অভাবে কান্না শুরু করেছে, কিন্তু বিশুর কি এসে যাচ্ছে তাতে?

চাকর ছেড়ে যাওয়াটা তো ওর অপরাধ নয়? সেটা তো পিসিমারই একচেটে ব্যবসা। ঝি-চাকরদের মধ্যে যে অসংখ্য দোষের অপূর্ব সমাবেশ থাকে, সেটা কেমন করে জানি না পিসিমার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যায়, ফলে বেচারা বিশুর ভাগ্যে চাকর খোঁজা আর বাজার করা!

কী নয়? কন্ট্রোলের চিনি আনা থেকে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি, কয়লা

আর কলাপাতা, পাঁচফোড়ন আর হিঙের কচুরী, সবই তো আনতে হবে। পায়ে হেঁটে নিজে নিজে তো আসবে না কেউ! আর আনবেও না কেউ—বিশু ছাড়া।

কারণ ওর পরীক্ষা হয়ে গেছে, মাস তিনেক ছুটি পেয়েছে। আচ্ছা, সে তো তিরিশ হাজার ছেলেমেয়েই পেয়েছে, কিন্তু কেউ কি চোরদায়ে ধরা পড়েছে বিশুর মতন?

কপাল!

তাই কি একটা মিষ্টি কথা খরচ করবে কেউ?—'বিশেটা কোন কম্মের নয়', 'বিশুবাবুর দ্বারা কিছু হয় না', 'বিশু তো চব্বিশ ঘণ্টাই বসে থাকে', এই ওর অঙ্গের ভূষণ।

কিন্তু বিশু দেখে—ও চব্বিশ ঘণ্টা পথেই আছে! আঃ, এতও খেতে পারে মানুষ! খাওয়ার জন্যই না এত খাটুনি!

'খাওয়া ব্যাপারটা যদি না থাকতো, কী সুখেরই হ'ত সংসারটা!' পেরেকে টাঙানো বাজারের থলিটা পাড়তে পাড়তে একটা দার্শনিক মন্তব্য করে বিশু।

বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে লীলা ডাঁসা পেয়ারার মুণ্ড ধ্বংস করছিল, চমকে উঠে বললো, 'সে কি রে ছোড়দা? বল্ "খাওয়ার ব্যাপারটা না থাকলে কি দুঃখেরই হ'ত সংসারটা", কি থাকতো তা হলে পৃথিবীতে? বেঁচে থাকবার কোনো মানেই থাকতো না যে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘরে বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে চারবেলায় চৌষট্টিবার খেতে পেলে সকলেই ও কথা বলতে পারে! ঠ্যালা তো বোঝো না?'

'বুঝতে আমার ভারী দায়। ছেলে হয়ে জন্মেছিস কেন?' বলে মেয়ে হয়ে জন্মানোর গৌরবে গৌরবান্বিত মুখে কোঁচড় থেকে আর একটা পেয়ারা বার করে লীলা।

'হরদমই গিলছে রাক্ষুসীটা!'

'কি? আমায় রাক্ষুসী বললি? বেশ, বেশ, আর যদি কক্ষনো কিচ্ছু খাই! এরপর চীনেবাদাম এনে সাধিস্—"লীলা, খা-না ভাই চারটি, বেশ গরম আছে—" খাবো না, খাবো না, খাবো না, এই তিন সত্যি।'

'বাঁচলাম, হাড়ে বাতাস লাগলো।'

চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিশু।

লীলা চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'দিব্যি ছাড়া বেগুন পোড়া—বেশ বড় দেখে বিলিতি আমড়া আনিস্ ভাই ছোড়দা, আর পেয়ারাও গোটাকতক।'

আজ আর ছোট বোনটির আবদারে কর্ণপাত করে না বিশু। পথে বেরিয়ে একবার ভাবে বাজারের থলিটা ছুঁড়ে ফেলে, যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যায়—নোটখানা সম্বল করে। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? তা ছাড়া এই বিশাল ভবসমুদ্রে পাড়ি দিতে—মাত্র দুটি টাকার ভেলা?

দূর ছাই, তার চাইতে একটা চাকরই খুঁজে বার করবে সে। পিসিমার বাক্যবাণ হজম করেও টিঁকে থাকতে পারে এমন একটা চাকর।

বাজারের পথে মোড়ের মাথায় শূন্য থলি হাতে নিয়ে সেই জনারণ্যের পানে তাকিয়ে থাকে বিশু, প্রত্যেকটি লোককেই নিরীক্ষণ করে। কিন্তু কাকেই বা ডাকবে সে? চাকর বলে চেনা যায় যাদের সেগুলো তো চাকরই, কোন ভাগ্যবানের বাড়ী অলঙ্কৃত করছে নিশ্চয়ই।

বাকী লোকদের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হবে। উড়ে নয়, মেড়ো নয়, মেদিনাপুরি নয়, একটি ভালো বাঙ্গালী……

আচ্ছা, ওই যে লোকটা আসছে! আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, চোখে শেলের চশমা, স্রেফ্ একটি চক্‌চকে ইলিশ মাছ হাতে?

বাবা রে! নিশ্চয় কারুদের জামাই!

আচ্ছা, ওই যে ছিটের শার্ট গায়ে, হাতে রঙিন চটের থলি?

উঁহু, ওদেরও চাকর পালিয়েছে মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, ওই জালিদার গেঞ্জি গায়ে ছোকরা? হাতে শুধু পান আর পাতিনেবু! নাঃ, ও নির্ঘাত কলেজ-বয়, নেহাৎ দরকারে পড়ে—

আচ্ছা, ওই লোকটা? গলাবন্ধ কোট গায়ে—কোঁচার খুঁটে ডেঙো ডাঁটা, থোড় আর কুচোচিংড়ি, হাতে কুমড়োর ফালি—

নাঃ, লোকটার প্রতি পদক্ষেপে আপিসের তাড়ার চিহ্ন!

তবে? তবে কি ওই লোকটাকে ডাক দেবে? মোটা কালো আর বেঁটে,

খালি গা খালি পা। গামছার থলিতে বাজারের প্রায় অর্ধেক তরকারি, ডান হাতে প্রকাণ্ড রুই?

আরে ব্যস্! ভাগ্যিস্ ডাকে নি! সাহাদের গদির বড়কর্তা, কলকাতায় আটখানা বাড়ী আছে ওদের!

দূর ছাই—বিশুরই বোকামি। যে চাকরি খুঁজছে—মানে চাকরের চাকরি, সে বাজারই বা করতে যাবে কেন?·····অবশেষে শুধু হাত-পাওয়ালা একটা লোককে পাকড়াও করে বিশু।

'ওহে বাপু, শুধু শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিছু কিনছ না যে?' (চট্ করে বলেই বা কি?)

'পয়সা থাকলে তো কিনব বাবু!'

'পয়সা নেই? চাকরি করবে?'

'কি চাকরি?'

'এই বাজার-দোকান করা, ঝাড়া-মোছা, কাপড়-চোপড় কাচা—'

'কত মাইনে?'

'দশ টাকা।'

'দশ টাকা? হুঁঃ! ওতে কী হবে? ষোলো টাকা হলে পারি।'

বিশু তা দিতে পারে না, কাজেই আবার একটা যোগাড় করে। রোগা শুকনো, লম্বা টেরি, বিড়ি হাতে।

'এই, কাজ করবি?' সরাসর প্রশ্ন করে বিশু, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে।

'কি কাজ?'

'বাজার, ঝাড়া-মোছা—'

'না। চাকরগিরি আর কেউ করবে না বাবু! ওকাজে সুখ নেই।' রাজাই চালে উত্তর দেয় লোকটা।

'বটে? তা লাটসাহেবী চাকরিটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে আজকাল?'

'চাকরির দরকার কি মশাই? বেঁচে থাক্ "কণ্ট্রোল"। কণ্ট্রোলই আমাদের ভাত-কাপড়। দৈনিক একটাকা পাঁচসিকে রোজগার হয়। দেবেন অত?'

ঠাস্ করে চড়িয়ে দেবার ইচ্ছেটা কষ্টে সংবরণ করে বিশু।

যখন বাজারের মধ্যে ঢুকেছে, একটা লোক নিজেই ডাকে, 'চাকর খুঁজছেন ?'

লোকটা ভব্যিযুক্ত চেহারা, কলার দেওয়া গেঞ্জি গায়ে, পায়ে স্যাণ্ডাল।

'আছে সন্ধানে ?' বিশু একবার আপাদমস্তক দেখে নেয় লোকটার।

'আজ্ঞে আমিই করবো।'

'পারবে ? আগে করেছ কোথাও ?'

'করি নি—শিখিয়ে দেবেন। শক্ত আর কি ?'

'তবেই হয়েছে। পিসিমাকে তো দেখ নি ? ভীষণ শক্ত।'

'খুব রাগী বুঝি ?' হেসে ফেলে লোকটা।

'থাক্, নিজ মুখে আর বলব না—তবে মাসখানেকের বেশী টিঁকতে পারে না কেউ!' বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটে বিশু। এ্যাঃ, ভারী বোকার মত হয়ে গেল কথাটা। চাপা দেয় তাড়াতাড়ি, 'বলি কত নেবে মাইনে ?'

'সে আপনাদের খুশী।'

'বটে ? সত্যযুগ এসে গেছে বুঝি। যাক্ চলো তো।'

তা বলে কেউ মনে করো না, চাকর যোগাড় হলেই পিসিমা খুশী হবেন। লোকটাকে দেখেই নাক সিকেয় তুলে পিসিমা বলেন, 'এক কাপড়ে এলে যে ? বলি আসতে আসতেই একজোড়া কাপড় আদায় করতে হবে বুঝি ? ওসব চলবে না, কাপড়ের অনেক দাম।'

'কাপড় কি হবে পিসিমা ? আপনার কাজ করে দিয়ে বাসায় চলে যাবো আমি।' হাসিমুখে বলে লোকটা।

এক কথায় 'পিসিমা' সম্বোধনে ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে পিসিমা মন্তব্য করেন, 'আহা! তা হলেই কাজ করেছ। কখন কি দরকার হয় কে জানে, দিনরাত হাজির না থাকলে ?'

'আজ্ঞে সব সময় পাবেন, শুধু দু' বেলা খেয়ে আসবো, আর রাত্রে শুতে যাবো।'

'ও বাবা, আবার খেতেও যাবে ? তবেই হয়েছে!···বিশে, তোর চাকরে আমার দরকার নেই।'

বিশুর মা আর নির্বাক থাকতে পারেন না, নেপথ্যে বলেন, 'ভালোই তো ঠাকুরঝি! আজকাল চাল যে আক্রা—'

'তাই আর কি? ভাতের দাম ধরে নেবে না?' পিসিমা বলেন, 'কি জানি বাপু, ও চাকরে আমার কি উপকার হবে? রাজপুত্তুরের মতন চেহারা—ও কি ছাই চাকর!'

মোটকথা খুঁত একটু কাটবেনই পিসিমা। চেহারা ভাল হওয়াও অপরাধ।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় অন্ততঃ একটা দিনও বিশুর ছুটি, বিশু তাই আশা করে অন্ততঃ। কিন্তু শান্তি? সেটা বোধ হয় বিধাতা-পুরুষ বিশুর জন্যে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন।

'বিশে, তোর চাকরের কীর্তি দেখে যা!'

'কেন গো!' বিশু আচম্‌কা চমকে ওঠে।

'কেন গো? দেখ্ এসে—ঘর পরিষ্কার করতে বলেছি বলে সকল ঘরে বালতি বালতি জল ঢেলে চুপচাপ টুলে বসে আছে। এখন হয় ওকে বিদেয় কর—নয় আমাকে।'

'নাঃ, বিশুকে আর তোমরা বাঁচতে দিলে না! কই দেখি!'

বিশু গিয়ে দেখে কথাটা সত্যিই বটে। প্রশ্ন করতেই সবিনয়ে উত্তর দেয়, 'আমি তো বলেছি বাবু, শিখিয়ে দিতে হবে, পিসিমা শুনছেন কই?'

আর পিসিমা! পিসিমা তখন কপাল চাপড়াতে শুরু করেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পিসিমাও এবার হার মানলেন। নতুন চাকরটিকে যে কাজই বলা হয়, সে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকে, আর রাগারাগি করলেই বলে—'করুন না পিসিমা, আমি দেখে শিখে নেব।' তা ছাড়া—মাছ কুটতে বললে বলে, 'ও তো মেয়েদের কাজ।' জুতো ঝাড়তে বললে বলে, 'ও তো ছোটলোকের কাজ।' কয়লা ভাঙলে 'হাত ময়লা হয়ে যাবে', আর কাপড় কাচলে নাকি 'হাত জ্বালা করে।'

এখন উপায়?

তবু যে দিন তিন-চার টিকে আছে, শুধু বাজার করার গুণে। বিশু নিজেই স্বীকার করেছে যে, দু টাকা হাতে নিয়ে পাঁচ টাকার জিনিস আনা বিশুর কর্ম নয়। নতুন চাকর আনে। আনে অবশ্য মুটের মাথায় চাপিয়ে। যাক্, মুটেভাড়া তো ও

নিজেই দেবে। অবশ্য বিশুর যন্ত্রণা তাতে কমে নি—বিশু যে এতদিন ধরে কেবল ঠকে এসেছে, এ কথা দৈনিক হাজার বারও তো শুনতে হবে।

আর লীলা? পৃথিবীর যাবতীয় 'কুপথ্য' সরবরাহ করবার এমন উৎকৃষ্ট বাহন ও জীবনেও দেখে নি। কাজেই—

কিন্তু নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলো লীলা। সকালবেলা চা খেতে বসে বললো, 'ছোড়দা, কাগজ দেখেছিস্ আজকের? দশ হাজার টাকা পুরস্কার!' ('হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশে'র কলমটাই সাধারণতঃ পড়ে মেয়েরা।)

'কিসের?'

'কে এক ভদ্রলোক "নাড়াজোল" না "ঘড়াজোল" কোথাকার যেন জমিদার, পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, ছেলে খুঁজে দিতে পারলে—এই যে দেখ্ না,···ওহে কেষ্ট, কাগজটা আনো তো!'

কেষ্ট ওরফে নতুন চাকর কাগজ এনে হাজির করে।

দশ হাজার টাকা পুরস্কার!

আমার পুত্র, নাম শুভেন্দুনারায়ণ রায়চৌধুরী, বয়স চব্বিশ, এম-এ পাস, ফরসা একহারা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, বড় বড় চোখ। অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ। যদি কেহ সন্ধান দিতে পারেন চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

নির্মলেন্দুনারায়ণ রায়চৌধুরী

সাং, তারিখ, নাম, ঠিকানা ইত্যাদি।

'ফটো ছাপালেই পারতো! "ফরসা একহারা চেহারা, বড় বড় চোখ, কোঁকড়া চুল", ও তো হাজার হাজার লোকেরই আছে···এই তো আমাদের কেষ্ট!' লীলা বলে।

হঠাৎ ফট্ করে কেষ্ট বলে ওঠে, 'দশ হাজার টাকা রোজগার করে ফেলুন না বিশুবাবু!'

বিশু বড় বড় চোখ করে তাকায়।

'ধরুন আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন, কাগজের বর্ণনার সঙ্গে এর চেহারা মিলে যাচ্ছে—দিন্ টাকা!'

'আর কি, টাকা অমনি ছেলের হাতের মোয়া!' বিশু অবজ্ঞার হাসি হাসে। 'শেষে পুলিসে দিক্ আর কি!'

'পুলিস কিসের? না মিললে দেবে না এই পর্যন্ত। চলুন না, একটু মজা করে আসা যাক। কলকাতার ঠিকানাটা কি দিদিমণি?'

'এই যে ১১ নম্বর বিশ্বামিত্র রোড, টালিগঞ্জ। চল্ না ছোড়দা, আমিও যাই, বেশ মজা হবে। বলবো আমাদের এই কেষ্টচন্দরটিই আপনাদের সবেধন নীলমণি!'

'আর তারা আমাদের পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে না দিয়ে দশ হাজার টাকা ধরে দেবে, কেমন? সাধে বলি বাঁদরী!'

'ছোড়দা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি! যা তা বলো না!'

কেষ্ট তাড়াতাড়ি মধ্যস্থতা করে বলে, 'আঃ, রাগারাগি কেন, চলুন না একটু বেড়িয়ে আসা যাক্! টালিগঞ্জে আমাদের দেশের লোকের একটা বাগান আছে প্রকাণ্ড, আটটা বিলিতি আমড়ারই গাছ—আর পেয়ারা? সে তো অজস্র। যত ইচ্ছে নেবেন, বারণ নেই।'

অতঃপর লীলাকে ঠেকানো অসম্ভব।

কর্তারা অফিস-কাছারি রওনা হতেই তিনজনের টালিগঞ্জ অভিমুখে অভিযান।

মোটকথা বিশুও তো ছেলেমানুষ, একটা অ্যাডভেঞ্চারের আশায় রাজী হয়ে পড়ল শেষটায়।

কি রকম যুক্তি দেখিয়ে ঘোষণাকারীদের জব্দ করা হবে তারই আলোচনা করতে করতে রাস্তাটুকু কখন যে শেষ হ'ল কেউ লক্ষ্যই করে নি। হঠাৎ দেখে ১১ নম্বর বাড়ী, তার সামনে প্রকাণ্ড এক গাড়ী, আর ইয়া মোটা জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রলোক নামছেন তা থেকে।

তারপর? তারপর যা ঘটনা ঘটল তা উপন্যাসের মত চমকপ্রদ। তোমরা এখন বিশ্বাস করলে হয়! হঠাৎ কেষ্ট ফট্ করে এগিয়ে ভদ্রলোককে 'বাবা' বলে ডেকে টিপ্ করে এক পেন্নাম।

আর লীলা রাক্ষুসী একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে বলে, 'কই দিন্ টাকা!'

বিশু শুধু 'চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ'।

ছেলে পেয়ে ভদ্রলোক হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক করতে পারেন না।

'হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলি মানে? ব্যাপার কি? আজ আঠারো দিন আহার-নিদ্রা নেই কারুর। কি হয়েছিল বল্ তো?'

'ভাবলাম দেখি আপনারা আমায় কত ভালবাসেন। খোঁজবার চেষ্টা করেন কিনা!'

'বটে? দেখবি চল্, কেঁদে কেঁদে তোর মার অবস্থা!'

'মা? মা এসেছেন নাকি কলকাতায়? চলুন ভেতরে, লীলা এসো—বিশু এসো ভাই!'

'বাবু'বিহীন বিশু ডাকটা বিশুর কানে খট্ করে বাজে। তা ছাড়া আর একটা চিন্তা, এ চাকরটিও খস্‌ল, আবার সেই বাজার করা আর চাকর খোঁজা!

বাড়ীর ভেতর সে এক বিরাট কাণ্ড! হাসিকান্না, শাঁখ, উলু, চেঁচামেচি, হৈ-চৈ!

কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলে শুভেন্দুর মা বলেন, 'এ দুটি কে শুভু?'

'এরা? এরা?' শুভেন্দু মাথা চুলকে বলে, 'এরা আমার মনিব। পুরস্কারের টাকাটা এদের দুজনকে ভাগ করে দাও মা!'

বিশু আর লীলা লজ্জায় লাল।

... ...

এইখানেই গল্পের শেষ হতে পারতো—তবে একটু উপসংহার আছে, পাকা বিলিতি আমড়া আর ডাঁসা পেয়ারাগুলো ঝড়ে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়, সদ্ব্যবহারের লোক নেই, এটা লীলার পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। আফসোসটা কিন্তু বেশীদিন ভোগ করতে হয় নি। শুভেন্দুর মা এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। সেই থেকে শুভেন্দুদের বাড়ীতে কায়েমী হয়ে বাস করা শুরু করলো সে নিজের পদবীটা দবলে ফেলে রায় চৌধুরী হয়ে গিয়ে।

লীলাদের বাড়ীর সকলেই এতে সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট ছেড়ে আনন্দে অধীর। লীলার মা তো গদগদ। বিপদ শুধু পিসিমার। এবার তাঁকে কাশীবাস করতেই হবে। নতুন জামাইকে মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি, অর্থাৎ মুখ দেখাবার 'মুখ' রাখেন নি তো!

বিশু? তার কথা থাক্। বড় মর্মান্তিক। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কল্পনাটা মাথায় খেলে মাঝে মাঝে, এখনো ঠিক করতে পারে নি।

রাজযোটক

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

নিশ্চয়ই 'রুগী'। নাঃ, বাঁচতে আর দেবে না দেখি, আমাকেই শেষ পর্যন্ত রুগী করে ছাড়বে। কেন রে বাপু, ডাক্তার বলে কি মানুষ নয়? তার কি জীবনে এক দিনও শান্তিতে থাকতে ইচ্ছে করে না? কিন্তু উপায় নেই। ভগবানের ত্যজ্যপুত্র এই ডাক্তারগুলো।

উঠে পড়ে রিসিভার তুলে নিয়ে নিজেই শুরু করি, 'কি বলছেন? ব্লাডপ্রেসার? তা নয়? তবে? টাইফয়েড্? ম্যালেরিয়া? বাত-অজীর্ণ—বেরিবেরি? কিছুই নয়? তবে কি দেখতে যাবো? কনে?·····তোমায় বলতে দেব?·····আচ্ছা বলে যাও·····ও সুনীলের ভাই তুমি! দাদার জন্যে কনে দেখতে যেতে হবে?····· ভালো মুশকিল! আমায় আবার এসবের মধ্যে টানা কেন?·····দাদার ইচ্ছে? বেশ চল·····কোথায়?·····চাষাধোবা পাড়া? আচ্ছা, যাচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

রিসিভারটা ছেড়ে দিয়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি খুঁজতে শুরু করলাম। রুগী দেখতে যাই বলে, সুট্ পরে তো আর কনে দেখতে যেতে পারি না!

সুনীল, তার ভাই, আর আমি গেছি কনে দেখতে। উঃ, সে কি খাতির! এই দুর্মূল্যের বাজারেও ভদ্রলোক খাওয়ালেন প্রচুর। মেয়েটিও বেশ দেখতে। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, অত খেয়েদেয়ে কিছু আর মেয়ে অপছন্দ করা চলে না।

কিন্তু সুনীলের দেখি মুখের অবস্থা ভালো নয়। ভদ্রলোকদের যা-হয় একটা গোঁজামিল গোছের কথা বলে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললো, 'আমার পছন্দ নয়।'

আমি তো অবাক!

'কেন? চাষার মতও নয়—ধোবার মতও নয়, দিব্যি ভদ্রলোকের মেয়ের মত দেখতে!'

'নাকটা আরো লম্বা হওয়া উচিত ছিল।'

'বলিস্ কি? নাকের আবার উচিত অনুচিত বোধ? মানুষেরই সে বোধ থাকে না যে?'

'তা হোক, ও চলবে না।'

কাজেই মেয়ে দেখাই চললো।

যখন তখন ছুটছি, হয়তো 'মরো মরো' রুগী ফেলে, কনে দেখতে। বন্ধুর আবদার। কিন্তু বিয়ে আর দিয়ে উঠতে পারি না। কি করেই বা হবে? বিশ্বসুদ্ধ মেয়েই যদি বেখাপ্পা দেখতে হয়, বিয়ে হবে কি করে তাদের? কারুর চোখ ছোট, কারুর দাঁত বড়, কারুর রং ফরসা—গড়ন খারাপ, কারুর গড়ন সুশ্রী—রং কালো! কেউ 'বড্ড বেঁটে', কেউ 'বেজায় ঢেঙা', কেউ 'বিদ্‌ঘুটে রোগা', কেউ 'জালার মত মোটা'। মোটের মাথায় বিয়ে করবার মত মেয়ে বাংলাদেশে নেই!

অনেকের অনেক চা, পান, সিঙাড়া, সন্দেশ উদরস্থ করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'সুনীল, কনে যদি তোমার বরাতে কোনদিন জোটে, নেমন্তন্ন কোরো ভাই, খেয়ে যাবো। আমি আর দেখছি না।'

'কেন? কেন? রাগ করেছিস্?'

'রাগ আবার কি? আমার তো আর মেয়ে নয়? তবে পরের পয়সায় খেতে পারছি না আর।'

'ওঃ, এই কথা! মেয়ের বাপ হলে অমন খরচ করতেই হয়। কিন্তু রসগোল্লা খেয়েছি বলেই তো আর যা-তা মেয়ে বিয়ে করতে পারি না? একটা মেয়েও মানানসই নয়। ধর, চাষাধোবা পাড়ার সেই মেয়েটার মুখে যদি ভবানীপুরের মেয়েটার নাক জুড়ে দেওয়া যেত, কিংবা গোয়াবাগানের মেয়েটার মাথায় শ্রীরামপুরের মেয়েটার চুলগুলো, নয় তো বরানগরের মেয়েটার গায়ে লেক রোডের মেয়েটার রংটা লেপ্‌টে দেওয়া যেত—কেমন হ'ত?'

'চমৎকার! তোমার ঘাড়ের ওপর গণ্ডারের মাথা আর কোমরের নীচে হনুমানের ল্যাজ জুড়ে দিলে যেমন হ'ত ঠিক তেমনি!'

বলে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বেরিয়ে আসি ওদের বাড়ী থেকে। এরপরে আর যাই না, তবে মাঝে মাঝে শুনতে পাই সুনীল কনে দেখছে। দেখেই চলেছে—বাংলা দেশের সমস্ত মেয়েকে।

এ ছাড়া সুনীলের মা'র আছে হাজার দশেকের দাবী, আর তার মামার আছে 'কোষ্ঠির মিল'। কাজেই নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি। আর না হওয়াই ভালো বাবা, এই বাজারে লৌকিকতার ব্যাপারটিও তো সোজা নয়!

হঠাৎ একদিন সুনীল এসে হাজির, একগাল হাসি, এক-পকেট নেমন্তন্ন-পত্তর। বন্ধুমহলে নিজেই বেরিয়েছে নেমন্তন্ন করতে।

'কনে তা'হলে সত্যিই জুটলো তোর? কেমন দেখতে?'

'নিখুঁৎ।'

'সত্যি নাকি? কোথাকার মেয়ে?'

'সে বলতে গেলে অনেক কথা। দেওঘরে—মস্ত এক জমিদার-বাড়ীর মেয়ে। দেওঘরে আমিও বেড়াতে গেছি—ওরাও গেছে—সেখানেই দেখলাম। একটা সাঁওতাল ঝি নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে বেরোত—সন্ধান নিয়ে জানলাম আমাদের স্বজাতি। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই ঘটকালি···'

'লজ্জার মাথা এখনো ছিল অবশিষ্ট? তা যাক্—তোমার মামার বায়না?'

'তা মিটেছে, কোষ্ঠির মিল রাজযোটক!'

'আর তোমার মা'র?'

'তাও একরকম।' সুনীল লজ্জিতভাবে বলে, 'ওরা দশ হাজার দেবে বলেছে।'

'যাক্, বাঁচা গেল।'

অবশ্য আমাদের আর বাঁচাবাঁচি। বিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ করে একপাত লুচি, এই তো!

দেওঘরের জমিদার মশাই কলকাতায় এসে এক লম্বা-চওড়া বাড়ী ভাড়া নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছেন। উঃ, সে কী সাজানোর ঘটা! হ্যাঁ, বিয়েবাড়ী বটে একখানা—ফুলই কিনেছে বোধ হয় দুশো-চারশো টাকার! আর কত লোক, কত গাড়ী, কত কাণ্ড কারখানা!

লগ্ন উপস্থিত হ'তেই উৎফুল্ল মনে সম্প্রদান-সভায় গেলাম। আমি একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

কিন্তু এ কি? পিঁড়ি জুড়ে চেলির কাপড় মোড়া একটি ছোটখাটো জালা বসানো কেন? না হয় নতুন চেলির কাপড়ে একটু মোটা দেখাতে পারে, তাই বলে এত? দেখি সুনীলও উসখুস করছে। কিন্তু হাজার হোক বিয়ের বর, টোপর মাথায়, সদ্য শ্বশুরবাড়ী, বলেই বা কি বেচারা!

কিন্তু ছাঁদনাতলায় যেই না শুভদৃষ্টি হতে যাওয়া, ব্যস, কোথায় বা টোপর, কোথায় বা ফুলের মালা!

'জোচ্চুরি জোচ্চুরি!' রবে চীৎকার করে ওঠে সুনীল। ছিটকে সরেই আসে কলাতলা থেকে।

তুমুলকাণ্ড পড়ে গেল বিয়েবাড়ীতে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে মারতে যায়, কন্যাপক্ষ বরপক্ষের দিকে তেড়ে আসে। কন্যাকর্তা উভয়পক্ষের পায়ে পড়তে যান, মেয়েরা কুলো বরণডালা ফেলে কাঁদতে বসে। সেই ফাঁকে বামুনঠাকুররা ঘিয়ের টিন, আর চাকরবাকররা ছোট ছেলেমেয়ের গায়ের গয়না সরাবার ব্যবস্থা করে ফেলে।

সে এক দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপার!

কনে সেই 'সাঁওতাল ঝি' (অবশ্য সুনীলের ধারণায়)! ধারণাটা অবশ্য নেহাৎ অন্যায়ও নয়। একাধারে এরকম বিদ্‌ঘুটে মুখ, ঘুটঘুটে রং, আর 'কুমড়ো-পটাস' গড়ন দেখা যায় না। এক হিসেবে সত্যিই নিখুঁৎ।

জমিদার হলেও কনের বাপ, তিনি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেন, 'মশাই, আমার জোচ্চুরিটা কোথায় দেখান! জিজ্ঞেস করুন বাবাজীকে, আমি পঞ্চাশবার বলি নি—"বাবা, আগে মেয়ে দেখ তবে তো বিয়ে"? বাবাজী নিজেই বললেন, "না না, মেয়ে আর দেখাতে হবে না"। এখন এ কি ব্যবহার?'

সুনীল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কি করে জানবো এরকম মোটা বেঁটে কালো খাঁদা মেয়ে জমিদারের ঘরে জন্মায় ?'

আমি গম্ভীরভাবে বলি, 'উনিই বা কি করে জানবেন এরকম বোকা গাধা বেকুব উজবুক ভদ্রলোকের ঘরে জন্মায় ? কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি, ও আধাআধি যখন হয়েই গেছে, বাকীটা শেষ করে ফেলো।'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রং। কোষ্ঠিতে যখন রাজযোটক, ও চেহারার জন্যে খুঁতখুঁত করা কিছু নয়।'

সেই সুন্দরী মেয়েটি ? সে জমিদার মশাইয়ের এক বন্ধুর মেয়ে, দেওঘরে গিয়েছিল চেঞ্জে। আসলে সে বাঙালীই নয়, পার্শী !

বিধু ঠাকরুণের বিষয়-বৈরাগ্য

বিধু ঠাকরুণ রাগে গন্‌গন্ করতে করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাজটা গঙ্গাস্নানের বটে—সংকল্পটা সংসার ত্যাগের। অন্ততঃ দরাজ গলায় সেটা পাড়ার লোককে শোনাতে শোনাতে গেলেন ঃ

'ঝাঁটা মারো অমন সংসারের মুখে। ছিঃ ছিঃ, আমার যেমন মরণ নেই, তাই তোদের দোরে পড়ে আছি। আজ এই দিব্যি গেলে বেরুচ্ছি, এ পাপ-সংসারে আর না।'

পাশের বাড়ীর একটা মেয়ে মুচকি হেসে বলে, 'ও ঠানদি, সক্কালবেলা এত রাগ কেন ?'

'রাগ আবার কোথায় দেখলি লা ? রাগ কোথায় দেখলি ? এত অসহ্য সহ্য হয় না।'

'কেন ? কি হল ?'

'হল আমার মাথা! মোছনমান ছুঁয়ে ছিষ্টি জয় করা কেন—চুড়িওলির কাছে চুড়ি পরা কেন? বাজার থেকে কিনে আনলে হয় না? বলেছি বলে আবার ঠাট্টা-মস্করা-হাসি! আমি "শুচিবাই", আমি "সেকেলে"!'

'বালাই ষাট্! তুমি আবার সেকেলে কোথায় ঠানদি? সবে তো এই বছর কুড়ি বয়স, সংসারের জ্বালায় চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বৈ তো নয়!'

'বটে? আবার তুইও এলি লাগতে? সব ষড়যন্তর, বুঝি না কিছু? আচ্ছা, আমিও এই চললাম—চললাম—চললাম, এ ভিটেয় আর যদি পদাপ্পন করি—'

শপথের মন্ত্রটা উচ্চারণ না করেই টগ্‌বগ্‌ করে এগিয়ে যান বিধু ঠানদি। সত্যিই তিনি আজ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছেন সংসার ছাড়বার। সত্যিই, কেনই বা এত কষ্ট পাওয়া? কেউ মানে না, কেউ গ্রাহ্য করে না যখন, তখন কোনোখানে তীর্থে-মির্থে বাস করলেই হয়। তবু পরকালের কাজ হবে। আর এ কি? এ তো ভূতের ব্যাগার খাটা। এই যে সকাল থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত খেটে মরলেন ঠানদি, এতে কি লাভ হ'ল তাঁর?'

খানিক দূর যেতেই পিছন থেকে ডাক পড়ল, 'ও ঠা'মা, ঠা'মা গো, অত জোরে জোরে ছুটছ কেন? আমার পা যে ব্যথা হয়ে গেল।'

ঠা'মা পিছন ফিরে দেখেন, সেজ ভাইপো-বৌয়ের মেজ মেয়েটা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসছে। দেখে তো বিধু ঠাকরুণ রেগেই আগুন, বলেন, 'তুই আবার আসছিস যে টেঁপি? যা বাড়ী যা। ছুটে ছুটে আসছেন! কেন আমার সঙ্গে তোদের কি সুবাদ রে? বাপের পিসি আবার "ঠাকুমা"! আরশোলাও তা'হলে পাখী! যা যা পালা। কেন, ভালো ভালো মা আছে বাড়ীতে, যা না তাদের কাছে!'

মেয়েটা এসব কথায় কর্ণপাত মাত্র না করে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে আসে, আর বলে, 'বাঁ রে, তুঁমি যেঁ বঁলেছিলে—বাঁ রে, তুঁমি যেঁ বঁলেছিলে—'

কি বলেছিলেন সেটা অবশ্য উহ্যই থাকে।

গঙ্গাস্নানের সঙ্গী হিসাবে এক-একদিন এক-একটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে যান বিধু ঠাকরুণ, তল্‌পি বইয়ে। কিন্তু আজ যখন সংসার ছেড়েই আসছেন, তখন আর তাদের ছেলেমেয়ে আনা কেন?

মেয়েটা কিন্তু না-ছোড়। শেষ পর্যন্ত গামছা আর তসর কাপড়ের পুঁটলিটি বগলদাবা করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিধু ঠাকরুণ চলার স্পীড্‌টা একটু কমিয়ে ফেলে বলেন, 'তুই যে এলি, কার সঙ্গে যাবি?'

'কেন, তোমার সঙ্গে!'

'আমি আর তোদের বাড়ী ফিরছি না। অমন অছেদ্দার সংসারে বিধু ঠাকরুণ থাকে না। আমি যখন সকলের দু'চক্ষের বিষ—'

'আমিও ফিরছি না।' টেঁপি আপন মনোভাব ব্যক্ত করে, 'আমাকেও কেউ দেখতে পারে না ঠা'মা, মা বলে "দু'চক্ষের বিষ"—'

'তা বলবে বই কি, ভারী আস্পদ্দা হয়েছে যে! নেহাৎ নাকি ফিরব না তাই, নইলে গালমন্দ করা বের করে দিতাম তোর মার!'

টেঁপি হৃষ্টচিত্তে বকবক করতে করতে যায়, 'তাহলে কোথায় আমরা থাকব ঠা'মা? গঙ্গার ঘাটে? আমি তোমাকে বাটনা বেটে দেব ঠা'মা।'

'থাক্ আমার বাটনায় কাজ নেই। পরের মেয়ের হ্যাঁপা সামলাতে পারব না বাছা।'

ঘাটের কাছাকাছি আসতেই টেঁপি বলে ওঠে, 'ও ঠা'মা, দেখ একটা সন্নিসি ঠাকুর—'

বিধু ঠাকরুণ তাকিয়ে দেখলেন, শিবমন্দিরের ডানধারে যে বুড়ো অশথ-গাছটায় মেয়েরা স্নান সেরে উঠে আসবার সময় জল দিয়ে আসে, তারই শান-বাঁধানো তলাটায় এক বাঙালী সাধু বসে।

জটা-ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিভূতির বালাই না থাকায় বিধু ঠাকরুণের মনঃপূত হ'ল না, 'মরণ আর কি, সন্নিসি না ঢেঁকি'! বলে তিনি এগিয়ে চললেন, কিন্তু টেঁপি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'ও ঠা'মা, ওটা গণৎকার, দেখছ না ওদের হাত দেখছে?'

'গণৎকার' শুনেই বিধু ঠাকরুণও দাঁড়িয়ে পড়লেন। নাঃ, হাতটাই একবার দেখানো দরকার। কিসে একটু শান্তি পাওয়া যায়, জেনে নেওয়া ভালো। কই কাল

তো ছিল না মানুষটা! কখন এল?

সাধু মহারাজ ইতিমধ্যে বেশ কায়েমী হয়ে বসেছেন।

গাছের গুঁড়ির গায়ে হাতের পাঞ্জা আঁকা একখানা চৌকো টিন ঝোলানো, চার কোণে চার টুকরো ইট চেপে একখানা বড় কাগজ মাটিতে বিছানো, তাতে 'মৎস্য রেখা', 'ধনু রেখা', 'পতাকী চক্র', 'ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন' প্রভৃতি আঁকা। একখানি কলঙ্ক-পড়া পিতলের থালায় গুটিকয়েক 'হাফ আনি'। কাছে খান দুই হাতেলেখা পুঁথি। এই ক'টি অমূল্য সম্পত্তি তার সম্বল।

যে মহিলাটি হাত দেখাচ্ছিলেন, তিনি প্রণামী দিয়ে উঠে যেতেই বিধু ঠাকরুণ উবু হয়ে বসে পড়ে বাম হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার হাতখানা একবার দেখে দাও দিকিন বাবা!'

গণৎকার ঠাকুর বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্যে হাতখানা বারকয়েক উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'আপনার মনে বড় অশান্তি মা!'

'যা বলেছ বাবা, তুমি অন্তরযামী! অশান্তির জ্বালায় জ্বলে মরছি, কবে এ বন্ধন থেকে মুক্ত হব—কিসে শান্তি পাব, বলে দাও বাবা!'

'ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ' তিনবার মাথাটি নেড়ে বলেন, 'সংসারকে না ছাড়লে কি সংসারের জ্বালা ঘোচে মা? বন্ধন আপনি ত্যাগ করতে হবে।'

'আমি "ছাড়বো" বললে আর কি হবে বাবা, সংসার ছাড়ে কই?'

'ছাড়বে ছাড়বে। ছাড়বে কি, ছেড়েছে! তাইতেই তো এত অশান্তি মা! ধরুন আপনি চিরদিন যাদের জন্য খেটে মরলেন, আজ তারা মানুষ হয়ে আপনাকে মানলো না, অগ্রাহ্য করলো।'

'ঠিক বলেছ বাবা, মনের কথাটি টেনে বলেছ, মোটে মানে না। ছেলেবুড়ো সবাই অগ্রাহ্যি করে, বলে, "বুড়ী" "শুচিবাই" "সেকেলে"! নাত-বৌটা আবার "মিসেস দুর্বাসা" না কি বলে, মানেও বুঝি না ছাই! ওই সব দুঃখে সংসারে থাকবার আর ইচ্ছে নেই।'

'বেশ তো, কাশীবাস করুন না! আপনার হাতে তীর্থমৃত্যু-যোগও রয়েছে দেখছি।'

'আর তীর্থমৃত্যু ! সে আর এ পোড়া অদেষ্টে হচ্ছে না। তুমি বরং ওদের মতিগতি যাতে ভালো হয়, তার তরে একটা ওষুধ দাও বাবাঠাকুর !'

'ভবরোগের কি ওষুধ আছে মা ?' বাবাঠাকুর মৃদু হাসির আভাস মুখে এনে বলেন, 'হ্যাঁ আছে বটে ওষুধ আমার গুরুদেবের কাছে, যে যা চায়, পায়। কাশীতে মস্ত আশ্রম, নবদ্বীপেও আশ্রম আছে। মাসে মাসে কিছু গুরুপ্রণামী দিলেই—ব্যস্, থাকা খাওয়া সব অম্‌নি।'

বিধু ঠাকরুণ মনে মনে বলেন, 'মর মিন্‌সে, "প্রণামী"ই যদি দিলাম তো অম্‌নি থাকা কিসের ?' মুখে বলেন, 'ওসব আশ্রম-ফাশ্রমের কথা এখন বাদ দাও তুমি, বরং তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে একটা বাতের মাদুলি আনিয়ে দাও দিকিন, খরচ যা লাগে দেব। বড় ভাইপোটা আজ ছ'মাস বাতে কষ্ট পাচ্ছে। আর অমনি অম্বল শূলেরও একটা, মেজ বৌমার মায়ের জন্যে নেব।'

'ওই তো মা, ঘুরে ফিরে সেই মায়ার বন্ধনেই জড়াচ্ছেন !'

বিধু ঠাকরুণ বিরক্তভাবে হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, 'জড়াব না বললেই অমনি হ'ল ? তোমার যে গা-জুরি কথা বাছা, বড় ভাইপোটা ছ'মাস ধরে বাতে পঙ্গু, মেজোর "বেলাড্‌পেসার", ছোট বৌয়ের কোলে কচি ছেলে, বড় নাতনীটা আঁতুড়ে, নাতবৌর আজ-কাল ছেলে হবে,—এই সব আতান্তর, আর আমি অমনি ধেই ধেই করে কাশী-বিন্দাবন করে বেড়াব ?'

যেন বাবাঠাকুরের খর্পরে পড়বার ভয়েই বিধু ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

ঠাকুর একবার করুণ নয়নে চেয়ে বলেন, 'মাদুলি নিতে আসবেন না ?'

'দেখি বাছা'—বলে বিধু ঠাকরুণ কথার জের মেরে দেন।

কি জানি কথার প্যাঁচে ফেলে যদি সত্যিই সংসারমুক্ত করে ছাড়ে ! এসব সর্বনেশে লোক ! এদের কবলে পড়লে আর রক্ষে আছে ?

বিধু ঠাকরুণ চলবার উপক্রম করতেই টেঁপি বলে ওঠে, 'পয়সা দিলে না ঠা'মা ?'

'ন্যাকা মেয়ে' বলে অলক্ষ্যে মেয়েটাকে একটা অন্তর-টিপুনি দিয়ে বিধু ঠাকরুণ আঁচলের খুঁট খুলে একটি পয়সা, সত্যিকারের তামার পয়সা, পিতলের থালাখানার ওপর ফেলে দিয়ে গট্‌গট্ করে চলে যান।

তামার পয়সা বিধু ঠাকরুণের স্টকে এখনো আছে এবং সুবিধে পেলেই গঙ্গার ঘাটে, ঠাকুর-মন্দিরে বা বাড়ীর পুরুতের কাছে হাফ আনি ভাঙ্গিয়ে তামার পয়সা করে রাখেন। যেখানে এক পয়সায় কাজ চলে, সেখানে কেনই বা দু-দুটো পয়সা খরচ করবেন? পয়সা কি গাছে ফলে?

ঘাটে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বিধু ঠাকরুণ।

বান্ধবীদের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে গঙ্গায় ডুব, সূর্য প্রণাম, ইত্যাদি সেরে নিয়ে হৃষ্টমনে বলেন, 'চল দিকিন টেঁপি, একবার বাজারটা ঘুরে যাই।'

টেঁপি তো তাই চায়।

বিধু ঠাকরুণ ঘুরে ঘুরে বাজার করেন, 'দোমালা নারকেল একটা নিই, কি বলিস টেঁপি? তোর ছোট কাকা কাল মুড়ি-নারকেলের কথা বলছিল। শশাও নিই দুটো, ন-বৌমা ভালবাসে। তেলেভাজা খাবার চারটি নেব নাকি রে? সুধা বড্ড ভালোবাসে।'

টেঁপি একবার করুণভাবে বলে, 'তুমি যে বললে ঠা'মা, আর বাড়ী যাব না আমরা? গঙ্গার ঘাটেই থাকব?'

'দূর পাগলী! কথার ছিরি শোনো! রোস্, আগে মরি, তোর বাবা-কাকারা আমায় কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে এসে ঘাটে রেখে যাবে। নে চল্ চল্, তুই যেন যেখানে যাবি বাঘের মাসী! পুতুল খেলনা দুটো নিতে হবে তো!'

'না ঠা'মা, ওই কলের গাড়ীটা—'

'কলের গাড়ীর যে বড্ড দাম লা! নে, সাধ হয়েছে নে···অ দোকানী, কত দাম বাছা এটার? সাড়ে ছ'আনা? বল কি, গলায় ছুরি দিচ্ছ যে? আছে কি এতে—দু'ফালি টিন বৈ তো নয়? পাঁচ আনায় দেবে না? নাও ছ'গণ্ডাই পুরো নাও—তোমাদেরই রাজত্ব পড়েছে। দাও ওই গোপাল দু'খানা দাও, আর ওই লাল পাখীটা। রথ কত করে? দু' আনা? দু'খানা—না, খান-চারেকই দাও।···সুধার ছেলেটা রয়েছে—পাখীটা নেপির থাক, কি বলিস টেঁপি? নাকি একটা বাঁশীও নেব? তোর কলের গাড়ী দেখে যদি কাঁদে?'···

হ্যাঁ গ্যা, ওই বড় খোকা-পুতুলটা কত? বারো আনা?···

এ্যাঁ, একটা মাটির ঢিপি বারো আনা? বল কি গো বাছা? নাঃ, জিনিসপত্তর

আর তোমরা কিনতে দেবে না! কচি ছেলের জিনিস, একটু সস্তামস্তা করে দাও দিকিন। এক পয়সাও কম হবে না? নাও নাও। ঝকমারি আর কাকে বলে?··· নে দিকিন টেঁপি, বাগিয়ে ধর, আবার যেন পথেই ভেঙে শেষ করিসনে। সে গুণে তো ঘাট নেই।'

টেঁপি লুব্ধনয়নে বড় পুতুলটা নাড়াচাড়া করে বলে, 'এটা কার জন্যে কিনলে ঠা'মা?'

'আছে আছে, দেবার লোক আছে, চল দিকিন পা চালিয়ে। তুই যেখানে যাবি বাঘের মাসী, পথে বেরোলে আর বাড়ীর কথা মনে থাকে না, না?'

ভগবান ভূত

অপরাধের মধ্যে হয়েছিল একটা বিষফোড়া। ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াতেই ডান হাঁটুটা কেমন খচ্ করে উঠলো, দেখি, একটি অকালপক্ক ফুসকুড়ি, যাকে বিষফোড়া বলা চলে।

ঠাকুমার কুটনোর ঝুড়ি-চুপড়ির কাছে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললাম, 'ঠাকুমা, দেখ তো এটা কি হ'ল?'

ঠাকুমা এক নজরেই চিনে ফেলে শিউরে উঠলেন, 'সর্বনাশ! পেকেছে যে! যা শীগগির একটু চুন লাগিয়ে দে। হাঁটুর ওপর, জায়গা ভালো নয়।'

ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা চুন লেপে দিলাম।

বাবা বললেন, 'পায়ে কি লাগিয়েছিস্ রে?'

'চুন।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'ফোড়া হয়েছে। ঠাকুমা বললেন—'

'সর্বনাশ করেছে! ফোড়ায় চুন? শীগ্‌গির ধুয়ে ফেলে আইডিন দাও দে—

একটুও দেরি নয়, যদি ভালো চাও—'

ঘাবড়ে গিয়ে চুন ধুয়ে ফেলে আইডিন লাগালাম, ঘষাঘষিতে ছিঁড়ে গিয়ে দারুণ জ্বলতে শুরু করল।

মা যাচ্ছিলেন ভাঁড়ার ঘরে, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ও কি? পায়ে কি হ'ল রে? লাফালাফি করছিস কেন?'

'ফোড়া হয়েছে। আগে চুন দিয়েছিলাম, এখন আইডিন দিয়েছি। ভীষণ জ্বলছে।'

'কী ভয়ানক! চুন আর আইডিন? দুই-ই সমান। কিছু করতে হবে না, 'জাম্বাক' দিয়ে রাখ, সেরে যাবে। ফোড়ায় আইডিন—সবই অনাসৃষ্টি! কে বলেছে আইডিন দিতে?'

'বাবা যে বললেন।'

'বলুন, তুই আইডিন ধুয়ে ফেল। জ্বালায় ছটফট করছিস্!'

আইডিন ধুয়ে ফেলে জাম্বাক লাগিয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসেছি, হঠাৎ ছোট কাকার আবির্ভাব।

'এই ক্ষণে, তোর নাকি কোথায় একটা প্রকাণ্ড ফোড়া হয়েছে?'

'প্রকাণ্ড নয়, এই টুকুন।'

'ওই টুকুনই প্রকাণ্ড হ'তে পারে। কি দিয়েছিস্?'

'জাম্বাক।'

'কী সাংঘাতিক! ফোড়ায় জাম্বাক? কে তোমায় এ সর্দারি করতে বলেছে হাঁদারাম?'

'মা। আগে চুন, তা'পর আইডিন, এখন এই—'

'চমৎকার! সব ক'টিই সমান ওষুধ। যাও এখুনি কার্বলিক সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে "বোরিক কম্প্রেস" করো গে। যদি বাঁচতে ইচ্ছে থাকে দেরি কোরো না। ওই থেকে যে কী না হতে পারে—'

সামান্য বিষফোড়া থেকে যে কতদূর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ছোট কাকা।

যাক্, বাঁচবার ইচ্ছে বিলক্ষণ ছিল, ছুটোছুটি করে কার্বলিক সাবান ঘষে আইডিন ধুয়ে ফেলে 'কম্প্রেস' করতে বসলাম। তখন বেশ একটু ঘায়েল হয়ে গেছি। হাঁটুটা দারুণ টন্‌টন্ করছে। জ্বালা তো ছিলই।

দৈবক্রমে অথবা আমারই দুর্ভাগ্যক্রমে দুপুরবেলা রিক্‌শা চড়ে বড় পিসিমা এলেন বেড়াতে। পড়বি তো পড় আমার হাঁটুতেই চোখ।

'কি হয়েছে রে ফণু? পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন?'

'এই পিসিমা, একটা ফোড়া হয়েছে।'

'ফোড়া হয়েছে! তা বেঁধে রেখেছিস কি বলে? বিষিয়ে উঠবে যে! খুলে ফেল্—খুলে ফেল্! কী কাণ্ড! কে বলেছে বাঁধতে?'

পিসিমা নিরীক্ষণ করে দেখে নিয়ে বিজ্ঞভাবে মতামত ব্যক্ত করেন!

'জিনিসটি সোজা হয় নি বাছা, ভোগাবে। এই বেলা প্রতিকার কর। তোমাদের ওসব "কম্‌প্রেস" "ফম্‌প্রেস" বুঝি না বাপু, ফোড়ায় আবার গরম দেওয়া কেন? শোন্ বলি একটা ওষুধ, অব্যর্থ। কাঁচা হলুদ বাটা আর নারকেল পাতা পোড়া ছাই, খাসা করে কেরোসিন তেল দিয়ে ফেনিয়ে বারকতক লাগাবি, একেবারে সেরে যাবে। পাথরে লাগালে পাথর সুদ্ধু ক্ষয়ে যায়, তা ফোড়া! একদিনে মিলিয়ে যাবে।'

ঠাকুমার উদ্যোগে দুষ্প্রাপ্য জিনিস সহজপ্রাপ্য হয়ে গেল, আমিও বড় পিসিমার চিকিৎসায় চিকিৎসিত হয়ে মনে করলাম, যাক্ বাবা, ফোড়া আর ফাঁড়া দুই-ই কাটলো।

হায় ঈশ্বর! সব কথাগুলো যদি তলিয়ে বুঝতাম। যা পাথরে লাগালে পাথর ক্ষয়ে যায়, তাতে যে সামান্য মানুষের হাড়-চামড়াগুলো ক্ষয়ে যাবে এ আর বেশী কথা কি! জ্বালা-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে বারকতক লাগাতেই চর্ম-মাংস ভেদ করে, বা বিভেদ করে, হাঁটুর হাড় ফুটে উঠলো!

প্রকাণ্ড একখানি ঘা! হাঁটু নাড়তে পারি না। ইজিচেয়ার আশ্রয় করে পড়ে আছি।

বন্ধু এল, বাংলার নম্বর যোগাড় করে।

বললে, 'কিরে, ঠ্যাং খোঁড়া করে বসে আছিস? কি হয়েছে?'

আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলি। চুন থেকে কেরোসিন পর্যন্ত।

বন্ধু শিউরে স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশেষে বাক্যস্ফূর্তি হলে বলে, 'করেছিস কি? খুনের দায়ে ফাঁসি দিতে হয় তোকে! এখনো সাবধান হও, তা নয় তো পা-টি কেটে বাদ দিতে হবে।'

কবে তার মামার ভায়রাভাইয়ের সামান্য একটু ছড়ে যাওয়া থেকে পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল তারই বিবরণ শোনায়, বেশ ঘোরালো আর জোরালো ভাষায়।

কাতর প্রশ্ন করি বন্ধুকে, ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে।

'কিছু না, স্রেফ "ঢোল কোম্পানীর" মলম ঘষে দাও। এক ঘণ্টায় ফিনিস!'

'সেটা কি ফোড়ার ওষুধ?' সসঙ্কোচে প্রশ্ন করি।

'আরে বাবা, কারুর ওপরই ওর পক্ষপাত নেই। গরু হারালে গরু পাওয়া যায় ওতে।'

বন্ধু চলে গেল, আমিও 'ঢোল কোম্পানীর' সেই অত্যাশ্চর্য কি মলম আছে, তারই সন্ধানে বাজারে লোক পাঠালাম।

হ্যাঁ, বন্ধু ঠিকই বলেছিল বটে, এক ঘণ্টায় ফিনিস!' তবে রোগ নয়, রোগী। এ্যায়সা জ্বালা শুরু হ'ল যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যে 'ফিনিস' হতে পারব সে সম্বন্ধে আর সন্দেহমাত্র থাকল না। শেষ পর্যন্ত বাড়ীময় দাপাদাপি।

মা, ঠাকুমা, জেঠিমা, খুড়িমারা যখন শশব্যস্তে 'জল' 'পাখা' 'আহা' 'উহু' করছেন, কোথা থেকে জামাইবাবু এসে উপস্থিত।

আশ্চর্য! দেশসুদ্ধু লোক যেন আজ পণ করেছে আমাদের বাড়ী আসতে।

'কী হে, তোমার আবার হ'ল কি?'

বে-দরদে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

আবার ইতিহাস আওড়াই, অবশ্য 'ঢোল কোম্পানীর' কথাটা নতুন যোগ করতে হয়। আরো করুণ হয়ে ওঠে মুখ-চোখ।

'এ্যাঃ তুমি একটি একনম্বর "ইয়ে"! সামান্য ব্যাপারে এত কাতর? বিছানাই নিয়েছ একেবারে? আমরা তো এরকম পা নিয়ে ফুটবল খেলি হে! হাঃ হাঃ হাঃ! উঠে পড়ো উঠে পড়ো। বলি শোন—একখানি পাতিলেবু ঘষে, সৈন্ধব নুনের জল দিয়ে

ধুয়ে ফেলে, ছুটোছুটি করে বেড়াও গে। হাঁটুর ঘায়ের ওষুধ যদি কিছু থাকে তো দৌড়ঝাঁপ। শুয়েছ কি আড়ষ্ট!'

লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাই। লোকে এই নিয়ে ফুটবল খেলে, আর আমি? লেবু আর লবণের যথাযোগ্য ব্যবহার করে দৌড়ঝাঁপ করতে চেষ্টা করি, ফুটবল খেলার ভঙ্গিতে।

তবে কতক্ষণ করব? সারা পা-টা, পাতা থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আর যন্ত্রণায় বিষ খেতে ইচ্ছে করছে।

রাত্তির নটা বেজে গেছে। জামাইবাবু যাব যাব করছেন, এমন সময়, বললে বিশ্বাস করবেন না—শ্রীরামপুর থেকে ছোট পিসেমশাই এলেন।

এলেন, প্রশ্ন করলেন, শুনলেন সব বিবরণ। মন্তব্য করলেন, 'তা ঘুরে বেড়াচ্ছ মানে? বলি ঘুরে বেড়াচ্ছ কোন্ সাহসে? শীগ্‌গির শুয়ে পড়। এই উঠে হেঁটেই বাড়িয়েছ জিনিসটি। আমার একটি বন্ধুর ছেলের সামান্য একটু সাইকেলের ধাক্কায়, যাক্ বলে আর ভয় বাড়াব না তোমার। মোটকথা তিন মাস পা-টি প্লাস্টার করা আছে ছেলেটার। তুমি বাপু যদি ভালো চাও তো বিছানা নাও। খাওয়া-দাওয়া সব শুয়ে করবে। হ্যাঁ, আর শোনো বাপু—নাঃ, তোমার মাকেই বলে যাই।···বৌদি, এক কাজ করবেন, তামাকপাতা আর গন্ধক, হুঁকোর জল দিয়ে খাসা করে বেটে প্রলেপ দিন, আরাম হয়ে যাবে। কার্বঙ্কল পর্যন্ত সারে ওতে। বড় ভালো জিনিস।'

অলক্ষিতে মার কাছে হাত জোড় করলাম, ফল হ'ল না। হিতৈষী পিসেমশাই নিজেই জিনিসগুলো যোগাড় করে এনে বাটিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে লাগিয়ে তবে গেলেন। আর বার বার পরামর্শ দিয়ে গেলেন শুয়ে থাকবার জন্য।

অবশ্য অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। দাঁড়ানো দূরের কথা, বসে থাকারও শক্তি লোপ পেয়েছে।

পরদিন সকালে উঠতে পারি না। পা নড়াবার ক্ষমতা নেই, প্রবল জ্বর।

বাবা ডাক্তার ডাকতে গেলেন, জেঠামশাই কবিরাজ ডাকতে। অদৃষ্টে আরো কি আছে, তাই ভাবছি শুয়ে শুয়ে।

রেডিমেড প্রেস

"ভবতারিণী প্রেসের" প্রোপ্রাইটর অমিয় মুখুজ্জে আমার সাক্ষাৎ পিসতুতো দাদার খুড়তুতো ভগ্নীপতি। দরকারের সময় এরকম সম্বন্ধকে নিকট আত্মীয়ের দলে ফেলা চলে নিশ্চয়। চলে না? তাছাড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন রীতিমত আলাপ রয়েছে পিসিমার বাড়ীর যোগসূত্রে!

বন্ধুরা এখন আমাকে ধরে বসেছে।

ব্যাপারটা এই। আমরা অর্থাৎ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে কিছুদিন ধরে একটা হাতে-লেখা মাসিকপত্র চালাচ্ছি। অবিশ্যি এতে নতুনত্ব কিছুই নেই, আমাদের ঠাকুর্দার আমল থেকে সকল ছেলেই বোধ হয় জীবনে একবারও অন্ততঃ এ কাজ করেছে।

প্রথমটা মাসের পয়লা তারিখেই বেরোয়, চামড়ার বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, মুক্তোর মত অক্ষরের সারি। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! তারপর আস্তে আস্তে 'মাসিকপত্র' 'দ্বৈমাসিক' বা 'ত্রৈমাসিক' পত্রে দাঁড়ায়, বাঁধাই খরচার চাঁদা ওঠে না, যার হাতের লেখা ভালো সে একলা আর অত লিখতে চায় না, যে যার রচনা নিজেরা লিখতে বাধ্য হয়, ফলে সম্পূর্ণ বইখানা একটি হস্তলিপির চিড়িয়াখানা হয়ে দাঁড়ায়। শেষকালে আর 'সম্পূর্ণও' হয়ে ওঠে না, অসমাপ্ত বইখানা কোনো একজন দীর্ঘসূত্রী লেখকের বাড়ী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পড়ে থাকে, পশ্চাৎবর্তী লেখকরা তাগাদা দিয়ে দিয়ে হাল ছেড়ে দেয়, অবশেষে পত্রিকা আর বেরোয় না।

এই অকাল মৃত্যুর জন্য এ 'ওকে' এবং ও 'একে' দায়ী করতে থাকে, বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটে যায় অনেক ক্ষেত্রে। তারপর বা অতঃপর বাজার-চলতি পাঁচটা সাপ্তাহিক বা সিনেমার কাগজে উদীয়মান তরুণ লেখকদের মধ্যে এঁদের

কারুর কারুর নাম দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যস্।

একবার ছাপার অক্ষরের আস্বাদ পেলে আবার হাতের লেখা? আরে ছোঃ! যে কোনো বড় সাহিত্যিকেরও জীবন ইতিহাসের গোড়ার পাতাটা প্রায় এই রকমই। কাজেই হাতের লেখা মাসিক পত্রের মধ্যে যেমন নতুনত্বও নেই, তেমনি অগৌরবও কিছু নেই।

নতুনত্বের বিষয় হচ্ছে—বন্ধু-বিচ্ছেদ হবার আগেই আমরা সরাসর পত্রিকাখানা ছাপতে চেষ্টা করছি। এদিকে—চাঁদা যা উঠেছে সেটা উচ্চারণযোগ্য নয়, পকেটের রেস্তও তথৈবচ। কাজেই বিনা খরচে কিছু হয় কিনা তারই একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে বন্ধুরা আমাকে ঠেলে-ঠুলে এখানে পাঠিয়েছে, কারণ—'ভবতারিণী প্রেসের' প্রোপ্রাইটর অমিয় মুখুয্যে আমার সাক্ষাৎ পিসতুতো দাদার খুড়তুতো ভগ্নীপতি।

দরকারের সময় এমন একটা নিকট সম্বন্ধকে কাজে লাগাব না? তবে আবার 'আত্মীয়' কথাটা আছে কেন বাংলা ভাষায়? কিন্তু এসে পর্যন্ত অমিয়বাবুর টিকি দেখতে পাচ্ছি না।

আড়াই ঘণ্টা বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে উঠে পড়ছি এমন সময়—সাধু ভাষায় যাকে 'হন্ত-দন্ত' বলে সেই ভাবে ঘরে ঢুকে অমিয়বাবু পাখার রেগুলেটারটা শেষ পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'কী হে উঠছো না কি? খুব যেন চটেছ মনে হচ্ছে?'

গম্ভীরভাবে বলি, 'নাঃ চটাচটি আর কি! দুটোর সময় এসেছি আর এই চারটে বাজে। এতক্ষণ বসে থাকায় অনেক অসুবিধে হয়ে গেল এই আর কি। এসেছিলাম একটা কাজে, যাক্ গে, আর একদিন হলেই হবে।'

'ওই তো! চটে যাওয়ার আবার হাত-পা আছে নাকি? বোসো বোসো ভায়া! আরে ভাই, তোমরা তো রাগ করে খালাস, আমার অবস্থাটা যদি বুঝতে? এত বড় একটা বিজনেস একলা চালানো কি সোজা কথা?'

অবাক হয়ে বলি, 'সেকি, আপনার এখানে তো বিস্তর লোক খাটছে দেখলাম।'

'ওই শুনতেই বিস্তর রে ভায়া, আসলে সব সাজানো পুতুল। বসে বসে

চা সিগারেট পান দোক্তার শ্রাদ্ধ করছে আর আড্ডা দিচ্ছে—ব্যস হয়ে গেল কর্তব্য। আমি যেটি না দেখবো সেটিই উল্‌টো চণ্ডী হয়ে বসে আছে। এই তো—এত দেরি হ'ল কেন? প্রফেসর খাসনবিশ—ওই যে যাকে তোমরা "যাদুর রাজা" না কি বলো—সেই ভদ্রলোক "আড়াই টাকায় ম্যাজিক-শিক্ষা" নামে একটা বই ছাপাতে দিয়ে গিয়েছিলেন—বোধ হয় আড়াই মাসের বেশী হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত এক ফর্মা দেখাতে পারলাম না। প্রেসের বদনাম নয় এটা? প্রফেসর তো মহা খাপ্‌পা, কদিন ফোন করছিল—আজ একেবারে সশরীরে এসে হাজির। নাও ঠ্যালা! আরে বাবু আমি আর কদিক দেখবো? কালিঝুলি মেখে তো আর হরফ সাজাতে বসতে পারি না?'

প্রবলবেগে পাখা ঘুরতে থাকলেও অমিয়বাবু টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে হাওয়া খেতে শুরু করেন। 'কদিক দেখা' ছেড়ে অমিয়বাবু কোন দিকই দেখে উঠতে পারেন কিনা ভগবানই জানেন। এই রকম মোটা মানুষরা যে কী করে পৃথিবীতে চরে খায়, তাও সেই ভগবানই বলতে পারেন।

কিন্তু আপাততঃ যা শুনলাম তাতেই চমকে গেলাম একেবারে। 'প্রফেসর খাসনবিশ' 'যাদুর রাজা খাসনবিশ' এই বাড়ীতে এই মাত্তর এই অমিয়বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে গেছে? হায়! হায়! আগে যদি শুনতাম, একবার চোখের দেখাও দেখতাম লোকটিকে। ছেলেবেলা থেকেই আমার এই সব জিনিসে খুব ঝোঁক।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে কখনো একটা ভালো ম্যাজিক দেখার সুযোগ ঘটে ওঠে নি। পথে ঘাটে যে সব ছোটলোক বেদেরা ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায় তাদের ছাড়া ভাল লোকের আর কই দেখলাম?

এই তো প্রফেসার খাসনবিশ, পৃথিবীবিখ্যাত লোক বললেই হয়। দেশ বিদেশে কত কীর্তিকলাপ করে বেড়াচ্ছেন, শুধু কাগজের মারফৎ তার পরিচয় পেয়ে আসছি, আর দেখতে পেলাম না বলে হায় হায় করছি। আমাদের বাড়ীটি হচ্ছে তেমনি! রান্না খাওয়া, আর বাজার দোকান ছাড়া যে পৃথিবীতে আর কিছু আছে, এ আমাদের বাড়ীর ওপরওলারা মানতেই চান না। সেবারে তবু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একবার খাসনবিশের ম্যাজিক দেখবার কথা হ'ল। বাড়ীসুদ্ধু সকলের

টিকিট কেনা হয়েছে, অধীর আগ্রহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, হঠাৎ খেলাম এক আছাড় কলতলায়। বাড়ীসুদ্ধু সকলে আমার নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল আর আমি বাড়ীতে পড়ে ভাঙা ঠ্যাঙের সেবা করতে লাগলাম।

সেই প্রফেসর খাসনবিশ!

ছোড়দার মুখে যাঁর যাদুবিদ্যার দুর্দান্ত কাহিনী শুনে মনে হয়েছিল সেই অপূর্ব ব্যাপার যে না দেখতে পেলো তার মরা বাঁচা সমান।

হায় ভগবান! ম্যাজিক না দেখি লোকটাকেও তো একবার দেখতে পেতাম চর্মচক্ষে! চিরদিনই কি সুযোগ আমার নাগালের মধ্যে থেকে পালিয়ে যাবে?

অমিয়বাবু বললেন, 'কি হে অমল, "বুঝ ভুষুল" হয়ে গেলে কেন?'

বললাম, 'আর কেন? ভদ্রলোককে পার করে এসে তবে বললেন। আগে বললে একবার চোখের দেখা দেখেও জীবন সার্থক করতাম।'

'কাকে হে? তোমাদের ওই "যাদুর রাজা" কে না কি?'

'না তো কি আপনাকে?'

'সে ভাগ্য কি আমার হবে রে ভায়া? আমার জন্যে শুধু রাগ। কিন্তু ভদ্রলোক এখনও যান নি মনে হচ্ছে, আমাদের সুধাংশুবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন দেখে এলাম। দেখতে চাও চলো।'

আমার তো শুনে বুক দুড় দুড় করছে। ভয়ে কি আনন্দে কে জানে। চির-দিনের আশা সফল হতে গেলে যা হয় বোধ হয় তাইতে।

কিন্তু গিয়ে কি দেখলাম?

হরি! হরি! এই কি আমার ধ্যানের ধারণা, মনের কল্পনা? কালো, রোগা, ক্ষয়া, একটুখানি একটি মানুষ, ঠিক আমাদের মত, টেবিলে পা তুলে বসে বসে চা খাচ্ছেন। আমাদেরই মত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। এই মানুষ নাকি আবার অসাধারণ কিছু একটা করতে পারে? ভক্তি উড়ে গেল।

অমিয়বাবু ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন, 'এই যে প্রফেসর সাহেব আছেন এখনো? ভালোই হয়েছে। এই ছেলেটি আমার শ্যালক রত্ন, আপনার পরম ভক্ত। আপনি এখানে এসেছেন শুনে মহাখুশী। দিন না দুটো ভানুমতীর খেল-টেল দেখিয়ে।'

প্রফেসর খাসনবিশ পা নামিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'তাই নাকি? শ্যালক-রত্ন যখন, তখন শুনতেই হয় কথা। কিন্তু শুধু হাতে কি দেখাবো?'

'এনিথিং। আপনাদের তো হাত ঝাড়লেই পর্বত! তাসটাস নেই পকেটে?'

'নাঃ। তাস কি পকেটে নিয়ে বেড়াই? যাক্ গে, দুটো গল্পগাছাই হোক আজকে। কি বল হে?'

যদিও আমার পুরো পনের বছর বয়স, তবু লোকে এখনো আমায় 'তুমি' বলে। কবে যে লম্বা হবো!

আমি চুপ করে আছি।

প্রফেসর বললেন, 'কী, তোমাদের কাগজখানা না ছাপালে চলছে না? কিন্তু আমাদের অমিয়বাবু যে ঝানুলোক, বিনা পয়সায় ছাপাতে রাজী হবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

অবাক হয়ে গেলাম। কে বললে ওঁকে বই ছাপার কথা? তাও আবার অমনি ছাপানোর কথা পর্যন্ত? এই কি থট রিডিং নাকি?

'আপনি কি করে জানলেন?'

লজ্জিত ভাবে প্রশ্ন করি।

'ওর আর কি, সাদা কথা বৈ তো নয়, জানলেই হ'ল। কিন্তু তোমায় সত্যি কথাটি বলে দিচ্ছি বাপু—অমিয়বাবুর খপ্পরে যেও না, দাম দিয়ে কাজ আদায় হয় না, তা বিনি পয়সায়।···কি অমিয়বাবু, চটছেন নাকি? কি করবো বলুন, সত্যি কথা আমায় বলতেই হবে!···তার চেয়ে—কি তোমার নাম? সিদ্ধার্থ? সিদ্ধার্থবাবু, বেশ বেশ, চলো তোমায় একটা আশ্চর্য প্রেসের সন্ধান দিই গে।···"রেডিমেড প্রেস"। বই ছাপাতে দিয়ে তুমি এক পেয়ালা চা খাও, হয়ে গেল তোমার বই ছাপা, মায় বাইণ্ডিং পর্যন্ত।'

'বলেন কি? তাই আবার হয় নাকি?'

'হ'ত না—হচ্ছে। রেডিমেড ফটো দেখেছো তো? পাঁচ মিনিটে ফটো তুলে ডেভেলাপ করে ছেড়ে দিল। আগে হ'ত? সায়েন্স কি না করছে?'

চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলে দিই, 'তবে আপনি এখানে বই ছাপতে দিয়েছেন কেন?'

'অদৃষ্ট আমার! সে আজ তিন মাস হতে চললো দিয়েছি, আর এ আমার এক বন্ধু সবে আনিয়েছে আমেরিকা থেকে। অমিয়বাবুও চলুন না, দেখে আসবেন।'

'নাঃ মশাই, আপনারাই দেখুন গে, মরবার ফুরসৎ নেই আমার' বলে অমিয়বাবু হাতের রুমাল দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খেতে থাকেন।

প্রফেসর উঠে দাঁড়ান। বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলেন, 'চলো তোমার খাতা-পত্তর নিয়ে। কি নাম তোমাদের কাগজের, কিশলয়? নামটি বাপু পাল্টাও, বড় সেকেলে!'

ক্রমশঃই চমৎকৃত হচ্ছি, ভক্তি আবার ফিরে আসছে। থট্ রিডিং! থট্ রিডিং ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিভূত চিত্তে প্রফেসরের অনুসরণ করি।

অনেকগুলি গলি রাস্তা ইত্যাদি পার হয়ে অবশেষে এসে পৌঁছলাম। আগে এদিকটায় কখনো আসি নি দেখছি, নইলে এত বড় বাড়ী, এই প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড নজরে পড়তো না? দেখলাম সত্যিই লেখা রয়েছে 'রেডিমেড প্রেস—পাঁচ মিনিটে পুস্তক ছাপা হয়। আমেরিকার আধুনিকতম আবিষ্কার'!

বাড়ী দেখে ঘাবড়ে যাই। কি জানি বাবা কত চার্জ! পরের কথায় ভুলে তো এলাম।···খাসনবিশ মশাই হাসতে হাসতে বলে ওঠেন, 'খরচের ভয়ে যে সিদ্ধার্থবাবু বড় বেশী মুসড়ে পড়েছেন দেখছি? ভয় নেই হে, আমার বন্ধুর প্রেস, জলের দামে করিয়ে দেব।'

আশান্বিত হৃদয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি।

উঃ, সে কি বিরাট কাণ্ড! কী যন্ত্রপাতি, কত রকম-বি-রকমের মেসিন চলছে! ইলেক্‌ট্রো প্লেটেড্ সব মেসিন—ঝকঝক ঝকঝক করছে, কত লোক খাটছে, আসছে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—অত লোক, কারুর মুখে কথাটি নেই। এর কাছে

ভবতারিণী প্রেস? আরে ছিঃ ছিঃ! চাঁদের পাশে জোনাকি! লোকের হট্টগোলে মাথা ঠিক রাখা দায় সেখানে।

প্রফেসর বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রেসের যিনি মালিক।

দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ নানা কথাবার্তা চলে, প্রায় কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।··· তারপরই খাসনবিশ আমার কাছ থেকে আমাদের বড় সাধের 'কিশলয়' খানি চেয়ে নেন। ঠিক মাসিকপত্রের ধাঁচে পরিপাটি করে সাজানো। খেলার খবর থেকে পুস্তক পরিচয় পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নি। শুধু ছাপানোর ওয়াস্তা।···

এরপর এলাম আসল প্রেসঘরে।

সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য!

না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ। গম ভাঙানো কল দেখেছ? গম দিচ্ছে আর আটা হয়ে বেরিয়ে আসছে?

ঠিক সেই রকম—কাঁচা লেখাগুলো একটা ড্রয়ারে আর কাগজের দিস্তে একটা ড্রয়ারে রেখে সুইচ টিপে দিচ্ছে, ব্যস্। একেবারে ছেপে বাঁধাই হয়ে ঝড়াঝড় নেবে আসছে।

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছি···চোখে দেখছি তবু বিশ্বাস করতে পারছি না।···উঃ, কত অসম্ভব জিনিসই না সম্ভব হচ্ছে প্রতিদিন! যদিও প্রফেসর মশাই আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন জলের দরে করিয়ে দেবেন, কিন্তু কাদের জল যে কত দরের তাই বা কে জানে?

সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করলাম।

খাসনবিশ মশাই হো হো করে হেসে উঠে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিও ওতেই হবে।'

আশ্চর্য! ঠিক পঞ্চাশটি টাকাই আমাদের পত্রিকার তবিলে আছে। একি ভগবানের নির্দেশ নাকি? দুর্গা বলে দেওয়া গেল আমাদের কিশলয়কে প্রেসে চড়িয়ে।

'কেষ্ট-বিষ্টু' হলেই মানুষ চালিয়াৎ হয়ে যায় এমনি একটা ধারণাই কি আমাদের বদ্ধমূল হয়ে থাকে না? হয়ও তাই—তবে সব ক্ষেত্রে নয়। যেমন এই প্রফেসর খাসনবিশ।

'চলো হে ততক্ষণ একটু চা খেয়ে আসি' বলে আমাকে ঠিক বন্ধুর মত নিয়ে গেলেন পাশেই রেস্টুরেন্টে···আর সে কী ভূরি ভোজ!

সত্যি কথা বলতে কি, রেস্টুরেন্টে এসে আশ মিটিয়ে খাওয়া কবেই বা ঘটে? দুটো ডিম খেতে চাইলেই তো টাকার আধখানা বেরিয়ে গেল। কে আর আমাদের দু-পাঁচ টাকা দিচ্ছে? তাও তো আজকাল 'কিশলয়ে'র খাতিরে সর্বস্বান্ত হ'তে বসেছি আমরা।

প্রফেসর খাসনবিশ ও আমি যা খেলাম, টাকা আষ্টেকের কম নয়। বিলটা অবশ্য তিনিই মিটোলেন।

উড়ন্ত ভক্তিটা এত জোরালো হয়ে ফিরে এল যে—কোথায় রাখি অতটা, তাই ভাবছি।···ফিরে এসে দেখছি বই হয়ে গেছে। বস্তা বন্দী ছাপা 'কিশলয়'। প্লেন লাল মলাটে সাদা হরফে নাম লেখা। ঠিক যে রকমটি করবার কথা ছিল আমাদের। এরা কি অন্তর্যামী নাকি? দু হাত তুলে নাচবো? না কি করবো? নেহাৎ ভদ্রতায় বাধে তাই চুপ করে থাকতে হয়।

প্রেস ম্যানেজার আমাকে একটা বিল দিলেন। মাত্র পঞ্চাশ টাকা পেমেণ্ট করে দিতে পারলেই বইগুলি আমার সম্পত্তি। উঃ—অজিত, দিলীপ, গৌরাঙ্গ, তারাপদ, অনিল—কী বলবে তারা এই অঘটন ঘটন দেখে! হয় তো চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করবে না।

বই ছাপার সমস্ত ক্রেডিট্‌টা একলা আমার থাকবে মনে করে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠছে।···কিন্তু বিশ্বাস করে টাকা কি ওরা দেবে আমার হাতে? নমুনা একটা না নিয়ে গেলে?

'এই যে এক কপি আপনি নিয়ে যান' প্রেস ম্যানেজার বললেন, 'দু-এক দিনের মধ্যেই আসবেন, ভারী কাজের ভিড় আমাদের, রাখবার জায়গা নেই।'

খবরের কাগজে মুড়ে সুতলি দড়িতে বেঁধে বেশ ভব্যিযুক্ত করেই বইখানি আমার

হাতে দেন ভদ্রলোক।

বেশ পা চালিয়ে দুজনে ফিরে এলাম ভবতারিণী প্রেসে। অবাক কাণ্ড! তখনো অমিয়বাবু বসে বসে বাতাস খাচ্ছেন। প্রফেসর খাসনবিশ মুচকে হেসে বলেন, 'তাসের ম্যাজিকটা আজ আর হ'ল না অমিয়বাবু! আর একদিন হবে, আচ্ছা নমস্কার! চলি তাহলে···সিদ্ধার্থবাবু পরে যেন গালাগালি দিও না।'

'চমৎকার লোক এই খাসনবিশ!'

উচ্ছ্বসিত ভাবে অমিয়বাবুকে বলি, 'মাত্র পঞ্চাশ টাকায় আমাদের দুশো কপি "কিশলয়" ছাপা হয়ে গেল, ছাপা বাঁধাই কী সুন্দর!'

'সুন্দর বুঝি? বেশ সুন্দর, না?'

অমিয়বাবুর বাঁকা হাসি দেখে বুঝলাম—হিংসে!

করো হিংসে, তাই বলে ভালকে ভাল বলব না? গম্ভীরভাবে যেন আপন মনেই বলি, 'আজ আর রাত্রে খেতে হবে না, প্রচুর খাওয়া গেল।'

'কোথায় হে? হঠাৎ এত প্রচুর খেলে?'

'ওই যে 'ওরিয়েন্ট রেস্টুরেন্ট' না কি, রেডিমেড প্রেসের সামনেই, দেদার খাওয়ালেন ভদ্রলোক।'

বলবো না কেন? বলবোই তো! এই যে অমিয়বাবু, এক পেয়ালা চাও তো কই অফার করলেন না!

বললাম বটে, কিন্তু ক্ষিধের অভাব তো কই অনুভব করছি না তেমন? বেশ যেন 'চুঁই চুঁই' করছে পেটটা। রাত্রের কথা থাক্, এখনই তো দস্তুরমত খেতে পারবো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? অত খেলাম!

অমিয়বাবু মুচকি হাসিটি মুখে বজায় রেখে বলেন, 'তা কি কি খেলে?'

'অত কি মনে আছে? চা কেক ডিম ফ্রাই টোস্ট মাখন···'

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন অমিয়বাবু।

'হয়েছে হয়েছে, থামো। আচ্ছা খেলা দেখিয়ে গেল খাসনবিশ! বলি এখান থেকে

উঠলে কখন যে, ওরিয়েন্ট রেস্টুরেন্টে খেয়ে এলে ?'

'উঠলাম না মানে ?'

অমিয়বাবুর মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

তিনি কিন্তু দিব্য স্থিরভাবেই বলেন, 'উঠলে না, মানে ওঠ নি। বলি কটা বেজেছে বল তো ?'

অজ্ঞাতসারে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাই, দেখি চারটে কুড়ি, অথচ বেশ মনে আছে চারটে দশে আমি এঘরে এসেছিলাম। ঘরে ঢুকতেই সামনে পড়ে ঘড়িটা।

একটু ভেবে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলি, 'ও আর এমন কি ? ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়।'

'মোটেই না, দিব্যি চলছে। এই দশটি মিনিট সময় কেউ চেয়ার থেকে এক পাও নড়ে নি, না তুমি, না আমি, না তিনি।'

অবিশ্বাসের হাসি হেসে পকেট থেকে সেই প্রেস ম্যানেজারের বিলটা বার করে নাকের সামনে ধরে দিয়ে বলি, 'তবে এটা কি ?'

'এটা ? এটা তো দেখছি ওয়াছেল মোল্লার ক্যাশমেমো একটা।'

পকেট হাতড়ে পকেট প্রায় ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করি, প্রেসের বিল আর কোনোখানে পাই না।

'ভানুমতীর খেল্ রে দাদা ভানুমতীর খেল্!'

অমিয়বাবুর এই কথা আর ফ্যাক্ ফ্যাক্ হাসি দেখে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল।

একেই তো বিল হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

রেগে-মেগে বলি, 'তা'হলে বলুন বইটাও ভানুমতী ?'

লাল টকটকে মলাটের ওপর সাদা হরফে 'কিশলয়' লেখা সদ্য ছাপা বইখানা অমিয়বাবুর চোখের সামনে ধরে দেবার জন্যে ফট্‌ফট্ করে দড়ির বাঁধন কেটে ফেলি।

কিন্তু আমার মাথাটা কেটে ফেললেই বা ক্ষতি ছিল কি ?

সেই তো কাটাই গেল মাথা। ছোরাছুরিতে না হোক, লজ্জায়। কোথায় বা

লাল মলাট, আর কোথায় বা সাদা হরফ! নীল কাগজে বাঁধাই সেই আমাদের চিরপরিচিত খাতাখানা যেন বাঁধন খুলতেই আমায় ভেঙিয়ে উঠলো!···

মনে করছো প্রফেসর খাসনবিশের বিজ্ঞাপন দিতে বসেছি? স্বপ্নেও ভেবো না। সত্যিকার ভালো ম্যাজিক দেখে খুশী হয়েছি ভাবছো? মোটেই না। হাড়ে চটে গেছি লোকটার ওপর। বই তো চুলোয় যাক্, খাওয়াটা পর্যন্ত হাওয়া?

ছি ছি!

———

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com